মৃত্যুর চেয়ে বড়

শৈলেশ দে

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৭১

মুদ্রক : শ্যামলকুমার ঘোষ ॥ দি আনন্দম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ॥
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সত্য চক্রবর্তী

'সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনো করেনা বঞ্চনা—'
—রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আমি সুভাষ বলছি (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব)
বিনয়-বাদল-দীনেশ
ক্ষমা নেই
ফাঁসি মঞ্চ থেকে
শপথ নিলাম
যেন ভুলে না যাই
রক্তের অক্ষরে
রক্ত দিয়ে গড়া
ইতিহাস মনে রাখেনি
গান্ধীজী ও নেতাজী
রক্ত ঝরা দিনগুলি

।। যে-সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।।

গ্রন্থ	লেখক
কারাকাহিনী	শ্রী অরবিন্দ ঘোষ
আত্মকথা	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা	হেমচন্দ্র কানুনগো
নির্বাসিতের আত্মকথা	উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ	গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী
জেলে ত্রিশ বছর	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
অনুশীলন সমিতির ইতিহাস	জীবনতারা হালদার
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়
বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী	মতিলাল রায়
বিপ্লবীর জীবন দর্শন	প্রতুল গাঙ্গুলী
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ	হরিদাস মুখার্জী ও উমা মুখার্জী
ভারতের বিপ্লব কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা	মণীন্দ্র রায়
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়

শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে	শিবদাস ঘোষ
শহীদ যুগল	নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ	অনন্ত সিংহ
সে যুগের আগুনের পথ	পূর্ণ চক্রবর্তী
বিপ্লব ও বিপ্লবী	অমলেন্দু ঘোষ
বিপ্লবী মেদিনীপুর	বিনয়জীবন ঘোষ
ইনক্লাব জিন্দাবাদ	লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
পাক-ভারতের রূপরেখা	প্রভাস লাহিড়ী
পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চট্টগ্রাম বিপ্লব বহ্নিশিখা	শচীন গুহ (সম্পাদিত)
মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতি	সংকলন
মৃত্যুহীন	বিপ্লবী নিকেতন
রবীন্দ্র রচনাবলী	বিশ্ব ভারতীর সৌজন্যে
সুকান্ত সমগ্র	সুকান্ত ভট্টাচার্য
পত্র গুচ্ছ	জওহরলাল সম্পাদিত
My Indian years, 1910-1916	Lord Hardinge
India as I knew it	Michael O'Dwyer
Two Great Indian Revolutionaries	Uma Mukherjee
India Wins Freedom	Abul Kalam Azad
My Diaries	W. S. Blunt
Battle of Imphal	Debnath Das
The Last Days of the British Raj	Leonard Mosley

স্টেটসম্যান : ইংলিশম্যান : দি এ্যাম্পায়ার : মর্নিং পোস্ট : বন্দেমাতরম : যুগান্তর : সন্ধ্যা : সঞ্জীবনী : সাপ্তাহিক বসুমতী : অমৃতবাজার : আনন্দবাজার : যুগান্তর (দৈনিক) : সাপ্তাহিক দেশ : স্বাধীনতা : রাখাল বেণু : নিশানা : বিপ্লবী নিকেতন : দেশবন্ধু স্মৃতি : ভারতবর্ষ : অমৃত : বঙ্গবাণী : জ্যোতি : উল্টোরথ : সিডিশান কমিটির রিপোর্ট : আই. বি রিপোর্ট ইত্যাদি।

ভূমিকা

বাঁধাধরা পথে স্কুল-কলেজে ভাল ছেলে বলে পরিচিত হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য (!) জীবনে কোনদিনই শৈলেশবাবুর হয়নি। কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জীবনকে জেনেছেন তিনি।

প্রথম জীবনে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিল্পী রূপে। পরে অন্যান্য কেন্দ্রেও গেয়েছেন তিনি। সংগীত শিক্ষকতা ছিল তখন তাঁর পেশা।

দেশ বিভাগের পর খুবই বিপদাপন্ন অবস্থায় তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। জীবিকার জন্য সেদিন অনেক কিছুই করতে হয়েছিল তাঁকে। ছোটখাট ব্যবসা বা দোকানদারীও বাদ যায়নি।

এ সবের মাধ্যমে জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সঞ্চিত হল প্রচুর। কিন্তু শুধু এতেই তিনি আবদ্ধ রইলেন না। সংগীত শিল্পী পরিচয় অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁর মুছে গেল; কিন্তু 'বাগদেবী'র বীণাটির পরিবর্তে এবার তাঁর 'কলম'টি তিনি আস্তে আস্তে তুলে নিলেন।

শুরু হল নতুন পথে নতুনতর পথ পরিক্রমা। রকমারী গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি স্বনামে ও বিশেষ একটি ছদ্মনামে অনেক কিছুই ক্রমে ক্রমে লিখলেন তিনি। বেশ কতকগুলি বইও তাঁর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষায়ই। যাত্রা ও পাবলিক রংগমঞ্চেও তার কাহিনী অভিনীত হল সগৌরবে।

তবু ভরিল না চিত্ত। কৈশোরে টেনিস খেলারত ঢাকা মিটফোর্ড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসুকে একবার তিনি দেখেছিলেন। আলাপও করেছিলেন এক আধটুকু। সেই মুগ্ধতাই তাঁর জীবনে একটি গভীর ছাপ ফেলেছিল, যেদিন তিনি দেখলেন, তাঁর সেই স্বপ্নের 'রাজপুত্র' তখনকার দিনের বাঘা আই. জি. লোম্যান হত্যার নায়করূপে শাসক ইংরেজের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। সেই 'রাজপুত্র'ই যখন আবার একদিন বাদল ও দীনেশকে নিয়ে কলকাতার রাইটার্স'এ ঝড় তুলে আত্মদান করলেন, তখন সে ছাপ আরো গভীরতর হল।

১৯৩০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পবিত্র বিষ্ণু-পাদ-পদ্মের মত মনের গহনে এই ছাপটি তিনি অতি সংগোপনে লালন করে গেছেন। শেষটায় 'রক্ত দিয়ে গড়া' নামে একটি বই-ই লিখে ফেললেন বিনয়-বাদল ও দীনেশের আত্মদানকে কেন্দ্র করে।

বইটি নিয়ে খুব সম্ভব ১৯৬১ সালের কোন একদিন (আমার উপস্থিতিতেই) তিনি হাজির হলেন শহীদদ্বয় যে বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বা বি. ভি. দলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা, ভূতপূর্ব 'বেণু' সম্পাদক সুসাহিত্যিক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কাছে। এখানেই শুরু হল শৈলেশবাবুর বিপ্লব ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ। একান্ত নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসেবে ১৯৬৫ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ষোল বছর ধরে এই পাঠ গ্রহণ কার্যটি তাঁর অব্যাহতই আছে। কোথাও কোন ফাঁকি দেননি তিনি।

১৯৭২ সালে ভূপেন্দ্রকিশোরের পরলোকগমনের পরও বি. ভি-দল তো বটেই, অন্যান্য বিপ্লবী দলেরও প্রায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংগেই শৈলেশবাবু ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ও বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি শুনে নিজের সঞ্চয়ের ঝুলি বাড়িয়ে নিয়েছেন। এ সব কিছুর ফলশ্রুতিই হল বিপ্লববাদের পটভূমিকায় লেখা তাঁর 'ক্ষমা নেই', 'বিনয়-বাদল-দীনেশ,' 'ফাঁসি মঞ্চ থেকে,' 'রক্তের অক্ষরে' প্রভৃতি পুস্তক ও তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'আমি সুভাষ বলছি'র মত 'মহাভারত', যা জনপ্রিয়তার দিক থেকে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

শৈলেশবাবুর এই সব পুস্তক গল্পের আঙ্গিকে লেখা হলেও তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস নির্ভর। সব ঘটনাই যাকে বলে Well documented. এ ব্যাপারে তাঁর 'গান্ধীজী ও নেতাজী' নামক গ্রন্থটিও একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন। বিভিন্ন বিপ্লবীদের লেখার সংকলন গ্রন্থ শৈলেশবাবুর 'অগ্নিযুগ' ও —বিপ্লবীরা যাতে জনচিত্ত থেকে হারিয়ে না যান—সেই প্রচেষ্টারই সার্থক প্রয়াস।

শৈলেশবাবুর বর্তমান গ্রন্থটি বাংলার বিপ্লববাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের আত্মদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এঁদের কারো কারো সম্বন্ধে আগেও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন, কিন্তু এক সংগে এত বিস্তারিতভাবে এই সব শহীদদের সবার জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে এ রকম তথ্যবহুল ও দরদী আলোচনা আগে আর হয়নি। শৈলেশবাবুর এই প্রচেষ্টাকে একটি জাতীয় কর্তব্য বলেই আমি মনে করি।

নিজে কোন বিপ্লবী দলভুক্ত না হয়েও শৈলেশবাবু যে বিপ্লবীদের কি করে এতটা ভালবেসে ফেললেন তা এক বিস্ময়। এই বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা ও প্রচারকেই তিনি তাঁর শেষ জীবনের সাধনা হিসেবে বেছে নিয়েছেন লেখায় তো বটেই, নানা সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তৃতায়ও এঁদের কথাই বলেন তিনি। এঁরাই এখন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা। আমি একে শৈলেশবাবুর জীবনের এক মহত্তর উত্তরণই বলবো।

শৈলেশবাবুর এই একনিষ্ঠ সাধনা যে একেবারে বৃথা যায়নি, বিস্মৃত প্রায় বিপ্লবীদের আবার যে তিনি যথাযথ মর্যাদায় জনচিত্তে তুলে ধরতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছেন, এটাই সুখের কথা।

আমি নিজে বিপ্লবীদলভুক্ত হলেও শৈলেশবাবুর ভূমিকা লিখে দেবার মত নামী লোক নই। তবে তাঁর এসব লেখালেখির ব্যাপারে গত ষোল বছর ধরে তাঁর সংগে আমার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তাতে তাঁর কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়েই একান্ত সংকোচের সংগে অমর শহীদবৃন্দের স্মরণে লিখিত শৈলেশবাবুর এই গ্রন্থের সংগে নিজেকে যুক্ত করে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

আমি আশা করি, বাংলার ছেলেমেয়েরা পরম শ্রদ্ধায় এই গ্রন্থখানি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করবেন।

মৃত্যুর চেয়ে বড়

বালক অরবিন্দ

বোমার মামলার আসামীরূপে অরবিন্দ

হেমচন্দ্র কানুনগো

সুশীল সেন

মুরারীপুকুরের সেই বাগানবাড়ি
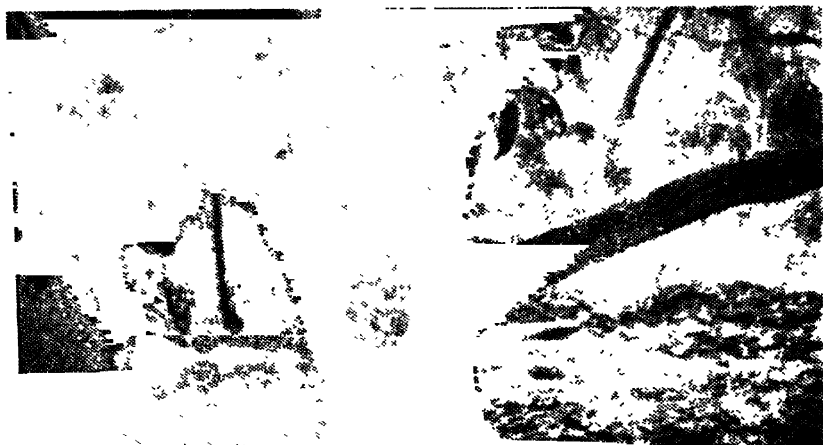
গুলিবিদ্ধ সেই গাছটি
যাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো শেখানো হত

মুরারীপুকুর বাগানের অপর এক অংশ
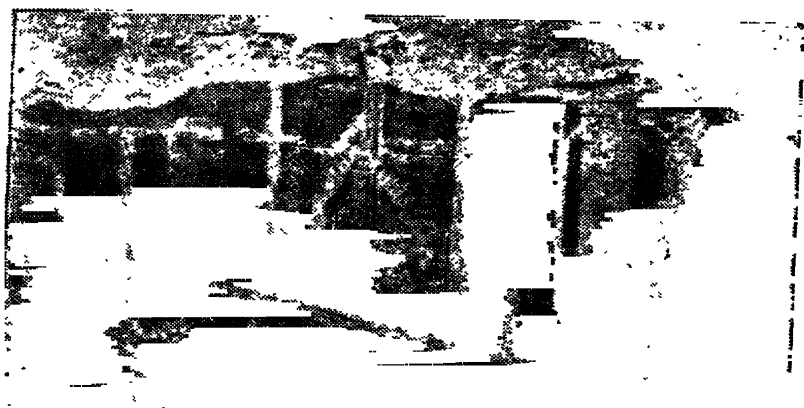
মুরারীপুকুর বাগানে বোমা তৈরীর আস্তানা

শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষুদিরাম

বোমাবিধ্বস্ত সেই ফিটন গাড়ীটি

মজঃফরপুর জেলের সেই ফাঁসিমঞ্চ

আলিপুর কোর্টে শৃঙ্খলাবদ্ধ কানাই ও সত্যেন

রক্তাক্ত জালালাবাদ
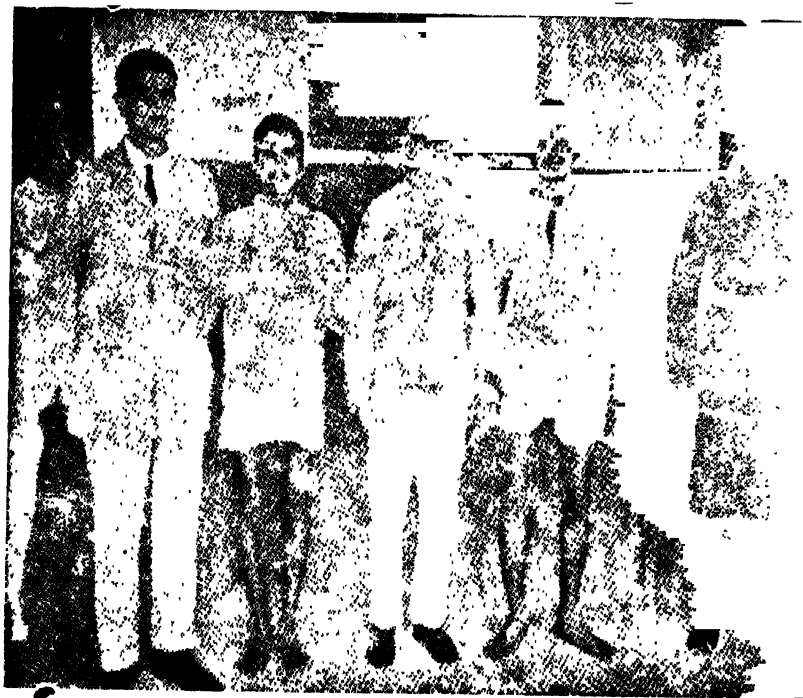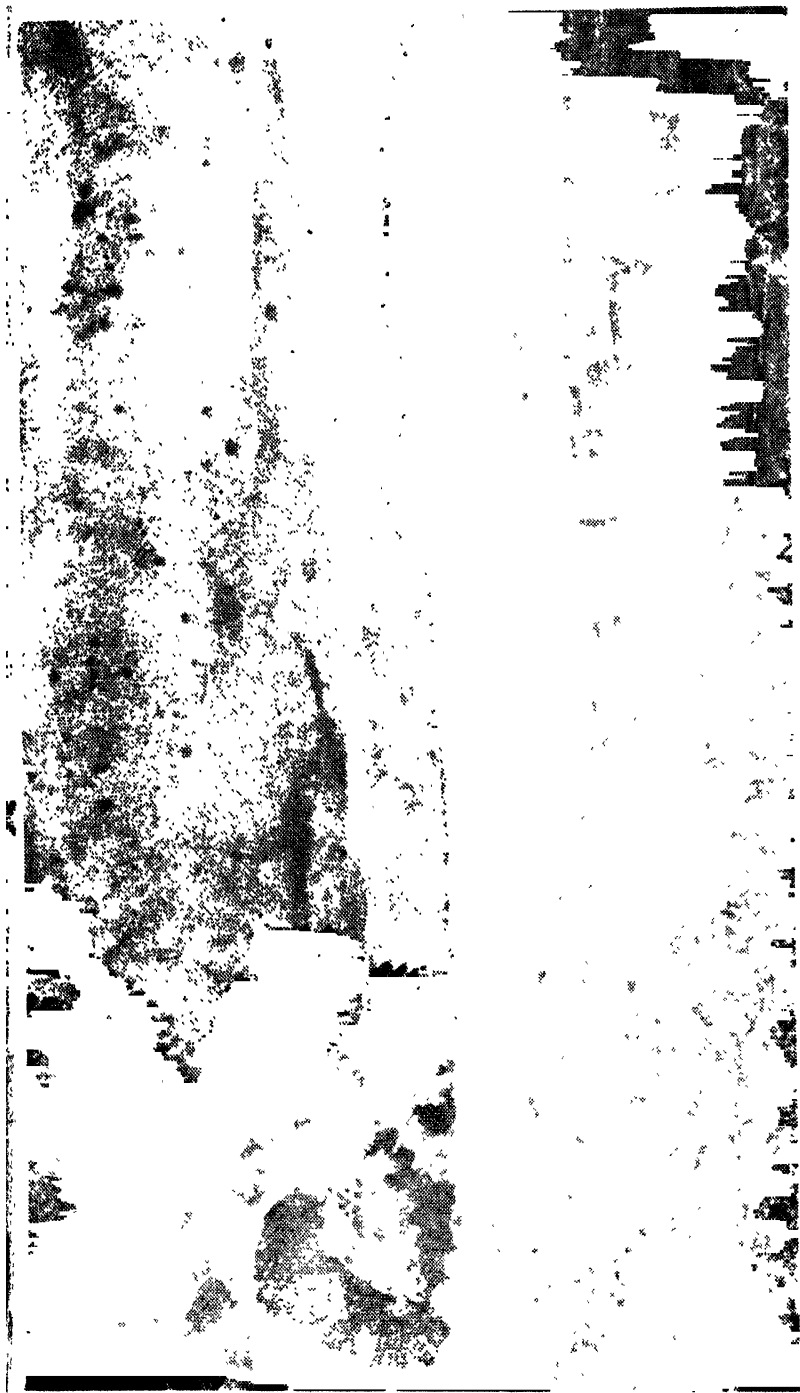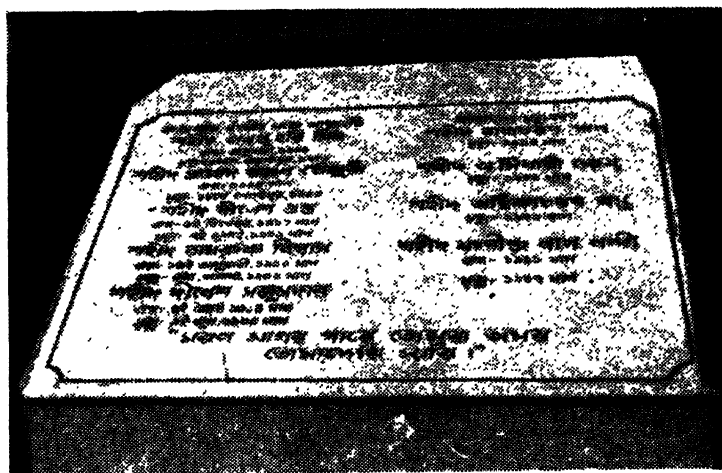
আলিপুর জেলে স্থাপিত শহীদ স্তম্ভ
দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির তারিখ লক্ষ্যণীয়

গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ করছেন শহীদ প্রদ্যোৎ জননী পঙ্কজিনী দেবী।
সঙ্গে রয়েছেন পেডি হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ও অন্যান্য

ক্ষুদিরাম

সত্যেন বসু

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

অনন্তহরি মিত্র
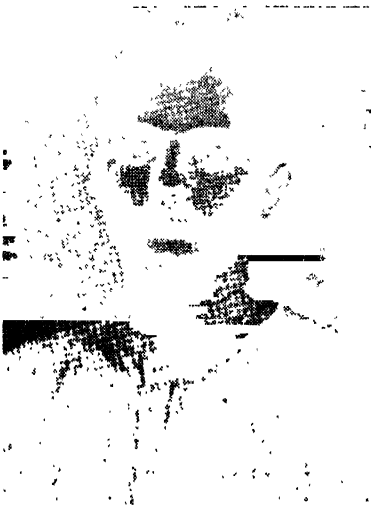
রাজেন লাহিড়া

যতীন দাস

বাদল

দীনেশ গুপ্ত
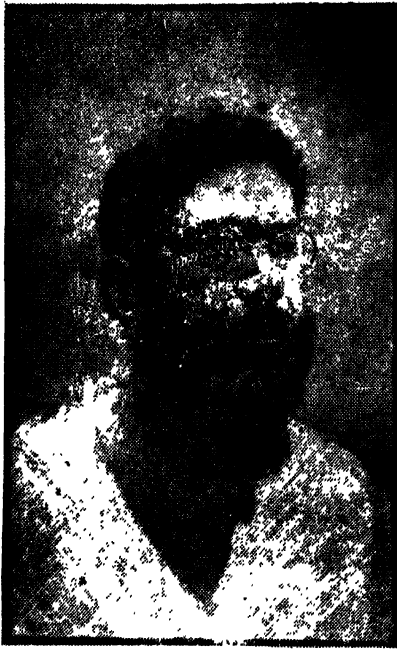
কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশবন্ধু

সুভাষচন্দ্র
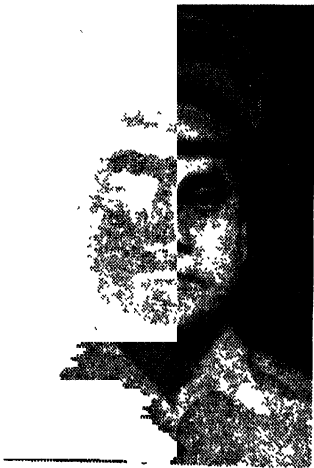
জালালাবাদ যুদ্ধে সেনাপতির বেশে
লোকনাথ বল

পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

সহসা সেই অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেল কার মদমত্ত কণ্ঠ : 'তোমার কিছু বলার আছে বন্দী ?'

হাসলেন বন্দী। না, তার কিছু বলার নেই। তারপরই তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল একটিমাত্র মন্ত্র—'বন্দেমাতরম' !

দেখতে দেখতে বন্দীর দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে। শুধু মোম মাখানো ম্যানিলা রজ্জুটা থির থির করে কাঁপতে লাগল কয়েক সেকেন্ড ধরে। তারপরই সব স্থির!

শুনেছি আমাদের মাতৃপূজায় নাকি অনেক রকম উপচারের প্রয়োজন হয়। ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য এমনি কত কি। কিন্তু পরাধীন মায়ের শৃঙ্খল মোচনের জন্য এমন অভাবনীয় উপচার দিতে পেরেছিলেন ক'জন। মৃত্যুকে উপহাস করার মত এমন নজীরই বা ক'জন দেখাতে পেরেছিলেন ওঁদের মত ?

উপহাস নয়তো কি! সংসারে কে না ভালবাসে নিজের প্রাণটাকে। অথচ সব কিছু জেনেশুনে সেই পরম প্রিয় বস্তুটিকে কত সহজেই না ওঁরা হাসতে হাসতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার পায়ে।

এ যেন দেশজননীর উদ্দেশ্যে মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ প্রণাম। হে আমার দেশজননী, আমার কর্তব্য শেষ। যাবার আগে তোমাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে যাই—'বন্দেমাতরম।'

বাবা-মার কথা নয়। ভাই-বোন বা সহকর্মীদের কথাও নয়। মন্ত্র বলতে শুধু একটাই—'বন্দেমাতরম।'

অগ্নিযুগের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সারা ভারতে মোট কতজন যে এমনি করে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করেছিলেন, তার সঠিক তালিকা আমার জানা নেই। তবে দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলে যেটুকু জানা গেছে, তাতে দেখা যায়—এই বাংলাদেশেই তাঁদের সংখ্যা ছিল মোট চল্লিশজন।

এই চল্লিশজনের কথাই এবার তোমাকে আমি বলতে চেষ্টা করব মল্লিকা।

অবশ্য লাঠি, রাইফেল বা মেসিনগানের গুলিতে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কথা গুণেও বোধ হয় কোনদিন শেষ করা যাবে না। তাই সেই চেষ্টা না করে আমি শুধু তাঁদের কথাই তোমাকে বলতে চেষ্টা করব, যাঁরা সেদিন

বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জেবলে, দুঃখের সংগে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে, স্বেচ্ছায় ফাঁসির রজ্জু ধারণ করেছিলেন নিজের গলায়। অবশ্য একই ঘটনায়, একই সংগে আরো যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কথা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা আসবে এবারের এই কাহিনীতে।

প্রথমেই তালিকাটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

	নাম	ফাঁসির তারিখ		কোন জেলে
১।	ক্ষুদিরাম বসু	১১ই আগস্ট,	১৯০৮	মজঃফরপুর
২।	কানাইলাল দত্ত	১০ই নভেম্বর,	,,	আলিপুর
৩।	সত্যেন বসু	২১ই নভেম্বর,	,,	,,
৪।	চারু বসু	১৯শে মার্চ,	১৯০৯	,,
৫।	বীরেন দত্তগুপ্ত	২১শে ফেব্রুয়ারী,	১৯১০	,,
৬।	বসন্ত বিশ্বাস	১১ই মে,	১৯১৫	আম্বালা
৭।	নীরেন দাশগুপ্ত	২২শে নভেম্বর,	,,	বালেশ্বর
৮।	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত	,,	,,	,,
৯।	সুশীল লাহিড়ী	...অক্টোবর,	১৯১৮	উত্তরপ্রদেশ
১০।	গোপীনাথ সাহা	১লা মার্চ,	১৯২৪	প্রেসিডেন্সি
১১।	প্রমোদ চৌধুরী	২৮শে সেপ্টেম্বর,	১৯২৬	আলিপুর
১২।	অনন্তহরি মিত্র	,,	,,	,,
১৩।	রাজেন লাহিড়ী	১৭ই ডিসেম্বর	১৯২৭	গোণ্ডা
১৪।	দীনেশ গুপ্ত	৭ই জুলাই,	১৯৩১	আলিপুর
১৫।	রামকৃষ্ণ বিশ্বাস	৪ঠা আগস্ট,	,,	,,
১৬।	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	২২শে আগস্ট,	১৯৩২	বরিশাল
১৭।	প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য	১২ই জানুয়ারী,	১৯৩৩	মেদিনীপুর
১৮।	কালীপদ মুখার্জী	১৬ই ফেব্রুয়ারী,	,,	ঢাকা
১৯।	সূর্য সেন	১১ই জানুয়ারী,	১৯৩৪	চট্টগ্রাম
২০।	তারকেশ্বর দস্তিদার	,,	,,	,,
২১।	কৃষ্ণ চৌধুরী	৫ই জুন,	,,	মেদিনীপুর
২২।	হরেন চক্রবর্তী	,,	,,	,,
২৩।	দীনেশ মজুমদার	৯ই জুন,	,,	আলিপুর
২৪।	অসিত ভট্টাচার্য	২রা জুলাই,	,,	শ্রীহট্ট
২৫।	ব্রজকিশোর চক্রবর্তী	২৫শে অক্টোবর,	,,	মেদিনীপুর
২৬।	রামকৃষ্ণ রায়	,,	,,	,,
২৭।	নির্মলজীবন ঘোষ	২৬শে অক্টোবর,	,,	,,
২৮।	মতি মল্লিক	১৫ই ডিসেম্বর	,,	ঢাকা

	নাম	ফাঁসির তারিখ		কোন জেলে
২৯	ভবানী ভট্টাচার্য	৩রা ফেব্রুয়ারী,	১৯৩৫	রাজশাহী
৩০	রোহিনী বড়ুয়া	১৮ই ডিসেম্বর,	,,	ফরিদপুর
৩১	সত্যেন বর্ধন	১০ই সেপ্টেম্বর,	১৯৪৩	মাদ্রাজ ফোর্ট
৩২।	মানকুমার বসুঠাকুর	২৭শে সেপ্টেম্বর,	,,	,,
৩৩।	দুর্গাদাস রায়চৌধুরী	,,	,,	,,
৩৪।	নন্দকুমার দে	,,	,,	,,
৩৫।	চিত্তরঞ্জন মুখার্জী	,,	,,	,,
৩৬।	ফণিভূষণ চক্রবর্তী	,,	,,	,,
৩৭।	নিরঞ্জন বড়ুয়া	,,	,,	,,
৩৮।	সুনীল মুখার্জী	,,	,,	,,
৩৯।	কালীপদ আইচ	,,	,,	,,
৪০।	নীরেন মুখার্জী	,,	,,	,,

লক্ষ্য করো, সবার পুরোভাগে রয়েছেন শহীদ ক্ষুদিরাম।

অবশ্য ক্ষুদিরামই বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ নন। প্রথম শহীদ—প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেওঘরে।

বিপ্লবী উল্লাসকরের সারা মনে সেদিন একটা কুলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। আজ তার নিজের হাতে তৈরী বোমার কার্য-কারিতা পরীক্ষা হবে দেওঘর সংলগ্ন পাহাড়ে। সব প্রস্তুত। এখন শুধু ফিউজে অগ্নিসংযোগের অপেক্ষামাত্র।

বুম্-ম্-ম্-ম্…

সহসা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়টা। তারপর আর কিছুই বোঝা গেল না। কিছুই দেখা গেল না। সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

উল্লাসে ফেটে পড়লেন উল্লাসকর দত্ত। পরীক্ষা সার্থক হয়েছে। নিজের হাতে গড়া এই বোমার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এবার ফিরে চল সবাই কলকাতায়।

কিন্তু এ কি! ধোঁয়া সরে যেতেই কি দেখে উন্মত্তের মত ছুটে গেলেন উল্লাসকর দত্ত! কে! কে ওখানে লুটিয়ে পড়ে আছে অমন করে। প্রফুল্ল! রংপুরের ঈষান চক্রবর্তীর ছেলে সহকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

—প্রফুল্ল! প্রফুল্ল! কণ্ঠটা বেদনায় বুজে এল উল্লাসকরের, একবার সাড়া দে ভাই। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ।

কেউ সাড়া দিল না। কেউ চোখ মেলে তাকাল না। অগ্নিযুগের প্রথম

শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী এমনি করেই সবার অলক্ষ্যে ঘুমিয়ে রইলেন চিরকাল।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সংগীরা তখন দিশেহারা। প্রফুল্ল মৃত। উল্লাসকরও আহত হয়েছেন গুরুতরভাবে। এদিকে বিস্ফোরণের শব্দে কেউ যে এখানে ছুটে আসবে না তা কে বলতে পারে। কি করা যায় এখন এই পরিস্থিতিতে!

প্রফুল্লর ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহটাকে কোন রকমে পাথর চাপা দিয়ে সংগে সংগে সবাই ফিরে গেলেন নিজেদের ঘাঁটিতে। উল্লাসকর আহত। এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসছে পাহাড়ের বুকে। আর দেরী করা ঠিক নয়। যা হয় কাল ফিরে এসে করা যাবে।

কিছুই আর করতে হল না। পরদিন ঘটনাস্থলে ফিরে এসে সবাই অবাক। কোথায় প্রফুল্লর মৃতদেহ! না, নেই! গোটা দেহটাই তাঁর চলে গেছে বন্য জন্তুর পেটে। শুধু কয়েকটি হাড় ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে।

'কেউ জানল না, কেউ শুনল না, কি করে একটি বালক-তাপস তাঁর আরব্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে আপন হৃদপিণ্ড শতখণ্ড করে দান করে দেশ-জননীর ঋণ শোধ করলেন। চোখের জলে তাঁর পিতা-মাতা, ভাইবোন কত নিশি দুয়ার খুলে হয়তো বসে থাকতেন, কারো পদধ্বনি আচমকা শুনে হয়তো চমকে উঠতেন। কিন্তু পরম স্নেহাস্পদ সন্তান আর ফিরে এলো না। খবর না দিয়ে যে চলে গেছে, খবর না দিয়েই নিশ্চয়ই তার পুনরাগমন হবে—আকুল কান্নায় তাই ভেবে মা-বাবার সান্ত্বনা। কিন্তু তা তো হবার নয়!'

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ঃ পৃঃ ৭৮-৭৯]

প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী। দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরামের সংগী প্রফুল্ল চাকী, যার কথা তোমাকে আমি বলব আরো পরে। ক্ষুদিরামের স্থান তৃতীয়, কিন্তু ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের মধ্যে বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম।

কিন্তু কেন সেদিন ক্ষুদিরামকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ফাঁসিমঞ্চে? কি তাঁর অপরাধ?

ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে মল্লিকা।

বাংলার দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সংকেত।

মাত্র কিছুদিন আগে স্বামীজী গত হয়েছেন। প্রতিটি মানুষের মনে তখন অনুরণন চলেছে তাঁর সেই উদাত্ত আহবান ঃ

'Spread ideas—go from village to village, from door to door, then only there will be real work—go to hell your-

self—buy salvation for others. There is no Mukti on earth to call my own.'

ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে তাঁর সেই দীপ্ত কণ্ঠস্বর ঃ

'শক্তি চাই, নইলে সব বৃথা। আমি চাই এমন কয়েকটি যুবক যাদের পেশীসমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও ইস্পাতনির্মিত। আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।'

পাশাপাশি মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার সেই আগুনঝরা ডাক ঃ

'In Ireland we have a saying which history has verified. England yields nothing without bombs! Every step forward, every reform has always been wrested from the Government, and paid for by a handful of men. But Ireland is proud of its heroes. Where are the heroes produced by your generation?'

[আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটা প্রবাদ আছে যে, বোমার আঘাত ছাড়া ইংল্যাণ্ড বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করে না। এক পা এগুতে হলেও ওদের যূপকাষ্ঠে একদল তরুণকে আত্মদান করতে হয়। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ড বীর-প্রসবিনী বলে গর্বিত। তোমরা কোথায় জন্ম দিতে পেরেছ তেমন বীরবৃন্দের?]

নিবেদিতাকে অবশ্য কম মূল্য দিতে হয়নি এই কারণে। আশ্রমের স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশ ঃ 'তোমাকে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করতে হবে।'

অসম্ভব। নিবেদিতার উত্তর, স্বামীজীর পথই আমার পথ। তাঁর আদর্শই আমার আদর্শ। তিনিই আমাকে বলেছিলেন—'Go ahead always. Some day you will know peace and freedom. A Mother India will know victory. এ কি আমি ভুলতে পারি কখনো? না, তা হয় না। হতে পারে না। 'I cannot act otherwise, I am identified with this idea and I would die rather than abandon it. অন্য পথ অসম্ভব। এ আদর্শে আমি নিবেদিত। এ আদর্শ বিসর্জন দিতে হলে আমি মৃত্যুবরণ করব।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন! স্বামীজীর সাধনার পীঠস্থান রামকৃষ্ণ মিশনের ভালমন্দও যে তাঁকে দেখতে হবে। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে নিজেই তিনি লিখে দিলেন—'মিশনের সঙ্গে আমি আর যুক্ত নই এখন থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিবৃতি পাঠিয়ে দিলেন সংবাদপত্রে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর কার্যকলাপ

বা চলাফেরার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কোন রকমেই দায়ী থাকবে না।

সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনের এই সিদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক ছিল না মল্লিকা। এ প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন' নিবন্ধে কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'ভারত সরকার যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামাণিক ইতিহাস প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন, তখন ইহার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। আমাকে এই গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

এই পদ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, এ বিষয়ে ভারত সরকারের গোপন দপ্তরে যত চিঠিপত্র বা দলিলাদি আছে, তাহা আমাকে দেখিতে দিতে হইবে। শুনিয়াছি যে এই সংবাদ পাইয়া এ দেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে ফাইলগুলি অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করাইয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় যে, তাঁহারা যে সমুদয় গোপনীয় সংবাদ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছিলেন তাহা যেন সাধারণে জানিতে না পারে।

একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপরে দেখিলাম লেখা আছে "রামকৃষ্ণ মিশন"। আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া ফাইলটি আমার বসিবার ঘরে গিয়া পড়িতে লাগিলাম। ফাইলের সর্ব নিম্নতলে একটি পুলিশ রিপোর্ট আছে—তাহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮।১০ জন সাধু পূর্ব জীবনে বিপ্লবী এবং গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন, কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেন।

তাঁহাদের পূর্বেকার এবং বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও ওই ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এ বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও পরপর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

সবশেষে সেক্রেটারী এই সব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব করিলেন যে, বেলুড় মঠকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

এইসব মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট ফাইলে লিখিয়াছেন ঃ "পুলিশের রিপোর্ট ও সেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছেন। কারণ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে। এ সময় (খুব সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন) কোন রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়া সাদা পোষাকে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে

সদা সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক। যে সমুদয় বিপ্লবীদের নাম পূর্বোক্ত পুলিশের বিবরণীতে আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা মঠে আছে, তাহাদের গতি-বিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।"

ফাইলটি এখানেই শেষ হইয়াছে। খুব সম্ভব বড়লাটের নির্দেশ মতই কাজ করা হইয়াছিল।

ইহার মাস দুই পরে আমি বেলুড় মঠে যাই। গুপ্ত পুলিশের রিপোর্টে যে সব সাধুদের নাম ছিল, তাঁহাদের দুই তিন জনকে আমি জানিতাম। তাঁহা-দিগকে গোপনে পুলিশ রিপোর্টের কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সত্য সত্যই কি তাঁহারা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন? তাঁহারা মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না।

বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ যে পরবর্তীকালে ধর্মসাধনা করিতেন ইহা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন তাহার পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমাদের সহিংস বিপ্লবীদের মধ্যেও যে অনেকে প্রকৃত ধার্মিক লোক ছিলেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিলাম।"

স্বামীজীর আদর্শে দেশের একদল তরুণ প্রস্তুত। মুক্তি চাই। দেশের মুক্তি।

সাপ মারতে হলে লাঠির দরকার, মনসা পুজোয় সাপ মরে না। সুতরাং, আর দেরী নয়। প্রস্তুত হও সবাই।

দলের প্রধান ঘাঁটি ছিল মুরারীপুকুর বাগানে। তাছাড়া গোপীমোহন দত্ত লেন ও এখানে-ওখানেও থাকতেন কেউ কেউ।

প্রকাশ্যে বারীন ঘোষকে সবাই প্রধান সংগঠক বলে জানলেও আসলে এই গুপ্ত সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ, যা বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাড়া আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না।

ঘোষ পরিবারেরই চার ভাই ছিলেন এই বাগান বাড়িটার মালিক। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, বিনয় ঘোষ আর মনোমোহন ঘোষ।

অরবিন্দ থাকতেন গ্রে স্ট্রীটে। ছোট ভাই বারীন ঘোষ বাগানেই থাকতেন দলের ছেলেদের সঙ্গে। গুপ্ত সমিতির প্রধান সংগঠক তিনি। দায়িত্ব তো তাঁরই সব চাইতে বেশী।

মুরারী পুকুরের এই বাড়িটাকে 'বাগান' না বলে 'আশ্রম' বলাটাই বোধহয় সংগত। গত একবছরে বহু বিপ্লবী তরুণ এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছেন ঘর-বাড়ি ছেড়ে। লক্ষ্য একটাই। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আমরা মুক্তি

চাই। চাই স্বাধীনতা। বুকের রক্ত দিয়েই আমরা সেই স্বাধীনতা অর্জন করবো।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই তিনি ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গের কথা। খুব শিগগিরই অখণ্ড বাংলাকে ভাগ করে পরিণত করা হবে দুটি আলাদা রাজ্যে।

গর্জে উঠল গোটা বাংলাদেশ। এ অন্যায় আদেশ আমরা মানবো না। কিছুতেই না।

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল ভারতসচিব লর্ড মর্লির সদম্ভ উক্তি : বাঙালীরা পছন্দ করুক, চাই নাই করুক, বঙ্গভঙ্গ হবেই। পার্টিশন অব বেঙ্গল ইজ এ সেটেলড্ ফ্যাক্ট।'

পাল্টা জবাব দিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ : 'উই মাষ্ট আনসেটেল্ দি সেটেলড্ ফ্যাক্ট।'

৭ই আগস্ট বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল টাউন হলে। গৃহীত হল বিলিতি দ্রব্য বয়কট করার প্রস্তাব। কেউ আমরা স্পর্শ করবো না বিলিতি জিনিস। দেখা যাক, ওদের এই বড়াই কতদিন থাকে।

বিরাট সেই প্রতিবাদ সভায় ছোট একটি পুস্তিকাও বিতরণ করা হল জনসাধারণের মধ্যে। নাম—সোনার বাংলা।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ করে উঠল ইংলিশম্যান প্রমুখ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি। সিডিশন। সিডিশন। সিডিশন। যদিও লেখকের কোন নাম নেই, তবু লেখা দেখলেই বোঝা যায় যে, এ পুস্তিকার লেখক 'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছাড়া কেউ নন। এই রাজদ্রোহকর পুস্তিকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

তখনকার মত চেপে গেল পুলিশ। লেখাটা যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু যাবে কোথায়! মওকামত একবার পেলেই হয়। তখন দেখা যাবে কত শক্তি ধরে 'সন্ধ্যা' সম্পাদক এই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

কেন সন্ধ্যা সম্পাদকের বিরুদ্ধে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলোর এত গাত্রদাহ! কি লিখেছিলেন সেদিন তিনি 'সোনার বাংলা' পুস্তিকায়। কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'শুধু কথায় আর চলবে না। কাজ চাই। রক্ত দান ছাড়া রক্তবীজের জাতিকে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। ফিরিঙ্গি আমাদের দুঃখ-দুর্দশার উপর অপমানের বোঝা চাপিয়েছে।

...তারা আমাদের সোনার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। বাঙালীর শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তারা বাঙালীকে আসামের সঙ্গে

সংযুক্ত করেছে।

…বাংলার সর্বনাশের দিন আসন্ন। বঙ্গমাতার সুসন্তান কি কেউ নেই? তোমরা কেন এই দুর্দিনে মৌন হয়ে রয়েছ? প্রস্তুত হও। মৃত্যুবরণের জন্য তৈরী হও। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ো না। জন্মগ্রহণ করলেই মরতে হবে। বীরের মত আচরণ কর। অসুরের রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর।

হিন্দু-মুসলমান ভাইগণ, তোমরা ফিরিঙ্গির ন্যায় নেমকহারাম নও। যার নুন খাও, তার প্রতি নেমকহারামি করা তোমাদের স্বভাব নয়। তবে কেন তোমরা এতটা নিশ্চেষ্ট? তোমাদের উপর কৃত অন্যায়ের প্রতিবিধান সাধনে তোমরা দলবদ্ধ হও।

ভুলে যেয়ো না, অসুরের ধর্ম মাতৃরক্ত পান করা। যে জাতি আমাদের মাতৃদেবীকে হত্যা করতে চায়, সে আমাদের শত্রু—সেই শত্রুর বিনাশসাধন মহাপুণ্য। মনে রেখো, ইংরেজ আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তার অত্যাচারে আমাদের জাত ও ধর্ম নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের মা-বোনেরা অনাহারে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

চোখ থাকলে চোখ খুলে দেখো, অন্যায়ের প্রতিবিধান কর। আমরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছি। জেলখানার ভিতর এবং বাহির উভয়ই আমাদের কাছে সমান।

তোমার জন্মকুল যদি ঠিক থেকে, যদি তোমাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ এখনও অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে আর কালাতিপাত না করে মায়ের দুর্দশা মোচনে ও ফিরিঙ্গি বিতাড়নে সংঘবদ্ধ হও। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মিলন তোমাদের লক্ষ্য হোক।

দেশী জিনিস ব্যবহার করা অতীব প্রয়োজনীয়। স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা তোমরা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। জীবিকার জন্য তোমাদের আর কুকুরের মত অপরের দ্বারস্থ হতে হবে না।

হে ছাত্রগণ, হে যুবকবৃন্দ, তোমরাই সোনার বাংলার আশা-ভরসা। অগ্নিকে সাক্ষী করে, ভগবান ও পূর্ব পুরুষদের নাম স্মরণ করে তোমরা সংগোপনে সংঘবদ্ধ হও। কিন্তু পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কিছু করো না। তাহলে তোমাদের ভবিষ্যৎ সাধনা অংকুরে বিনষ্ট হবে।

আত্ম বলিদান ছাড়া কোন মহৎ কাজ অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু বাগাড়ম্বরে কাজ এগোয় না। খুব সাবধান, তোমাদের শত্রু যেন কোন প্রকারে তোমাদের হাঁড়ির খবর না পায়। তাই বলে ভীরুতাও অবলম্বন করো না। সত্য ও ধর্ম জয়যুক্ত হবেই।

কাজ চাই, শুধু বাগাড়ম্বর নয়। কাজে ব্রতী হলে তোমাদের পাশে

আমাদের দেখতে পাবে। সোনার বাংলার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তোমরা দল বাঁধো। সংগ্রামের দিন সমাগত। ভারতের অন্যান্য জাতিরা প্রস্তুত। তোমরা বাঙালী ভাইসব পিছনে পড়ে থেকো না। এগিয়ে চলো। সকলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে।'

[I. B. Records, F. N. 477-1907. P-1-4]

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ততদিনে শুরু হয়ে গেছে বয়কট আন্দোলন। কেউ আমরা বিলিতি জিনিস কিনবো না। দেশী জিনিসই আমাদের ভাল। সবাই আমরা বয়কট করবো বিলিতি দ্রব্য।

বঙ্গ ভঙ্গের ঘোষণা শুনে অরবিন্দ কিন্তু সেদিন খুশিই হয়েছিলেন মনে মনে। আঘাত আসুক। আরো আঘাত আসুক। যত আঘাত আসবে, ততই জাতি রুখে দাঁড়াতে শিখবে সাহসের সঙ্গে। তাইতো আজ সবচাইতে বেশী কাম্য।

'He (Aurobinda) regarded the partition of Bengal as the greatest blessing that had ever happened in India. No other measure could have stirred national feeling so deeply or roused it so suddenly from lethergy of previous years.'

বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সবাই সেদিন রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আমরা সবাই বাঙালী। সবাই আমরা ভাই ভাই। বঙ্গভঙ্গ আমরা মানি নে, মানবো না।

স্বয়ং বিশ্বকবির কণ্ঠে শোনা গেল এক অবিস্মরণীয় সংগীত :

'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান—'

উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন বাংলার আনন্দমোহন বসু :

'Lord Curzon has done us indeed a signal service and enabled us to lay the priceless foundation of our new national life. Our present troubles herald a new birth ; we are going to see the birth of a new nation.'

[প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জন আমাদের উপকারই করেছেন। জাতীয় জীবনে

ভিৎ পত্তনে তিনি আমাদের প্রভুত উপকার করেছেন। এর ফলে এক নতুন জাতির জন্ম আমরা দেখতে পাবো।]

শুরু হল দেশব্যাপী আন্দোলন।

বিলিতি দ্রব্য বয়কট করুন। কেউ বিলিতি জিনিস কিনবেন না। দেশের অর্থ দেশেই রাখুন।

ফল হল মারাত্মক। বয়কটের ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হল শ্বেতাঙ্গ বণিকদের। সরকারী মুখপাত্র স্টেটসম্যানের ভাষায়ঃ

'The Government will recognise the new note of practicality which the present situation has brought into political agitation.'

বিলেতের ভীত আতঙ্কিত 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকার মন্তব্যঃ

বাঙালীরা বয়কট নামে এক নতুন পন্থা গ্রহণ করেছে। তাদের প্রতিবাদের এই নতুন অস্ত্র দেখে কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেও আমরা কিন্তু তাদের দলে নই।

'The people of Bengal, buffled in all their attempts to make their protests avail by other means have now united to adopt the method of Boycott, that particular weapon, and we are not among those who prefess to smile at it.'

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন স্যার হেনরী কটনঃ

বাঙালীরা চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে পেশোয়ার পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে।

'Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from Peshwar to Chittagong.'

তবে মোক্ষম কথাটি বললেন লর্ড কারমাইকেলঃ বিপ্লব আন্দোলন অনায়াসে আমরা থামাতে পারতাম, যদি বাংলার ইনটেলেকচুয়েলরা এর পেছনে না থাকতেন।

আরো স্পষ্ট করে বললেন লর্ড রোনাল্ডশেঃ রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, টেগোর, বঙ্কিম—'These intellectual stalwarts are behind this movement. How to stop it !'

মল্লিকা, অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, গান্ধীজীই বুঝি বয়কট বা বিলিতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রবক্তা। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে। গান্ধীজী তখন কোথায়। তিনি তো ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এসেছিলেন আরো পনের বছর পরে।

গান্ধীজী গোটা জাতিকে গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন একথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে বাঙালী তার বহু আগে থেকেই গণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। তাই তো সেদিন গোখেলের মত দেশ নেতা মুগ্ধ সম্ভ্রমে বলেছিলেন—'What Bengal thinks today, India will think tomorrow.'

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তখন ঝড় উঠেছে সারা দেশে। উদ্দাম ঝড়।

একই সুরে সুর মিলিয়েছে বিভিন্ন পত্রিকাগুলি। সমানে তারা আগুন ছড়িয়ে চলেছে বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ আমরা মানি নে, মানবো না।

দলের তরুণবৃন্দ তখন রীতিমত চঞ্চল। বসে থাকলে চলবে না। একটা কিছু করতেই হবে। জাতির ঘুম ভাঙানোর জন্য সবার আগে চাই একটি পত্রিকা।

অবশ্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এ ব্যাপারে খুবই তৎপর, তবু নিজস্ব একটি পত্রিকা না হলেই নয়।

১৯০৬ সালের ১৮ই মার্চ সর্ব প্রথম প্রকাশিত হল 'যুগান্তর' পত্রিকা।

তখন যুগান্তর ছাপা হতো ৭নং শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে গোপনে। অফিস ছিল ৩১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে।

সম্পাদক বলতে নির্দ্দিষ্ট কেউ ছিলেন না। স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু প্রমুখ দলীয় সদস্যরাই দেখাশোনা করতেন সবাই মিলে।

শুরুতেই জয় জয়কার। প্রথমে পাঁচ হাজার। দেখতে দেখতে তার প্রচার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বিশ হাজারে।

সবার মুখে তখন একটিমাত্র নাম—যুগান্তর! যুগান্তর! যুগান্তর! বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। সেদিন যুগান্তরের ঘুম ভাঙানীয়া গান এক নতুন অনুরণন তুলেছিল তাদের সর্বদেহে, প্রতি রক্ত বিন্দুতে।

কেন যুগান্তর পত্রিকার এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। কি রহস্য লুকিয়ে থাকতো তার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে।

এ সম্বন্ধে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টে কি বলা হয়েছে দেখা যাক।

"যুগান্তর পত্রিকা শাসকদের বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। এর প্রতি ছত্রে বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায় এবং বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ভাবপ্রবণ যুবকদের উপর প্রভাব

বিস্তার করার জন্য যুগান্তর নানাভাবে কৌশল অবলম্বন করে থাকে।"

অন্যদিকে সন্ধ্যা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও কম যান না। বিশেষ করে ছড়ার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

শেষ পর্যন্ত রাজরোষ। ১৯০৭ সালের ১লা জুলাই সর্ব প্রথম পুলিশ হানা দিল যুগান্তর কার্যালয়ে। গত ২রা জুন যুগান্তরে 'লাঠ্যোষধি' ও 'ভয় ভাঙা' নামে যে লেখা দুটি প্রকাশিত হয়েছে তা রাজদ্রোহকর। সুতরাং, এ পত্রিকার সম্পাদককে চাই।

সম্পাদক তো সবাই। কিন্তু সে কথা বললে পুলিশ তা শুনবে কেন। তাই সম্পাদক হিসাবে এগিয়ে আসতে হল স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত কিংসফোর্ডের বিচারে সাজা দেওয়া হল ছয় মাসের কারাদণ্ড। আদালতে দাঁড়িয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন ভূপেন্দ্রনাথ— দেশের জন্য যা ভাল বুঝেছি করেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো।'

পরদিনই ছড়া কাটলেন সন্ধ্যা সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ঃ

"মাই নেম ইজ কিং ফর্দ
আই এ্যাম এ গ্রেট মর্দ
পেটের জ্বালায় আই কেম হিয়ার
ইন দিস নেটিভ ভারত এ্যাম্পায়ার
মাই গুড লাক এ্যাণ্ড ফেথ
করে দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট।'

৩০শে আগস্ট গ্রেপ্তার করা হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে। সেই সঙ্গে আরো দুজন। ম্যানেজার সারদা সেন ও মুদ্রাকর হরিচরণ দাস। অপরাধ— সন্ধ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ। (১) এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে। (২) ছিদিশনের হুড়ুমদুড়ুম—ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম। (৩) বাচ্চা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন।

শাস্তি অনিবার্য। কারণ, ব্রহ্মবান্ধব ব্যঙ্গ করে লিখেছেনঃ

'ফিরিঙ্গি বড়ই দয়ালু
ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাঁকালু।"

ব্রহ্মবান্ধবের মুখে কিন্তু সর্বক্ষণ এক কথা। আমাকে সাজা দেবার সাধ্য কোন বিদেশী সরকারের নেই।

মামলার দিন ধার্য হল ১৯০৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর।

বিচারক কিংসফোর্ডকে ব্যঙ্গ করার জন্য নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মবান্ধব আদালতে

হাজির হলেন চেলী পরে, মাথায় টোপর দিয়ে বরের বেশে। তারপরই আদালতের কাছে দাখিল করলেন এমন একটি লিখিত বিবৃতি, যা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল তখনকার দিনে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

'I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say I am the writer of the article, Ekhan Theke Gechi premer Dai which appeared in the Sandhya of the 13th August 1907, being one of the article forming the subject matter of this prosecution.

But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj I am in any way accountable to the alien people, who happen to rule over us and whose, interest is and must necessarily be in the way of our true national development.'

[সন্ধ্যা পত্রিকা পরিচালনা ও প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমার। ১৯০৭ সালের ১৩ই আগস্ট প্রকাশিত 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' নিবন্ধটি আমিই লিখেছি। বিচারে কোন রকম অংশ গ্রহণ করতে আমি রাজী নই। কারণ, স্বদেশী ব্রত উদ্‌যাপনে আমার কাজের জন্য আমি কোন বিদেশী জাতির কাছে—যে জাতি বর্তমানে আমাদের শাসক এবং যাদের স্বার্থ আমাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায়স্বরূপ—তাদের কাছে কোন রকম জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।]

সাবাস! পরদিনই ব্রহ্মবান্ধবকে অভিনন্দন জানাল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা।

'Never in the history of seditions trial in India has a statement so bold—so straightforward and so dignified been filed. The statement is in every way worthy of the Editor of Sandhya'.

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রদ্রোহকর মামলার ইতিহাসে এমন সাহসিক, স্পষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি আর কেউ কখনো দিতে পারে নি। এ বিবৃতি সন্ধ্যা-সম্পাদকেরই উপযুক্ত।

পরবর্তী দিন ধার্য হল ৩০শে সেপ্টেম্বর।

শুরুতেই প্রশ্ন করলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড,—অভিযোগ সম্বন্ধে আসামীর কি বক্তব্য জানতে চাই।

নতুন কোন বক্তব্য রাখলেন না ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তার এক কথা—'I have said my say'. যা বলার সেদিনই তো বলে দিয়েছি।

'You refuse to plead guilty or not guilty.'

ব্রহ্মবান্ধবের উত্তর—'I have already made a statement. I don't want to say anything more.' আগেকার বিবৃতিতেই সব বলে দিয়েছি। নতুন করে বলার কিছু নেই।

সেদিনের মত মামলা মুলতুবি রাখলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। আবার তারিখ পড়ল বেশ কিছুদিন পরে।

সগর্বে মাথা উঁচু করে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তখনো তাঁর মুখে সেই একই কথা। আমাকে সাজা দেবার সাধ্য কোন বিদেশী সরকারের নেই।

নিজের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ২৭শে অক্টোবর তারিখেই তিনি আর এক জগতে চলে গেলেন বিদেশী সরকারকে ফাঁকি দিয়ে।

বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। বলতে গেলে তখনকার সময়ের সবচাইতে বিতর্কিত মানুষ ছিলেন বোধহয় এই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

'তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপর পক্ষে,—বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণা করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন, আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু মুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালী জাতিকে কৃশ করে দেবে—এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল।

বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না।

সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম—এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের

রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইংগিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড় প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।'

[রবীন্দ্র রচনাবলী : ত্রয়োদশ খণ্ড : পৃঃ-৫৪১-৫৪২]

পৃথিবীতে স্বনামধন্য কবির অভাব নেই, কিন্তু 'বিশ্বকবি' বলতে একজনকেই বোঝায়। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখযোগ্য,—এই 'বিশ্বকবি' বিশেষণটি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েরই দেওয়া।

শুধু যুগান্তর ও সন্ধ্যাই নয়। বন্দেমাতরমও রেহাই পায় নি কিংসফোর্ডের রোষদৃষ্টি থেকে।

বন্দেমাতরম ইংরেজী পত্রিকা। কিন্তু এই নামগোত্রহীন প্রবন্ধটি কার লেখা! নিশ্চয়ই অরবিন্দের। অরবিন্দ ছাড়া এমন ইংরেজী লেখা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং অবিলম্বে গ্রেপ্তার করো অরবিন্দকে।

কিন্তু প্রমাণ! সত্যই যে এটা অরবিন্দের লেখা তার প্রমাণ কোথায়?

ডাকা হল দেশ বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে। তুমি এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সাক্ষী হিসাবে তোমাকে বলতেই হবে যে প্রবন্ধটা কার লেখা।

লিখেছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল আদপেই কোন সাক্ষ্য দিতে রাজী নন। তাঁর সাফ কথা :

'I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of Popular freedom and the interest of public. I have objection to swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with case.'

[এ মামলায় অংশ গ্রহণে আমার আপত্তি রয়েছে। কারণ, আমি মনে করি যে, এ মামলা গণ স্বাধীনতার স্বার্থ ও শান্তির বিরোধী। তাই কোন রকম শপথ গ্রহণেও আমি আপত্তি জানাচ্ছি। এ সম্পর্কে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজী নই।]

সেদিন আর আজ এক নয় মল্লিকা। কথায় কথায় আদালতের নির্দেশ অমান্য করা, আদালত গৃহে অকারণে উদ্ধতভাবে তর্ক বিতর্ক করা বা শ্লোগান দেওয়া এখন আর নতুন কোন ঘটনা নয়। সেদিন কিন্তু এসব চিন্তাও করা যেতো না। তাই বিচারকের নির্দেশ অমান্য করার দরুন আদালত অবমাননার দায়ে কিংসফোর্ড তাঁকে সাজা দিলেন ছয় মাসের কারাদণ্ড। একই সাজা দেওয়া হল মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে। অরবিন্দকে দেওয়া হল মুক্তি। তারিখটা ছিল ১৯০৭ সালের ২৬শে আগস্ট।

বাইরে তখন বিরাট জনতা। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। সবার মুখে একই প্রশ্ন। বিচারে কি হল। কি সাজা দিলেন মিঃ কিংসফোর্ড।

ভীড় সামলাতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট হুয়ে হঠাৎ তার হাতের বেটন দিয়ে আঘাত করে বসল বিপ্লবী তরুণ সুশীল সেনকে। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ঘুঁষি চালালেন সুশীল সেন। মার খেয়ে মার হজম করবো, সে বান্দা আমরা নই। এবার দেখ যে, পাল্টা মার দিতে পারি কিনা।

খবর শুনে লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল কিংসফোর্ডের। এত বড় সাহস ঐ উদ্ধত ছেলেটার। শেষে কিনা রাজার জাতের গায়ে হাত দেওয়া। লাগাও ওকে পনের ঘা বেত। হুকুম পালিত হল যথা সময়েই।

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন বাংলা দেশের উপর দিয়ে। সর্বত্র প্রতিবাদ। সর্বত্র বিক্ষোভ। সুশীল তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। পরদিন মহাবিদ্যালয় বন্ধ রাখা হল সুশীলের প্রতি সম্মানার্থে।

২৮শে আগস্ট বিরাট প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হল কলেজ স্কোয়ারে। স্বয়ং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সুশীলের প্রতি সম্মান দেখালেন একটি স্বর্ণপদক দিয়ে। তুমি জাতীয় বীর। যেভাবে তুমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছ তার তুলনা নেই।

সবশেষে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল। সবার কণ্ঠে সেদিন কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের গান:

'যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কি সেই মায়ের ছেলে'?

বিপ্লবী দল এত অল্পেতে খুসি নয়। তাদের সাফ কথা: বদলা চাই। যে কিংসফোর্ড সুশীলের রক্ত ঝরিয়েছে, তার রক্ত চাই। কি করে নি এই কিংসফোর্ড বাংলাদেশে। কি করতে বাকী রেখেছে। 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম', 'নবশক্তি'—প্রতিটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাকে সে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছে। এক 'যুগান্তর'কেই সে সাজা দিয়েছে তিনবার। তার উপর কিনা সুশীল সেনকে বেত্রাঘাত।

না, আর নয়। ও'র ঐ সীমাহীন দম্ভকে এবার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বোবা গরুর মত নিঃশব্দে মার খাবার দিন আর নেই।

সবার অলক্ষ্যে অতি সঙ্গোপনে আলোচনায় বসলেন তিনজন। সুবোধ মল্লিক, চারু দত্ত এবং অরবিন্দ স্বয়ং।

রক্ত—২

আলোচ্য বিষয়—বর্তমান পরিস্থিতি। কি করা যায় এখন। কোন পথে এগনো যায়।

ইতিমধ্যে কয়েকবারই চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনটাই তেমন কাজে আসে নি।

প্রথম টার্গেট—পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার। দুর্ভাগ্য, শিলং, বরিশাল, রংপুর—সর্বশেষে নৈহাটি স্টেশনে ছায়ার মত পেছনে পেছনে ঘুরেও তাঁকে পাল্লার মধ্যে পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী প্রচেষ্টা পশ্চিম বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ড্রুজ ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। পর পর দুবার। প্রথমবার ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মাঝামাঝি জায়গায়। পরে ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে। নারায়ণগড়ে বিস্ফোরণ ঘটেছিল ঠিকই, গাড়িরও ক্ষতি হয়েছিল কিছুটা, কিন্তু লাটসাহেব অক্ষতই রয়ে গেছেন দৈবক্রমে।

অবশ্য ২৩শে ডিসেম্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলির আঘাতে ঘায়েল হতে হয়েছে গোয়ালন্দে, তবে কপাল জোরে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে লোকটা।

তবে আসল টার্গেট এখন কিংসফোর্ড। ওকে ওর প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে। ওর ক্ষমা নেই।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেছে সবার অলক্ষ্যে। প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত বোমাবিশারদ হেমচন্দ্র কানুনগোর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি 'Bomb Book' টি পরেশ মৌলিক ঠিকই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন কিংসফোর্ডের বাংলোতে। একবার মলাট উল্টালে আর রক্ষে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ।

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, বইটা তিনি খুলেও দেখলেন না একবার। যেমন ছিল, তেমনিভাবেই রেখে দিলেন সেলফ-এর উপর। বরাত ছাড়া কি আর বলা যায় এটাকে!

এদিকে সতর্কতা হিসেবে ইতিমধ্যেই কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে বদলী করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মজঃফরপুরে। তা হোক। মজঃফরপুর কেন, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে আত্মগোপন করলেও এবার আর তার রেহাই নেই। পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের প্রতিদানে পনেরোটি তাজা বুলেট তার জন্য তোলাই রয়েছে।

১৯০৮ সাল। এপ্রিল মাস।

ঘটনার পাঁচদিন আগে মজঃফরপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ওরা দুজন। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী।

কেউ কারো পরিচয় জানেন না। ইচ্ছা করেই জানানো হয় নি। কারণ—

মন্ত্রগুপ্তি।

ক্ষুদিরামকে বলা হয়েছিল—তোমার সংগীর নাম দীনেশ রায়। অপর পক্ষে প্রফুল্ল চাকীর ধারণা—তার সংগীটি হরেন সরকার ছাড়া কেউ নন।

অবশ্য প্রফুল্ল চাকীর কাছে মজঃফরপুর নতুন নয়। কিছুদিন আগেও তিনি একবার ভাল করে খোঁজখবর নেবার জন্য এখান থেকে ঘুরে গেছেন সুশীল সেনকে সংগে নিয়ে। সেই সুশীল সেন, যাকে কিংসফোর্ড পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন কলকাতায় অবস্থানকালে।

কথা ছিল—এবারও তিনিই আসবেন প্রফুল্ল চাকীর সংগী হিসাবে, কিন্তু বাদ সাধলেন অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো এবং ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেন বসু। তাঁদের দাবী—ক্ষুদিরামকে একটা সুযোগ দিতেই হবে এবারের অ্যাকশনে। তাই ক্ষুদিরামকেই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত করা হয়েছে সুশীল সেনের পরিবর্তে।

অবশ্য সুশীল সেনকেও আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। মাত্র কয়েক বছর বাদেই তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন সবার অগোচরে। সেকথা তোমাকে বলব যথাসময়ে।

কলকাতা থেকে মজঃফরপুর। আশ্রয় নিলেন ধর্মশালাতে। দলের সংগঠক ছোট ভাই বারীন ঘোষের প্রতি প্রধান নেতা অরবিন্দের নির্দেশ ছিল—মনে রেখো, 'A revolver is much easier than a bomb,' তাই সতর্কতা হিসেবে বোমা এবং রিভলবার দুই-ই তাদের সংগে দেওয়া হয়েছে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে।

২৭শে এপ্রিল, সোমবার। দুজনেই তখন অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত। কোথায় কি ভাবে পাল্লার মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কিংসফোর্ডকে। অবশ্য ধর্মশালা থেকে কিংসফোর্ডের বাংলোর দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়, কিন্তু ওখানে ঢুকে প্ল্যান কার্যকরী করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

প্রথমতঃ, বাংলোর ফটকে রয়েছে সদাসতর্ক সশস্ত্র প্রহরী তহশীলদার খান ও ফৈজুদ্দিন খান। তাছাড়া রয়েছে তাঁর ফিটন গাড়ির সহিস কালীরাম। ওদের নজর এড়িয়ে বাংলোর ভেতর ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

২৮শে এপ্রিল, মঙ্গলবার।

আদালতে কাজকর্ম শুরু হয়েছে যথারীতি। লোকজনের ব্যস্ততার অন্ত নেই।

ভীড়ের মধ্যে মিশে রয়েছেন ওরা দুজন। মনে সেই একই চিন্তা। এখান থেকে বোমা চার্জ করলে কেমন হয়। দা-১২৭৩৭

না, অসম্ভব। উকিল, মোক্তার, মুহুরী ও অন্যান্য লোকজনের ভীড়ে আদালতগৃহ একেবারে ভর্তি। বিস্ফোরণের ফলে নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেটা কোনমতেই কাম্য নয়।

২৯শে এপ্রিল, বুধবার।

দলনেতা অরবিন্দর একটি অগ্নিঝরা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায়।

'Revolution, bare and grim, is preparing her battle-field moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could wish it otherwise. But God's will be done !'

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ওরা দুজন। আর দেরী নয়। জানা গেছে—কিংসফোর্ড রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে যান তাঁর ফিটনে চেপে।

ফিরে আসেন রাত আটটা নাগাদ। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

'Failure is the pillar of success.'

ইতিপূর্বে ফুলার এবং ফ্রেজার দুজনই হাতছাড়া হয়ে গেছে। অ্যালেন গুলি খেয়েও বেঁচে গেছে শেষ পর্যন্ত। কিংসফোর্ডও ইতিপূর্বে একবার Bomb Book এর হাত থেকে বেঁচে গেছে ভাগ্যের জোরে। এবার যেন কোনমতেই সে ফসকে যেতে না পারে।

তাছাড়া সুবিধাও রয়েছে। কাল অমাবস্যা। স্বভাবতই পথঘাট অন্ধকার থাকবে কিছুটা। আত্মগোপন করার পক্ষে কালকের রাতটা খুবই সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। বৃহস্পতিবার।

অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না।

সামনেই ইয়োরোপীয়ান ক্লাব। বাইরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন। চোখে মুখে অধীর প্রতীক্ষা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

ক্লাবঘরের আলো ঝলমল কক্ষে তখন উৎসবের বন্যা। শুধু নাচ আর গান। নারী আর সুরা।

ওরা নির্বিকার। এই উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু একমাত্র ভাবনা—কখন বেরিয়ে আসবে কুখ্যাত জেলা জজ কিংসফোর্ড। আর কত দেরী।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এক্ষেত্রেও তাই হল মল্লিকা। হঠাৎ সব কিছু ভেস্তে গেল কিংসফোর্ডের একটি অভাবনীয় সিদ্ধান্তের ফলে।

ব্যারিস্টার পত্নী মিসেস কেনেডি ও মিস্ কেনেডি তখন বেশ বিচলিত। বারবার তাঁরা তাকাতে শুরু করেছেন ক্লাবঘরের দেয়াল ঘড়িটার দিকে। রাত আটটা বাজতে চলেছে। বাংলো থেকে এখনো কেন সহিস আসছে না তাদের ফিটন গাড়িটা নিয়ে! এত দেরী হবার কারণ কি! এমন তো হয়নি কোনদিন।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে সহাস্যে বললেন কিংসফোর্ড: অত চিন্তার কিছু নেই। বরং আমার ফিটনটা নিয়ে তোমরা চলে যাও। আমার সহিস কালীরামকে আমি বলে দিচ্ছি। সে তোমাদের পেঁছে দিয়ে আসবে বাংলোতে। আমি না হয় কিছুক্ষণ পরেই যাব এখান থেকে।

—ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ও মিস্ কেনেডি। সত্যিই রাত হয়ে গেছে। আর দেরী করাটা ঠিক নয়।

ওদিকে ওরা তখন প্রস্তুত। ঐ যে কালীরাম ক্লাবঘরের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে পরিচিত ফিটন গাড়িটা নিয়ে। আর দেরী নেই। একেবারে কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। রেডি প্লীজ! ওয়ান টু থ্রী—বুম্‌ম্‌ম্‌! বুম্‌ম্‌ম্‌...

রাতের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে ভেঙে পড়ল বিস্ফোরণের শব্দে। কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া।

বোমা নিক্ষেপ করেই ওরা দুজন ছুটে চললেন অনির্দেশভাবে। খবরটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে। সর্বাগ্রে এখন পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে দূরে সরে যাওয়া প্রয়োজন।

ওদিকে বিস্ফোরণের ফলে মিস কেনেডি মারা গেলেন সেই রাত্রেই। মিসেস কেনেডি মারা গেলেন আরো আট ঘণ্টা পরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার ঘোষণা করা হল পুলিশ দপ্তর থেকে। আততায়ীকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। কারো পায়েই জুতো নেই। জুতো তারা ফেলে গেছে ঘটনাস্থলেই। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে আটক করবে।

সারা রাত একটানা হেঁটে পরদিন ভোরে ওয়াইনী স্টেশন—এখন যার নাম পুশা রোড স্টেশন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্ষুদিরাম তখন রীতিমত কাতর। পা যেন আর চলতেই চায় না।

কিছু খাবার পাওয়া যায় না এখানে! ঐ তো সামনে একটা দোকান

দেখা যাচ্ছে। হয়তো কিছু মিলে যেতে পারে ওখানে। দেখাই যাক না।

কাছেই দাঁড়িয়ে ফতে সিং ও শিবপ্রসাদ মিশ্র নামে দুজন কনস্টেবল। চোখের তারায় তাদের সন্দেহের ঝিলিক। ছেলেটি কে! সারা গায়ে ওর এত ধুলোবালি কেন! মনে হয়, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। পায়েও দেখছি জুতো নেই। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বিদ্যুৎবেগে পকেটে হাত দিলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু তার আগেই ফতে সিং ও শিবপ্রসাদ মিশ্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখের পলকে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ১৯০৮ সালের ১লা মে সকাল ঠিক ন'টায়। তল্লাসীর ফলে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও তাঁর পকেটে পাওয়া গেল ত্রিশটা বুলেট, তিনটি দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো পয়সা আর টাইম-টেবিলের একটি ছেঁড়া পাতা।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। একজন আসামী ধরা পড়েছে ওয়াইনী স্টেশনে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন পুলিশ সুপার মিঃ আর্মস্ট্রং। কোথায় আসামী। আমি তাকে দেখতে চাই।

আসামীকে দেখে আর্মস্ট্রং অবাক। আশ্চর্য, ছেলে তো নয়, ঠিক যেন স্বর্গের দেবদূত। সারা মুখে কি শিশুর সারল্য ওর। দেখে বিশ্বাস করাও যেন শক্ত।

সেদিনই বিকেল পাঁচটায় আর্মস্ট্রং মজঃফরপুর ফিরে এলেন বন্দী ক্ষুদিরামকে সঙ্গে নিয়ে।

ততক্ষণে গোটা শহরটাই বুঝি ভেঙে পড়েছে মজঃফরপুর রেলস্টেশনে। এই সুযোগে তারা বাংলার বন্দী বীরকে একবার দেখতে চায়। চায় অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে মাটিতে পা দিলেন ক্ষুদিরাম। সারা মুখে তার সলজ্জ স্মিত হাসি। যেন এটা একটা খেলামাত্র।

হাসতে হাসতেই একবার তিনি তাকালেন জনতার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন বাইরে নির্দিষ্ট ফিটন গাড়িটার দিকে। যেতে যেতে বারবার তিনি ধ্বনি দিতে লাগলেন: বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম।

সরকারী মুখপাত্র স্টেটসম্যানের ভাষায়:

'The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite

determined.

He came out of a first class compartment and walked all the way to pheaton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety...on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram.' [The Statesman : 2-5-1908]

প্রফুল্ল তখনো নিরাপদ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে তিনি পেঁছে গেলেন বত্রিশ মাইল দূরবর্তী সমস্তিপুরে। সামনেই রেল কোয়ার্টার। তারই এক পাশ দিয়ে ক্রমশঃ তিনি এগিয়ে চললেন স্টেশনের দিকে।

কে যায়! দাঁড়ান! কাছে এসে দাঁড়ালেন একটি অপরিচিত যুবক, ওদিকে এখন যাবেন না। আমার সঙ্গে আসুন। সময় হলে আমিই আপনাকে তুলে দিয়ে আসবো গাড়িতে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন প্রফুল্ল। কে এই যুবক? পুলিশের কেউ নয়তো! কিন্তু না, ওর সারা মুখে সহজ সরল আন্তরিকতা ছাড়া কিছুই নেই। ওকে বিশ্বাস করা চলে।

ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি এক প্রস্থ নতুন জামা কাপড় ও জুতো এগিয়ে দিলেন যুবকটি। নিন, তাড়াতাড়ি পোষাকটা পাল্টে ফেলুন। আর ওগুলো দিন আমার হাতে।

সন্ধ্যার পরে ভাল করে সবদিক দেখে শুনে নিয়ে যুবকটি নিজে গিয়ে প্রফুল্লকে স্টেশনে পেঁছে দিয়ে এলেন সত্যিকারের বন্ধুর মত। প্রফুল্লকে চিনতে তার বাকী নেই। বাঙালী হিসেবে দেশের এই মুক্তিকামী তরুণকে সহায়তা করা তার জাতীয় কর্তব্য।

কে এই দেশপ্রেমিক তরুণ! নাম তার—ত্রিগুণাচরণ ঘোষ।

প্ল্যাটফর্মে নানাজাতীয় লোকের ভীড়। সবাই অপেক্ষা করছে কলকাতার গাড়ির জন্য।

সবার আড়ালে চুপচাপ বসে প্রফুল্ল। কত কথা ভীড় করে আসে মনে। একটার পর একটা। অসংখ্য।

মনে পড়ে সমস্তিপুরের সেই বন্ধুটির কথা। আশ্চর্য, ট্রেন ভাড়াটা পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন নিজের পকেট থেকে। তাকে ঘেঁসতেই দেননি কাছে কিনারে। সবকিছু জেনেশুনেও না জানার ভান করে যে ভাবে তাকে তিনি আগলে রেখেছিলেন, তার তুলনা কোথায়?

'পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের

অপেক্ষা দেশের মানুষের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয় শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে।'

বাংলার মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই কথাটি মিথ্যে নয় মল্লিকা। নইলে এ কাহিনীতে একই সঙ্গে ত্রিগুণাচরণ ঘোষ ও নন্দলাল ব্যানার্জীর মত দুটি বিপরীতধর্মী লোককে পাশাপাশি দেখা যাবে কেন?

ছদ্মবেশী নন্দলাল ব্যানার্জী আসলে সিংভূমের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর। মজঃফরপুরের সরকারী উকিল শিবচন্দ্র চ্যাটার্জীর দৌহিত্র। মজঃফরপুরে ছুটি কাটিয়ে মনের আনন্দে সে ফিরে চলেছে কলকাতায়।

প্রফুল্লকে দেখেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল সন্দেহের কুটিল রেখা। কে এই ছেলেটি! হত্যাকারীদের কেউ নয়তো?

তারপর অযাচিতভাবে প্রফুল্লর সঙ্গে কত আলাপ। কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি! বেশ ভালই হল। দুজনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আসুন কিছু খাওয়া যাক। আমার সঙ্গেই রয়েছে। না না, লজ্জার কি আছে! নিন, ধরুন। শুরু করুন।

মুখোশ খুলে গেল মোকামাঘাট স্টেশনে। নন্দলাল তখন একটানা হেঁটে চলেছে—কুলি! কুলি!

না না, কুলি কেন! আমিই পারবো। তাড়াতাড়ি নন্দলালের মালগুলো কাঁধে তুলে নিলেন প্রফুল্ল। কিন্তু একি! চারপাশে তাঁর এত পুলিশ কেন! নন্দলালের চোখে-মুখেই বা ধূর্ত হায়েনার মত হাসি দেখা যাচ্ছে কেন?

প্রচণ্ড ঘৃণায় নিমেষে ফুঁসে উঠলেন প্রফুল্ল—'এই আপনার বন্ধুত্ব। তাহলে দেখুন, বাঙালী কত সহজে মরতে পারে।'

কথাটা বলেই পিস্তল নিয়ে নিজের কপালে লক্ষ্য স্থির করলেন প্রফুল্ল। মুহূর্ত মাত্র, তারপরই তাঁর দেহটা লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে।

ছদ্মবেশী নন্দলাল যে সেদিন বন্ধুত্বের মুখোশ পরে তলে তলে কতখানি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছিল, তার কিছু কিছু বিবরণ তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকে আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি মল্লিকা।

দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্লচন্দ্র চাকীর আত্মহত্যার বিবরণ

'ক্ষুদিরাম যে যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশের নিকট তাহাকে দীনেশচন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।

মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পেঁছে ও সেখান হইতে একখানা নূতন কাপড় ও একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকেট লইয়া রাত্রির গাড়িতে মোকামাঘাটের দিকে রওনা হয়।

সমস্তিপুরে প্রফুল্লের নতুন কাপড়, জুতা, ফুলো পা দেখিয়া একজন পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টরের মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের গভর্নমেণ্ট উকিলের নাতি।

নন্দলাল রাঁচিতে কার্যস্থলে যাইতেছিল। প্রফুল্লর প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল এবং পুলিশের চতুরতার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে দেশের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মত সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল।

ফেরি স্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পেঁীছিল। প্রফুল্ল তরুণবয়স্ক বালক। সে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনা বোধ করে, তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

স্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিসপত্র নিজের কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল—নন্দলালকে কুলী নিযুক্ত করিতে দিল না। এদিকে নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল এবং প্রফুল্ল প্লাটফর্মে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল, গ্রেপ্তার কর। প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চিৎকার করিয়া বলিল—'তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ?'

একজন কনস্টেবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনস্টেবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হটিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ অপর একদিক হইতে আর একজন কনস্টেবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

এদিকে ভূপতিত কনস্টেবল আবার অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পালাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল। পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপতিত হইল।

প্রফুল্লের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে আনা হইল। বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল। সে বলিল—ইহা আমার বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ। [সঞ্জীবনী : ১৪. ৫. ১৯০৮]

এবার তোমাকে তখনকার সময়ের অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে কিছুটা

বিবরণ পড়ে শোনাচ্ছি।

'The arrest and suicide of D. C. Roy were most sensational. He got as far as Samastipur station on the B. & N. W. Railway on friday, and took an inter class ticket from there to Mocamaghat where he alighted.'

...Finding retreat of no avail he turned round and fired at the constable nearest to him. The bullet missed and constable closed but deceased having some freedom used the pistol on himself, one shot entered under his chin and one over the left collarbone. He dropped dead bleeding profusely. The weapon was a browning pistol.' [7-5-1908]

সনাক্তকরণের পরে যে কাণ্ড করা হল তা বোধ হয় কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। প্রথমেই প্রফুল্লের মাথাটাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল দেহ থেকে। তারপর সেই মাথাটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতায়।

'The head of late D. C. Roy who shot himself at Mocama on being arrested has been brought to Calcutta for purpose of identification. It is preserved in spirits of wine.'

কটাক্ষ করে সঞ্জীবনী পত্রিকায় লেখা হল ঃ

প্রফুল্লের ছিন্ন মস্তক

'পুলিশের কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গলা কাটিয়া ফেলা হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া প্রফুল্লের ছিন্নমস্তক কলিকাতায় আনা হইল। ভাল করিয়া সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে।'

প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল দেশের সর্বত্র। তদন্তের নামে এ কি নৃশংস আচরণ। সভ্যতার নিদর্শন বটে!

বেগতিক দেখে পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার্স ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটা অজ্ঞাত স্থানে পুঁতে ফেলা হল প্রফুল্লের সেই মাথাটাকে। জায়গাটার আর কোন হদিস মেলে নি পরবর্তীকালে।

প্রফুল্ল হারিয়ে গেলেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম! তাঁর কি হল? কি হল বন্ধুত্বের মুখোশ পরা ঘৃণ্য দেশদ্রোহী নন্দলাল ব্যানার্জীর? নন্দলাল কি রেহাই পেয়েছিল সেদিনের বিপ্লবীদের হাত থেকে? সে কথায় আমি আসছি আরো পরে।

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ! প্রফুল্ল চাকীর আত্মবিসর্জন! ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার!

শতাব্দীর ঘুম ভেঙে চমকে উঠল ভারতবর্ষ। বাঙালীর মাতৃজঠরে জন্ম নিল এ কোন অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম! এ যে অবিশ্বাস্য! অভাবনীয়! অকল্পনীয়!

অভিনন্দন জানালেন মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক। ২৬শে মে তিনি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে লিখলেন:

'ক্ষুদিরাম-নিক্ষিপ্ত এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের পরে এমনটি আর কোনদিন দেখা যায় নি।'

এখানেই থামলেন না তিনি। আবার লিখলেন ২২শে জুন তারিখে:

'এটা ঠিক যে, একটা বোমা দিয়ে সরকারের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যায় না, কিন্তু সামরিক শক্তির ঔদ্ধত্যের ফলে দেশের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই বোমার দ্বারাই শুধু সম্ভব।'

আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহের অপরাধে আটান্ন বছরের বৃদ্ধকে ছয় বছরের জন্য দ্বীপান্তর দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুদূর আন্দামানে। ফল কিন্তু ভালই হল মল্লিকা। কবির ভাষায়:

'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে।'

সত্যিই বাঁধন টুটে গেল। তাই রক্তচক্ষু দেখে ভয় না পেয়ে এবার কঠোর ভাষায় চাবুক হানলেন উত্তরপ্রদেশের 'স্বরাজ্য' পত্রিকার সম্পাদক শান্তি নারায়ণ। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর পথই সঠিক পথ। সেই পথেই চলতে হবে আমাদের সবাইকে।

ফল দাঁড়াল সেই একই। শান্তিরামকে দেওয়া হল দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড।

'একটা জাতি যখন জাগে, তখন হঠাৎ জাগে না। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলে হঠাৎ যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা-রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে। তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহুদিনের সাধনা।' [জেলে ত্রিশ বছর: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী]

বিপ্লবী মহারাজের এই কথাটি খুবই মূল্যবান মল্লিকা। বাংলা দেশে ক্ষুদিরামের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তার পেছনেও একটা বিরাট পটভূমিকা ছিল, যার ফলে ক্ষুদিরামের আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক

ছিল সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে।

বিপ্লবী লড়াই করে, কিন্তু তাকে ভাষা জোগায় কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক। পৃথিবীর সর্বত্রই তার নজীর রয়েছে। বিপ্লববাদের ইতিহাসে তলস্টয়, তুর্গেনিভ, গোর্কী, লু স্যুন, পল রোবসন, ভিক্টর জারা প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের বিরাট অবদানের কথা আজ কে না জানে!

সেদিন বাংলা দেশও তার ব্যতিক্রম ছিল না। নিস্তরঙ্গ নদীতে ঢেউ তুলেছিলেন যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। সে ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, সত্যেন দত্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, ডি. এল. রায়, শরৎচন্দ্র, নজরুল এবং শেষের দিকে কবি সুকান্ত ও এমনি আরো অনেকের অবদানের ফলে।

তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্য বা কাব্য—দেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। তাই নিত্য নূতন সৃষ্টির মাধ্যমে একটি বক্তব্যই তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বারবার, যার মূল কথা হল—'স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার—আমরা স্বাধীনতা চাই।'

ঢেউ থেকে প্লাবন। সে প্লাবনের সৃষ্টি করলেন লর্ড কার্জন। সেদিন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙালী জীবনে যে জাতীয়তাবাদের জোয়ার এসেছিল, তাতে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, শুধু প্লাবন নয়, সেই সঙ্গে ঝড়ও এবার আসন্ন।

তারপর সত্যিই একদিন ঝড় এল। এল সেদিন, যেদিন বরোদা রাজ্যের লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দ চলে এলেন কলকাতায়। তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল এক নতুন বাণী ঃ

We do not want a nation of women ; who only know how to weep and how not to strike.'

অর্থাৎ—একটা পৌরুষহীন জাতি আমরা চাই নে, যারা কেবল কাঁদতেই জানে, আঘাত করতে জানে না।

চমকে উঠল তরুণ সম্প্রদায়। এ কার কণ্ঠ! স্বামীজীর পরে এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠ তো আর কারো মুখ থেকে শোনা যায় নি।

অরবিন্দের নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষ আগেই কিছুটা বীজ রোপন করে রেখেছিলেন বাংলা দেশের উর্বরা জমিতে। এবার সেই বীজ থেকে অংকুর দেখা দিল অরবিন্দের উপস্থিতিতে। সোজা কথায়—আর আমরা পিঠ পেতে মার খেতে রাজী নই। এবার থেকে আমরা ঝুঝবো সমানে সমানে।

মল্লিকা, এই ছিল সেদিন বাংলা দেশের চেহারা। এ পরিস্থিতিতে এই

সুজলা সুফলা বাংলার মাটিতে যে শত শত ক্ষুদিরাম জন্মগ্রহণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি।

তবু তফাৎ একটু আছে বৈকি। বিপ্লববাদের প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল মহারাষ্ট্রে। তারপর বিশেষ করে বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অহিংস নীতির প্রভাবে অন্যান্য প্রদেশগুলি থেমে গেলেও বাঙালী কিন্তু তার ক্ষাত্রধর্মকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয় নি কোনদিনও। প্রমাণ—সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরব্যাপী রক্তাক্ত ইতিহাস। প্রমাণ—ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে ইম্ফল রণাঙ্গন পর্যন্ত।

যাক, ক্ষুদিরামের কথাতেই বরং ফিরে যাই। ১লা মে ওয়াইনি রেলস্টেশন থেকে ক্ষুদিরামকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। তারপরই সোজা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উডম্যানের কাছে। সেখানে তিনি কি বিবৃতি দিয়েছিলেন দেখা যাক ঃ

'আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাড়ি মেদিনীপুর।...আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে।

দীনেশের সঙ্গে আমার হাওড়ায় দেখা হয়। তাহার সঙ্গে একটা বোমা ছিল। সে বোমা তৈয়ার করিতে পারিত।

'আমার সঙ্গে ২টা রিভলবার ও কতকগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭।৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুর পৌঁছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ধর্মশালার নিকটে কিশোরীবাবুর বাসায় থাকি।

'আমরা সর্বদা কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম, কিংসফোর্ড কুঠি হইতে কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল তাহাতে অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলাম।

'৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ডের গাড়ি কখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ি আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

'আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন

দুইজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে।

'কলিকাতার এক গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম। যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।'

[সঞ্জীবনী : ৭ই মে, ১৯০৮]

মল্লিকা, এই হল ক্ষুদিরামের প্রথম বিবৃতি। বিবৃতির কয়েকটি কথা নিশ্চয় তোমার নজর এড়ায়নি : (১) ভুল করে দুজন নিরপরাধিনী মহিলাকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম মর্মাহত। (২) নিরপরাধ লোকের প্রাণহানির আশঙ্কায় সুযোগ পেয়েও কোর্টে তিনি বোমা নিক্ষেপ করেন নি। (৩) একখানা গাড়ি আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। অর্থাৎ—ঘটনার দায় দায়িত্ব সব তাঁর নিজের। সঙ্গী দীনেশ রায়কে (প্রফুল্ল চাকী) কোথাও তিনি জড়াতে চাননি এ ব্যাপারে।

৩রা মে প্রফুল্লর মৃতদেহ নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে।

স্বীকার করলেন ক্ষুদিরাম। হ্যাঁ, এ মৃতদেহ তাঁর সঙ্গী দীনেশ রায়ের।

—দীনেশ কোথায় থাকত বা পড়াশুনো করত বলতে পার ?

—ভাইয়ের কাছে বাঁকীপুরে থাকত। দীনেশ নিজেই আমাকে বলেছিল এ কথা।

—ভাইয়ের নাম কি ?

—বলতে পারবো না।

বলা সম্ভবও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্ল বাঁকীপুরের ছেলে নন, রংপুরের। থাকতেন মুরারীপুকুরের ঐতিহাসিক বাগান বাড়িতে। ক্ষুদিরাম তা জানতেন না। ইচ্ছা করেই সে খবর তাকে জানানো হয়নি। কারণ—'মন্ত্রগুপ্তি'।

দায়রা আদালতে বিচারযোগ্য মামলা বলে ২১শে মে তারিখে ক্ষুদিরামকে হাজির করা হল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই. বি. বার্থাউডের আদালতে।

এখানে নতুন করে আবার একটি বিবৃতি দিলেন ক্ষুদিরাম। খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু তার বিশেষ অংশটুকুই তুলে ধরছি তোমার সামনে :

—দীনেশের সঙ্গে কবে থেকে তোমার পরিচয় ?

—এখানে আসার পাঁচ সাতদিন আগে 'যুগান্তর' অফিসে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

—'যুগান্তর' অফিসে গিয়েছিলে কেন ?

—আমি মেদিনীপুরে যুগান্তর বিক্রি করতাম। কিছুদিন যাবৎ কাগজ পাচ্ছিলাম না। তাই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

—দীনেশের সংগে তোমার কি কি কথা হয়?

—একদিন আমি যখন খেতে বসেছিলাম, তখন দীনেশ আমার কাছে আসে। সে আমার পরিচয় জানতে চায়। নাম শুনে সে আমাকে চিনতে পারে, কারণ মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পুলিশ একটা মামলা করেছিল। কথাবার্তার পরে সে আমাকে জানায় যে, একটা কাজ করতে পারলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমি রাজি হই। তখন সে আমাকে শুক্রবার তিনটের সময় হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেখানে সে আমাকে কিংসফোর্ডের হত্যার কথা বলেছিল।

—তুমি রাজি হয়েছিলে?

—হ্যাঁ, নানাভাবে বোঝাবার পরে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম।

—দীনেশ তোমাকে কি কি বলতে নিষেধ করেছিল?

—রিভলবার কোথায় পেয়েছি, তা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিল। বলেছিল প্রয়োজন হলে আমি যেন অমূল্য দাসের নাম বলি।

—সে তোমাকে আর কিছু বলতে নিষেধ করেছিল কি?

—হ্যাঁ বলেছিল—আমি যেন তার কথা কাউকেই কিছু না বলি। প্রয়োজন হলে একথাই যেন বলি যে, 'যুগান্তর' এবং বড় বড় বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনেই আমি এ পথে এসেছি।

লক্ষ্য কর মল্লিকা, বিবৃতি দুটি বেশ পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু কেন? কি এর কারণ।

কারণ—সংগী প্রফুল্ল চাকী। প্রথম বিবৃতি কালে সংগী প্রফুল্ল চাকীর শেষ পরিণতির খবর ছিল তাঁর কাছে অজ্ঞাত। তাই সেদিন তাঁর লক্ষ্য ছিল—সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের উপর টেনে নিয়ে সংগী প্রফুল্ল চাকীকে সব রকম বিপদ থেকে আড়াল করে রাখা।

স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় বিবৃতিতে সে চেষ্টা তিনি আর করেননি। বরং এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এ কাহিনীর প্রধান নায়ক তিনি নন, প্রফুল্ল চাকী। কারণ, প্রফুল্ল তখন সব কিছু বিচারের উর্ধ্বে।

৯ই জুন মংগলবার অ্যাডিশনাল সেসন জজ মিঃ কর্নডফ-এর আদালতে শুরু হল আসল মামলা। সংগে রইলেন দুজন অ্যাসেসার। বাবু নাথুনি প্রসাদ আর জনক প্রসাদ।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বাঁকীপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ মানুক এবং সরকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার।

ক্ষুদিরামের পক্ষে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়ালেন মজঃফরপুরের

একজন দেশপ্রেমিক আইনজীবী কালিদাস বসু। আর প্রফুল্ল চাকীর পক্ষে রংপুর থেকে অযাচিতভাবে এগিয়ে এলেন সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। সাক্ষী সব মিলিয়ে মোট চব্বিশ জন। তাদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ সুপার আর্মস্ট্রং; বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল ব্যানার্জী, কনস্টেবল শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং, বাংলোর প্রহরী তহশীলদার খান ও ফৈজুদ্দিন খান, বিধ্বস্ত ফিটনের সহিস কালীরাম; ধর্মশালার ভৃত্য খৈমন কাহার; সর্বোপরি কিংসফোর্ড সাহেব স্বয়ং।

প্রথম দিনই সাক্ষ্য দিলেন বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল। প্রফুল্ল চাকীর ব্যাপারে নিজের কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে সবশেষে তিনি জানালেন :

'সেই রাত্রেই মৃতদেহে নিয়ে আমি মজঃফরপুরে ফিরে যাই। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং পাটনার পুলিশ সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বারুণী স্টেশনে মৃতদেহের ছবি তোলা এবং সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।'

পরদিন ১০ই মে কিংসফোর্ডের পালা। বেচারা কিংসফোর্ড! প্রাণভয়ে কলকাতা থেকে মজঃফরপুর পালিয়ে গিয়েও তাঁর স্বস্তি নেই। তাই ঘটনার দুদিন বাদেই দীর্ঘ ছুটি নিয়ে সোজা মুসৌরি। সেখান থেকেই তিনি সাক্ষ্য দিতে এসেছেন কড়া পুলিশ প্রহরায়। তাঁর বক্তব্য :

'রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত পত্রিকা 'যুগান্তর' আমার নিকট ৩ বার, 'বন্দেমাতরম' ১ বার ও 'নবশক্তি' ১ বার অভিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল মোকদ্দমার পূর্বে ও পরে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমার পর আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা খুব বৃদ্ধি পায়।

'কলিকাতার ছাত্রগণ আমার প্রতি কি ভাব পোষণ করিত, তাহা আমি জানি না। দুইবার আদালত হইতে বাহির হইবার সময় রাস্তায় কতকগুলি লোক আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই সব লোকের ভিতর কতগুলি ছাত্র এবং কতগুলি অপর লোক তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও ছিলাম; সেখানে কেহ আমাকে অসম্মান করিয়াছে বলিতে পারি না।' [সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন, ১৯০৮]

সহিস কালীরাম কিন্তু মোটেই সনাক্ত করতে পারল না ক্ষুদিরামকে। তার বক্তব্য : 'দুটি ছোকরাবাবু কি যেন একটা জিনিস ছুঁড়ে মেরেছিল। তবে এই ছোকরাবাবু তারই একজন কিনা, তা আমি বলতে পারব না হুজুর।'

সেদিনই রংপুর থেকে আগত উকিল সতীশ চক্রবর্তী এক আবেদন পেশ

করলেন বিচারপতি কর্নডফের কাছে : ইওর অনার, আমি আসামী ক্ষুদিরামের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

অনুমতি পেতে দেরী হল না। তবে একটি শর্তে। আড়ালে নয়, কথা বলতে হবে পুলিশ কর্মচারীদের সামনে। তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার সামান্য কিছুটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'ক্ষুদিরাম কাঠগড়ার ভিতরে ছিল। অস্ত্রধারী পুলিশ ও উকিলগণ কাঠগড়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষুদিরামের মুখে অন্তর্নিহিত তেজোগর্ব পরিস্ফুট, তাহার কথায় কোনরূপ কুণ্ঠা বা উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। সতীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম অবিচলিতভাবে বলিতে লাগিলেন : আমার বাবা-মা, ভাই, কাকা বা মামা কেহ নাই। কেবল আমার এক বোন আছেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে। বড়টির বয়েস আমার মতই হইবে। বাবু অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে দিদির বিবাহ হইয়াছে।... পড়া ছাড়িয়াই স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করিতে আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে আমার ভগিনীপতি অমৃতবাবু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—তুমি কাহাকেও দেখিতে চাও কি?

—হ্যাঁ, একবার মেদিনীপুর দেখিতে চাই। আমার দিদি ও তাঁর ছেলে-মেয়ে কয়টিকে দেখিতে চাই।

—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি?

—না, কিছু না।

—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল—কেন ভয় করিব?

—তুমি গীতা পড়িয়াছ?

—হ্যাঁ, পড়িয়াছি।

—তুমি কি জান যে, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকিল আসিয়াছি। তুমি তো পূর্বেই তোমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।

নির্ভীক ক্ষুদিরাম মস্তক উন্নত করিয়া বলিল—কেন স্বীকার করিব না?

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—ক্ষুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ কর। [সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন, ১৯০৮]

মল্লিকা, এসব খবর প্রকাশের জন্য সেদিন কিন্তু কম মূল্য দিতে হয় নি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। সে কাহিনী তোমাকে আমি শোনাব আরো পরে।

সাক্ষীসাবুদ শেষ। এবার দু পক্ষের আর্গুমেন্ট। সরকার পক্ষের

আইনজীবী মিঃ মানুকের মতে—আসামী গুরুতর অপরাধে অপরাধী। নিজেই সে স্বীকার করেছে তার অপরাধের কথা। এ অবস্থায় চরম শাস্তিই একমাত্র কাম্য।

প্রতিবাদ জানালেন ক্ষুদিরামের পক্ষের উকিল কালিদাস বসু। আসামী অপরাধ স্বীকার করেছে—একথা সত্য; কিন্তু কেন করেছে, সেটাও এক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হবে। আসামী বলেছে—তার এক হাতে ছিল দীনেশের একটি সিল্কের কোট। দীনেশই এটা তাকে রাখতে দিয়েছিল। অন্য হাতে ছিল দুটো বড় পিস্তল। এ অবস্থায় তার পক্ষে পিস্তল ছোঁড়া বরং সম্ভব, কিন্তু বোমা নিক্ষেপ কিছুতেই নয়। দুটো হাতই যদি বন্ধ থাকে, তাহলে বোমা নিক্ষেপ করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব?

কে তাকে একাজ করতে উত্তেজিত করেছিল, কোথা থেকে সে পিস্তল ও গুলি পেয়েছিল; দীনেশের পরিচয় কি, এ সম্বন্ধে আসামীর উক্তি পরস্পর-বিরোধী। দুজন বিচারকের কাছে সে দুরকম বিবৃতি দিয়েছে। কারণ—দীনেশ। দীনেশকে বাঁচাবার জন্যই সে প্রথমবারে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল নিজের মাথায়।

এখানেই শেষ নয়। ঘটনার রাত্রে স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে জানতে পেরেছিলেন যে, সাদা সার্ট পরিহিত একজন মাত্র লোক বোমা নিক্ষেপ করেছিল। গ্রেপ্তারের সময়ে কি আসামীর গায়ে কোন সাদা সার্ট ছিল? তাহলে সেই সাদা সার্ট কোথায় গেল?

কাজেই সবদিক বিবেচনা করে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, আসলে বোমা নিক্ষেপ করেছিল দীনেশ, ক্ষুদিরাম নয়। ক্ষুদিরাম তার সঙ্গে ছিল মাত্র। সে হিসাবে তার অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে বড়জোর তাকে কিছুটা লঘু দণ্ড দেওয়া যেতে পারে, গুরু দণ্ড কিছুতেই নয়।

অথচ দেওয়া হল কিন্তু তাই। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুযায়ী সাজা দেয়া হল—প্রাণদণ্ড।

আশ্চর্য, ক্ষুদিরামের মুখে হাসি। সেই স্বচ্ছ সলজ্জ হাসি, যা তার মুখে দেখা গিয়েছিল বারবার।

দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বিচারপতি কর্নডফ। বোধহয় আসামী তার দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে নি। নইলে এ সময়ে তার মুখে হাসি কেন?

সত্যিই কি ক্ষুদিরাম কিছু বুঝতে পারেন নি নিজের দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে? থাক, বরং সেদিনের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার বিবরণ আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

'একেবারে নির্বিকারভাবে ক্ষুদিরাম দণ্ডাজ্ঞা শুনিলেন। কি নিষ্কম্প

আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, কি উচ্চ আদালতে সেসন জজের নিকট, মামলা শুনানীকালে ক্ষুদিরাম অধিকাংশ সময়ই নির্লিপ্তভাবে কাটাইতেন।

'কখনো কখনো তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত। আদালতে কি হইতেছে, না হইতেছে, সে সম্বন্ধে ক্ষুদিরাম প্রায়ই উদাসীন থাকিতেন। প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন আসামীর এই নির্লিপ্ত ভাব এবং ঔদাসীন্য আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

'মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকারভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'বুঝিয়াছি'।

[সঞ্জীবনী: ১৮ই জুন, ১৯০৮]*

•

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি…'

গানটা তুমি নিশ্চয় শুনেছ মল্লিকা। অজ্ঞাত পল্লী কবির গান, তাই স্বভাবতই কিছুটা ভুল রয়ে গেছে তথ্যের দিক থেকে।

যেমন—'বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী'। দুটোই ভুল। কিংসফোর্ড বড়লাট নন। মৃতা মহিলাদ্বয়ও ভারতবাসী নন। তবে একটা ব্যাপারে কিন্তু দারুণ একটা সত্য নিহিত রয়েছে পল্লী কবির ঐ গানটার মধ্যে। সত্যটা হল—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

হ্যাঁ, সত্য। নিদারুণ সত্য। কি করে যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে হয়, তা ক্ষুদিরামই সেদিন শিখিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালের শহীদবৃন্দকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু হাসি আর হাসি।

ওয়াইনি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার সময় হাসি।…'like a cheerful boy who knows no anxiety'…তারপর—'ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল—'কেন ভয় করিব?' ফাঁসির আদেশ শুনেও সেই একই হাসি। তবে এখানেই শেষ নয়। যথাসময়ে আরো

---

* ১৯৮০ সালের ১১ই আগস্ট আকাশবাণী থেকে প্রণবেশ সেন রচিত সংবাদ পরিক্রমায় বলা হয়েছে—কিংসফোর্ড ক্ষুদিরামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এ তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ক্ষুদিরামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন সেসন জজ মিঃ কর্নডফ। কিংসফোর্ড এ মামলায় একজন সাক্ষী ছিলেন মাত্র।

হাসি তুমি দেখতে পাবে ক্ষুদিরামের।

খবর শুনে বুকটা বুঝি ভেঙে গেল দিদি অপরূপা দেবীর। ক্ষুদিরাম শুধু তার একমাত্র ভাইই নয়, সন্তানতুল্যও বটে। প্রাণাধিক সেই ভাইটিকে এবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে, এ দুঃখ তিনি রাখবেন কোথায়। তাঁর নিজের ভাষায়:

'ছিয়ানব্বই সালের উনিশে অঘ্রাণ, মঙ্গলবার। তখন সন্ধ্যা পাঁচটা হবে। ক্ষুদিরামের জন্ম হল। সেদিন কি আনন্দ আমাদের। এর আগে পরপর দুটো ভাই মারা গেছে, আর আমরা বাঙালী ঘরের অভিসম্পাত নিয়ে তিন তিনটে বোন অজর-অমর হয়ে বেঁচে রইলাম—এ লজ্জা রাখবার যেন ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। তাই ছোট ভাইটি যখন হল, কি আনন্দ আমাদের।

'নবজাতক ভাইটিকে আমি কিনে নিলাম তিন মুঠো খুদ দিয়ে। আমাদের এদিকে একটা সংস্কার আছে, পরপর কয়েকটি পুত্র সন্তান মারা গেলে মা তার কোলের ছেলের সমস্ত লৌকিক অধিকার ত্যাগ করে বিক্রি করার ভান করেন। যে কেউ কিনে নেন কড়ি দিয়ে, নয়তো খুদ দিয়ে। তিনটি কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয়—তিনকড়ি। পাঁচটি কড়ি দিয়ে কিনলে—পাঁচকড়ি। তিন মুঠো খুদ দিয়ে কিনলাম বলে ভাইটির নাম হল—ক্ষুদিরাম।

'ক্ষুদিরাম জন্মাবার কিছুদিন পরেই শ্বশুর ঘর দাশপুর থানার হাটগেছ্যা গ্রামে চলে যেতে হয় আমাকে। তারপরে কয়েকটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু যখনই বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে যাবার সময় হত, তখনই সেই ফর্সা, লিকলিকে ক্ষুদিরাম, মাথায় এক মাথা ঠাকুরের জন্য রাখা চুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরত গলা, কিছুতেই যেতে দেবে না আমাকে। আর এমনই কাঁদত যে, তার হাতের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর বহুক্ষণ আমাকে কাঁদতে হোত।

'ক্ষুদিরামের জন্মের এক বছর আট মাস পরে আমার বড় ছেলে ললিত হয়। মামা ও ভাগ্নের মধ্যে এই অল্প বয়সের ব্যবধানকে ওরা কেউই মানত না, তাই মামা ও ভাগ্নের মধ্যে সাথীত্বের সম্বন্ধটাই হয়েছিল বেশি।

'মামাকে যখন শাসন করতে গেছি, ভাগ্নে তখন নিজের ছোট লেপটিতে মামাকে লুকিয়ে রেখেছে, আর এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে, যাতে দুজনকেই না মেরে পারা যায় না। কাজেই আমাকে হার মানতে হতো ওদের কাছে।'

[স্বাধীনতা: ২১শে জুলাই, ১৯৪৭]

এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে নয় মল্লিকা। ক্ষুদিরাম তার দিদির কাছে মানুষ হয়েছিলে। সে কাহিনী তুমিও জানো। তা বলে অপরূপা দেবী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরে রাখতে পারেননি নিজের কাছে। কারণ, স্বামী অমৃতলাল রায়। তখনকার দিনের সরকারী চাকুরে, তাই কোনরকম ঝুঁকি

নিতে তিনি রাজী হননি ক্ষুদিরামের মত স্বদেশী-করা ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখে।

নিরুপায় ক্ষুদিরামকে তাই আশ্রয় নিতে হয়েছিল আর একটি দিদির কাছে। কে এই দিদি! তিনি হলেন তখনকার সময়ের উকিল সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ভগ্নী—একজন মুসলীম মহিলা। তিনিই সেদিন নিঃসহায় ক্ষুদিরামকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন সত্যিকারের দিদির মত।

শুধু তাই নয়। ফাঁসির পূর্বে ক্ষুদিরাম তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন—'আমার দিদি ও তাঁর ছেলে-মেয়ে কয়টিকে দেখতে চাই।'

যে কারণেই হোক, অপরূপা দেবীর পক্ষে ভাইয়ের এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। হয়তো সে স্বাধীনতাও তাঁর ছিল না। তা বলে ক্ষুদিরামের এই মুসলীম দিদিটি কিন্তু কিছুতেই সেদিন দূরে থাকতে পারেননি। স্নেহের ভাইটিকে শেষবারের মত দেখার জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর মজঃফরপুরে।

এ প্রসঙ্গে সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল 'বিপ্লবী নিকেতন' থেকে প্রকাশিত 'মৃত্যুহীন' গ্রন্থে কি বক্তব্য রয়েছে দেখা যাক।

'ভগ্নীপতির বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ নামে একজন উকিলের ভগ্নীর বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। তখন ক্ষুদিরামের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে গোয়েন্দা পুলিশের সতর্ক নজর। একজন বিপ্লবীকে সমস্ত বিপদ ও ভয় অগ্রাহ্য করে, মুসলীম সম্প্রদায়ের সাধারণ একজন নারীর পক্ষে আশ্রয় দেওয়া যে কতখানি দুঃসাহসের পরিচয়, তা নিশ্চয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

ক্ষুদিরাম যখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী; তখন এই রমণীই অন্তঃপুরের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে এক গভীর আবেগ ও দেশপ্রেমের তাড়নায় বহুদূর থেকে ক্ষুদিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এসেছিলেন।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু রমণীর আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা গোপনে গোপনে প্রাণ সঞ্চার করেছে।'

[মৃত্যুহীন : শান্তিময় রায় ঃ পৃ ১৬-১৭]

এবার তোমাকে একটি প্রশ্ন করবো মল্লিকা। আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে —সেই কুসংস্কার ভরা যুগে ক্ষুদিরাম ও তাঁর এই মুসলীম দিদি যে সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; আজকের এই স্বাধীন দেশে কোথাও তুমি এমন একটি নজীর দেখাতে পারবে কি! কি মনে হয় আলিগড়, জামসেদপুর ও নদীয়ার ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে! দেশ এগিয়ে চলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনদিকে? যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

রায় শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন উকিল কালিদাসবাবু। সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে এতদিন তিনি মামলা চালিয়ে এসেছিলেন ক্ষুদিরামের জন্য। রংপুর থেকে আগত সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন লাহিড়ীও তাই। অথচ এত চেষ্টা করেও তারা বাঁচাতে পারলেন না ক্ষুদিরামকে।

কিন্তু না, এত সহজে হতাশ হলে চলবে না। এখনো হাইকোর্ট রয়েছে। দেখা যাক আপীল করে। রাজী নয় ক্ষুদিরাম। তাঁর বক্তব্য: যা হবার সে তো হবেই। তাহলে কি লাভ শুধু শুধু আপনাদের এই পরিশ্রম করে!

—শোন ক্ষুদিরাম। সব চাইতে দুর্বল জায়গায় ঘা দিলেন কালিদাসবাবু —আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তুমি কি তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারতে। নাও, সই কর এই দরখাস্তে।

নিঃশব্দে সই করে দিলেন। পিতৃতুল্য মানুষটির অনুরোধকে অস্বীকার করার মত সাধ্য তার কোথায়!

৮ই এবং ৯ই জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে শুনানীর দিন ধার্য হল বিচারপতি মিঃ ব্রেট ও মিঃ রাইভস্-এর আদালতে। এখানে ক্ষুদিরামের পক্ষে রইলেন আইনজীবী নরেন্দ্রকুমার বসু, বিপক্ষে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মিঃ ওর।

আপিল ডিসমিস করা হল ১৩ই জুলাই। তবু হাল ছাড়লেন না কালিদাস-বাবু। দেখা যাক, বড়লাটের কাছে আবেদন করে কিছু হয় কিনা।

না, হল না। আবেদন অগ্রাহ্য করলেন বড়লাট বাহাদুর। না, কোন ক্ষমা নয়। মৃত্যুই ওর একমাত্র শাস্তি।

মৃত্যুই ক্ষুদিরামের একমাত্র শাস্তি। কারণ, তিনি হত্যাপরাধে অপরাধী। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় মল্লিকা। ক্ষুদিরাম ভুল করে মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করেছিলেন, এ অভিযোগ সত্য। বিচারসভায় দাঁড়িয়ে তার জন্য দুঃখ প্রকাশও তিনি করেছিলেন বারবার।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তখন একজন ইংরেজও তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কি? জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরে একজনও তার নিন্দা করেছিলেন কি?

তাহলে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সেদিনের সেই নরঘাতক ও'ডায়ারকে বিশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন কারা? ইংল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর নরনারীরা নয়?

তাছাড়া যুদ্ধ যুদ্ধই। পৃথিবীতে এমন কোন যুদ্ধ আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে কি, যেখানে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয় নি? আছে কি এমন কোন নজীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে?

এ প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ মদনলাল ধিংড়ার একটি উক্তি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

'জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করার অধিকার নেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ দখলের কোন এক্তিয়ার নেই। যে ইংরেজ আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ন্যায়ের নির্দেশ।'

এখানেই থামেন নি ধিংড়া। তিনি আরো বলেছেন :

'I believe that a nation held down by foreign bayonets is in at perpetual stale of war. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race; I attacked by surprise ; since guns were denide to me...'

[আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশী বেয়নেটের চাপে একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখা মানে সেই জাতিকে নিয়ত যুদ্ধরত থাকতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধের সুযোগ নেই, কারণ আইন করে আমাদের অস্ত্র অপহরণ করা হয়েছে। তাই আমি আচমকা আমার শত্রুকে আক্রমণ করেছি।]

বিদেশে অবস্থানরতা অগ্নিকন্যা মহীয়সী মাদাম কামার নাম নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ। সমসাময়িককালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত তিনি তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় কি লিখেছিলেন দেখা যাক :

'In a meeting of a bunglow, on the railway or in a carriage, in a shop or in a church, in a garden or at a fair, wherever an opportunity comes, Englishmen ought to be killed. No distinction should be made between officers and private people. The great Nana Sahib understood this, and our friends, the Bengalis, have also begun to understand.'

[কোন সভায় বা বাংলোয়, রেলে হাটে বাজারে দোকানে বা মেলায়—সুযোগ পেলেই ইংরেজকে নিধন করা আমাদের কর্তব্য। রাজপুরুষ বা সাধারণ ইংরেজের মধ্যে পার্থক্য টানার কোন প্রয়োজন নেই। এটা নানা সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন। আর আজ বুঝতে পারছেন আমাদের বাঙালী বন্ধুরা]।

পরবর্তীকালে ঠিক একই ধরনের কথা আমরা শুনেছিলাম অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের শবদেহের সঙ্গে পাওয়া তাঁর লিখিত একটি বিবৃতির মধ্যে :

'ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে; আমাদের সমাজদেহকে নিরন্ত

করেছে, কোটি কোটি নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আমাদের রাজনীতিক, আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক—সব কিছুর মূলে ইংরেজ শাসন।

'ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার শত্রু, আমাদের চরম বৈরী। তাই হোক সে রাজপুরুষ বা সাধারণ নরনারী—তাদের সবার বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করতে হবে। মানুষের জীবন নেয়া আনন্দের ব্যাপার নয়, কিন্তু যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্তরায়, তাদের যে কোন উপায়ে স্তব্ধ করা আমাদের কর্তব্য।'

মল্লিকা, এ তো গেল শুধু আমাদের কথা। এবার শ্বেতাঙ্গ সমাজেরই একজন, ঐতিহাসিক W. S. Blunt তাঁর বিখ্যাত My Diaries গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন শোনা যাক :

'People talk about political assassination as defeating its own end, but that is nonsense. It is just the shock needed to convince selfish rulers that selfishness has its limits of imprudence.'

[কেউ কেউ বলেন, রাজনৈতিক হত্যা উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। এটা নির্বোধ উক্তি। এ হচ্ছে শুধু ততটুকুই আঘাত, যা স্বার্থপর শাসকদের ধৃষ্টতাকে সীমিত রাখার জন্য প্রয়োজন।]

সবশেষে শোন বিপ্লবী নায়ক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের কথা :

'নির্দোষ দুটি মহিলার মৃত্যুতে সবার অধিক দুঃখ পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু দুঃখ হয়নি ইতিহাস বিধাতার। কারণ, এই যুদ্ধের অবতারণা তো কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থে নয়। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একটা জাতি আর একটা জাতির বিরুদ্ধে। ভারতবাসীর সংগ্রাম ইংরেজের সঙ্গে। কারণ, ইংরেজ জাতি ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছে, প্রভুর পদে সমাসীন থেকে ভারতবাসীকে সে পদানত করে ভুক্ত। এই যুদ্ধ ভারতবাসীকে চালাতে হবে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯০৮ সালে সেই যুদ্ধেরই সূচনা মাত্র।

'এই যুদ্ধে কত মাতা, কত ভগ্নী, কত বধূর চোখে জল ঝরবে, কত নরনারী নিহত হবে, কত রক্তস্রোত ধরণীতল সিক্ত করবে। এই নির্যাতিত বা নিহতদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে নির্দোষ হলেও জাতিগতভাবে তো বিবাদমান। সুতরাং, মৃত্যুর জন্যে মিসেস কেনেডিদের মত নির্দোষ মানুষদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি।

ক্ষুদিরামের কার্যের জন্য কত নির্দোষ নরনারীর উপর অত্যাচার নির্মম হয়ে নেমে এসেছে—কারণ, তারা বাঙালী, তারা ভারতবাসী। কই, সেজন্যে তো

ইংরেজ জাতি বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করেনি।' [ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃ-৫১]

অবশেষে ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট।

আবেদন জানালেন মজঃফরপুরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। হিন্দুমতে শবদেহে সংকারের জন্য আমাদের ওদিন কাছে থাকতে দেওয়া হোক।

অনুমতি পেলেন মাত্র দুজন। উপেন্দ্রনাথ সেন ও ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শবদেহ বহন করার জন্য বাইরে থাকতে পারবেন বারোজন। শবানুগমনের জন্য আরো বারোজন।

পরের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী উপেন্দ্রনাথ সেন রচিত 'ক্ষুদিরাম' নিবন্ধ থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'জেলে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল অনুমতি পাইলাম। আমি তখন 'বেঙ্গলী' কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। বোমা পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংবাদ সে কাগজে পাঠাইতাম। কৌতূহলী পাঠক ঐ সময়ের 'বেঙ্গলী' কাগজের ফাইল পাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

'আমি অতি গোপনভাবে বাড়িতে বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া প্রস্তুত করাইলাম। যেখানে মাথা থাকিবে, সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া 'বন্দেমাতরম' লিখিয়া দিলাম।

'ভোর ছয়টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সংকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে।

'সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম।...দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ।

'দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড বা আড়দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটা ফাঁস।

'একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যুষে উঠিয়া, স্নান করিয়া, কারাবাসকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙুল দিয়া বিন্যাস করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল।

'আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল।

'ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিক একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপাশে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল।

'ক্ষুদিরাম নিচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

'...আমরা জেলের বাহিরে আসিলাম। আধ ঘণ্টা পরে জেলের দুইজন বাঙালী যুবক ডাক্তার আসিয়া খাটিয়া ও নতুন বস্ত্র লইয়া গেলেন।

'নিয়ম অনুসারে ফাঁসির পর গ্রীবার পশ্চাৎদিকে অস্ত্র করিয়া দেখা হয় যে, পড়ামাত্র মৃত্যু হইয়াছিল কিনা। ডাক্তার দুইটি সেই অস্ত্র করা স্থান সেলাই করিয়া, ঠেলিয়া বাহির হওয়া জিহ্বা ও চক্ষু যথাস্থানে বসাইয়া নতুন কাপড় পরাইয়া, দুইজনে খাটিয়া ধরিয়া জেলের বাহিরে আমাদের দিয়া গেলেন।

'কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশে কিছু দূরে অন্তর পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল, শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। একটি ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিশ শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল।

'চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম।* দেখিলাম মস্তকটি মেরুদণ্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ-বেদনা-ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন।

'তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত রহিল।

'দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

'আমরা শ্মশানবন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া মনের

তার খানিকটা লুঠ করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটোয় কিছু চিতাভস্ম কালিদাসবাবুর জন্য।

'ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম-দগ্ধ শ্বেত চিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি।'

'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী...'

এবার সেই হাসির বিবরণ তোমাকে আমি শোনাচ্ছি—দেশী-বিদেশী উভয় পত্রিকা থেকেই।

'মজঃফরপুর, ১১ই আগস্ট—অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ়-পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাসিতেছিল।' [অমৃতবাজার পত্রিকা : ১২ই আগস্ট, ১৯০৮]

'Khudiram Bose was executed this morning ;...it is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling.' [The Empire : 12-8-1908]

ক্ষুদিরাম চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল, জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, এ ভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে রইলেন জাতির অন্তরে। বেঁচে রইলেন কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ইতিহাসের পাতায়।

তারপর দীর্ঘ বাহাত্তর বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজো কি কেউ ভুলতে পেরেছে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামকে ? 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—' আজো কি একই ভাবে দোলা দেয় না মানুষের মনে ?

ঘুরে কিন্তু ঠিকই এসেছিলেন মল্লিকা। একজন নয়, এসেছিলেন শত সহস্র ক্ষুদিরাম। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত প্রতিটি দেশেই। ওঁরাই যে শোষিত জনগণকে ভাঙনের গান শুনিয়ে থাকেন যুগে যুগে। তাই তো মরেও ওঁরা অমর। মৃত্যুঞ্জয়ী।

প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম দুজনেই হারিয়ে গেলেন দেশমাতৃকার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করে।

আর দেশদ্রোহী নন্দলাল। বন্ধুত্বের মুখোশ পরা সেই বিশ্বাসঘাতক নন্দলালের কি হল। যার জন্য প্রফুল্ল চাকীর মত নির্ভীক তরুণকে মৃত্যু-

বরণ করতে হল, সে কি রেহাই পেয়েছিল বিপ্লবীদের রোষানল থেকে ?

মোটেই না। বেশীদিন আর পৃথিবীর মুখ দেখতে হয়নি দেশদ্রোহী নন্দলালকে। নভেম্বর মাসেই তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল সার্পেন্টাইন লেনের অন্ধকার গলিতে।

কি করে মৃত্যু ঘটল নন্দলালের। কি হয়েছিল সেদিন সবার অলক্ষ্যে। কোন জবাব নেই। এমন কি ইতিহাস পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নীরব।

জবাব দিয়েছেন 'আত্মোন্নতি সমিতি'র রণেন গাঙ্গুলী—মাত্র বছর কয়েক আগে—১৯৭০ সালে। এ সম্বন্ধে মহাজাতি সদনের অছি পরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত টেপ রেকর্ডে তিনি কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক :

'আমার পরিচয় তখন ছিল বিপিনদাদের (গাঙ্গুলী) 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামক গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন অখ্যাত অথচ বিশ্বস্ত কর্মীরূপে। কর্মের পরিকল্পনা ও দায়িত্বভার প্রথমটায় বহন করতে দেখেছিলাম আমাদের সমিতির হরিশ সিকদার মহাশয়কে। তিনিই আমাকে গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন নন্দলালের উপর নজর রাখতে, তাকে হত্যার প্রয়োজনে। আমি দিনের পর দিন নজর রাখি এবং যথাস্থানে সংবাদ দিতে থাকি।

'এদিকে এ-ও জানালাম যে, ঢাকার বিপ্লবী মুক্তি সংঘের (পরবর্তীকালে বি. ভি.) নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে বৈপ্লবিক সংযোগ রাখছেন। ক্রমশ আমাকে জানানো হল যে, ঐ সংস্থার শ্রীশচন্দ্র পাল ও আমি এক সঙ্গে যাব নন্দলালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

'এল ৯ই নভেম্বর। আমাদের প্রাপ্ত সংবাদমত নন্দলালকে পাওয়া গেল সার্পেন্টাইন লেনে। সশস্ত্র শ্রীশ পালের সঙ্গে আমিও নন্দলালকে অনুসরণ করছি। বর্তমান সেন্ট জেমস স্কোয়ারের পাশে সুবিধামত অবস্থায় শ্রীশ পাল সর্বপ্রথম নন্দলালকে গুলি করলেন।

'নন্দলালের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা সাতটা। দেশদ্রোহী নন্দলাল মরে গিয়েও যাতে আবার বেঁচে না ওঠে, এই আশঙ্কায় আমিও ছুটে গিয়ে আমার রিভলবার দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলাম। কাজ সমাপ্ত হতেই আমরা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। শ্রীশ পাল বা আমার এ কাহিনী পুলিশ তো দূরের কথা, দলের কর্মীরাও জানতে পারেন নি।'

'বস্তুত নন্দলাল হত্যার ঘটনাটি এতই গোপনে ঘটিয়াছিল এবং শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সংঘ' এবং আমাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি'র পারস্পরিক Political understanding তৎকালে এতই চমৎকার ছিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরাজ চলিয়া যাইবার দিন পর্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, উহা কাহাদের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ।

'এই গোপনীয়তা হেমবাবুর দল শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন

বলিয়াই ১৯৩০ সাল হইতে প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। সূর্য সেনের অসাধারণ নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যে বিপ্লব রচিত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতেও ছিল নিয়মানুগ এই মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে নিখুঁত প্রস্তুতি।'

একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঐতিহাসিক উমা মুখার্জী।

'At the appointed hour Ranen and Naren (Srish Pal) set out and waited before the old Siva temple cracking and taking ground-nuts, and shortly after finding Nandalal Banerjee coming out of his house they moved forward. It was Naren (Srish Pal) who actually killed Nandalal just as the S. W. corner of St. James Park at about 7 P. M. To be sure of the accomplished murder Ranen also struck the head of the man with his own revolver.'

[Two Great Indian Revolutionaries : p-231]

মজঃফরপুর জেল ধন্য হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। তা বলে ক্ষুদিরামপর্ব কিন্তু এখানেই শেষ হল না মল্লিকা। ততদিনে বাংলাদেশে তোলপাড় কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে ক্ষুদিরামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তার মাশুল গুণতে গিয়ে আরো কতজনকে যে ক্ষুদিরামের মত ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, কে জানে।

বিস্ফোরণ ঘটল মজঃফরপুরে, কিন্তু তার ঢেউ এসে লাগল কলকাতায়।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন শ্রীঅরবিন্দ। তক্ষুনি তিনি নির্দেশ পাঠালেন ছোট ভাই বারীন ঘোষের কাছে। মুরারীপুকুর বাগানে যা কিছু আছে সব অন্যত্র সরিয়ে দাও। এই মুহূর্তে। দেরি করো না যেন।

মল্লিকা, বারীন ঘোষ কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না দাদা অরবিন্দের সেই সতর্কবাণীকে। ঘটনা ঘটেছে মজঃফরপুরে। তার জন্য এখানে অত সতর্ক হবার কি আছে।

অন্যতম নেতা হেমচন্দ্র কানুনগোর ভাষায় :

"আমাদের কর্তা (অরবিন্দ) এ খবর পাওয়ামাত্র বারীন্দ্রকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন—দলের সকলকে এ সংবাদ জানাতে আর আড্ডা থেকে সবাইকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মানিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলবার, গুলি, সেল প্রভৃতি মাটিতে পুঁতে ফেলতে সে আদেশ দিয়েছিল।

আদেশ অনুযায়ী ১লা মে রাত ১২টা পর্যন্ত ঐ সকল জিনিসের উপর

দুটি মাটি ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় নাকি পুলিশদের কে একজন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল,—সকালে অনেক পুলিশ আসবে, সাবধান! এ কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসেনি।"

আশঙ্কা অমূলক হল না। মজঃফরপুরে বিস্ফোরণ ঘটেছিল ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার। পালে বাঘ পড়ল ২রা মে তারিখে—ভোররাত্রে। জাল ফেলে একই দিনে, একই সঙ্গে সবাইকে ছেঁকে তোলা হল বিভিন্ন জায়গা থেকে।

পুলিশ অফিসার ফোরিজোনীর নেতৃত্বে বারীন ঘোষ প্রমুখদের গ্রেপ্তার করা হল মুরারীপুকুরের সেই আশ্রম থেকে। মাটি খুঁড়ে অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেল যথেষ্ট। অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগোকে গ্রেপ্তার করা হল ৩৮।৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে। ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে তোলা হল চন্দননগরের কানাইলাল দত্তকে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে মেদিনীপুর থেকে। নগেন্দ্র গুপ্ত আর ধরণী গুপ্তকে ১৩৪নং হ্যারিসন রোড থেকে। শ্রীহট্ট থেকে হেমচন্দ্র, বীরেন্দ্র আর সেই পনের ঘা বেত খাওয়া ছেলে সুশীল সেনকে।

অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হল ৮নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির দোতলা থেকে। তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে কাটেনি। সবে মাত্র ফর্সা হয়ে এসেছে পূব আকাশটা।

ঘুমন্ত অরবিন্দকে দেখে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার রিচার্ড ক্রেগান অবাক। আসামী একজন আই. সি. এস। সে কিনা মাটিতে শুয়ে আছে একটা মাদুর পেতে। এ যে চিন্তাও করা যায় না।

গ্রেপ্তারের পর হাতকড়া পরানো হল অরবিন্দকে। কোমরে বাঁধা হল শক্ত দড়ি। একতলায় অবস্থিত 'নবশক্তি প্রেসের' অবিনাশ ভট্টাচার্যকেও বাঁধা হল সেই একই ভাবে। অত্যন্ত বিপজ্জনক বন্দী। তাই কোনরকম খাতির করা চলবে না।

পরবর্তীকালে স্বয়ং অরবিন্দ এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন দেখা যাক :

"শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোর প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল; জাগিয়া উঠিলাম।

পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিশে ভরিয়া উঠিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান—২৪ পরগণার ক্লার্কসাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার দত্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্সপেক্টর, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা খানাতল্লাসীর সাক্ষী, হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল।

শুনিলাম একটি শ্বেতাঙ্গ বীর পুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে—তাহা সচক্ষে দেখি নাই।

বিছানাতে বসিয়া আছি। তখনও অর্ধনিদ্রিত অবস্থা। ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন—'অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?'

আমি বলিলাম—'আমিই অরবিন্দ ঘোষ।'

অমনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে একজন পুলিশকে বলেন। তারপরে ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র ভাষায় দুজনের অল্পক্ষণ বাগবিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাশীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সই করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম,—এই পুলিশ সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

কেবল বুঝিলাম না—আমার বাড়িতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই Body warrant-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে! তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না।

তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।"

খবর পেয়ে ছুটে গেলেন মেসোমশাই—'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। অরবিন্দ অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর হাতকড়া খুলে দেয়া হোক।

—নেভার। অফিসার রিচার্ড ক্রেগানের উত্তর।

এবার এগিয়ে গেলেন জননেতা ও প্রখ্যাত অ্যাটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু,—কাকে হাতকড়া দিয়েছ তোমরা! শিগগীর খুলে দাও। আর আমি জামিন দাঁড়াচ্ছি ওর পক্ষে। ওকে জামিন দেওয়া হোক।

—নো, নেভার। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়, তাই সাহেবের আগেই এবার জবাব দিলেন বাঙালী অফিসার বিনোদবাবু।

—কিন্তু ওর স্ত্রী ও ভগ্নী সরোজিনী এখানে একা থাকবে কি করে? আবেদন জানালেন কৃষ্ণকুমার মিত্র; আমি বরং ওদের নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে।

—নেভার। অন্ততঃ বিকেল তিনটের আগে ওদের এখান থেকে কোন মতেই সরানো চলবে না।

গ্রে স্ট্রীট থেকে থানায়। তারপর পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স লালবাজারে।

দেখেই জ্বলে উঠলেন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে, 'এসব খারাপ কাজে লিপ্ত হতে লজ্জা হল না আপনার?'

'খারাপ কাজ!' ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন অরবিন্দ, 'কোন্ অধিকারে আপনি একথা বলছেন যে, আমি খারাপ কাজে লিপ্ত?'

কণ্ঠে মধু ঢেলে ডেপুটি সুপার সামসুল আলমও চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ, কিন্তু অরবিন্দর সেই এক কথা, আমাকে বলে কিছু লাভ হবে না, কোন খারাপ কাজের সঙ্গে আমি জড়িত নই।'

এবার ম্যাজিস্ট্রেট বার্লোর আদালতে। মোট আটত্রিশ জন। অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, নরেন গোঁসাই, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিল রায়, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বিজয় ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু—কেউ বাদ নেই।

বন্দীরা নির্বিকার। গালে-গল্পে, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তারা ভরপুর। দেখে মনে হয়—একটা বিরাট একান্নবর্তী সুখী পরিবার যেন। বলতে গেলে গোটা আলিপুর জেলটাকেই যেন ওরা মাথায় করে রেখেছে।

জেলার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বরাবরই একটু গোবেচারা ধরনের লোক। প্রায়ই তিনি বলেন, 'কর বাবা, কর। নাচ-গান-থেটার—যা খুশি কর, তাতে আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার পেন্সন হতে আর অল্প দিন মাত্র বাকি। দেখিস, নতুন কোন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে এ বয়েসে আমার চাকরিটা খাসনে যেন বাপু।'

হল কিন্তু তাই। বিশ্বাসঘাতকতা করল নরেন গোঁসাই। শোনা গেল, সে নাকি গোপনে স্বীকারোক্তি করেছে পুলিশের কাছে। একদিন নয়, পরপর ছয়দিন। কিছুই আর বলতে বাকি রাখে নি।

বন্দীরা অবাক। নরেন স্বীকারোক্তি করেছে—এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত। ঠিক আছে, ডাকো নরেনকে। ওকেই বরং জিজ্ঞেস করা যাক।

কিন্তু কোথায় নরেন! সতর্কতা হিসেবে পুলিশ তাকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে জেল হাসপাতালের এক ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। পাশে রয়েছে সদা সতর্ক প্রহরী হিগিন্স ও লিন্টন! এসব স্বদেশীওয়ালাদের বিশ্বাস নেই। তাই সাবধান থাকাই ভাল।

গর্জে উঠলেন ক্ষুদিরামের গুরু মেদিনীপুরের সত্যেন বসু, আর চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত। বিশ্বাসঘাতককে তার প্রাপ্য শাস্তি আমরা দেবোই। চাই শুধু একটা রিভলবার। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব। জেলের অভ্যন্তরে কোথায় পাওয়া যাবে এখন রিভলবার!

অত ব্যস্ত কেন! অভয় দিলেন দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগো, তবে খুব হুঁসিয়ার। জানো তো—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ভাই কথাটা পাঁচ কান করো না যেন। বারীনকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। অরবিন্দকে তো নয়ই। দেখেছ তাঁর চোখদুটির পানে তাকিয়ে! সে এখন অন্য জগতের লোক। তাই তাঁর শান্তিভঙ্গ করাটা ঠিক হবে না।

প্ল্যানমত রিভলবার এসে গেল সত্যেনের হাতে। দেখে এতটুকুও খুশি হতে পারলেন না সত্যেন। যেমন বেয়াড়া সাইজ, তেমনি পুরনো মডেল। কাজের সময় বিগড়ে যাবে কিনা কে জানে। ঠিক আছে, এটা রইল। তবে নতুন মডেলের আর একটা ভাল জিনিস চাই।

তাও একদিন এসে গেল সত্যেনের হাতে। এবার খুশি হলেন সত্যেন। চমৎকার জিনিস। একেবারে নতুন মডেলের। কিন্তু নরেনকে কাছে পাবার উপায় কি! হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ড, আর ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড এক নয়। ওখানে দিব্যি সে এখন রয়েছে জামাই আদরে। পাশে রয়েছে হিগিন্স আর লিণ্টন। কি করা যায় এখন এ পরিস্থিতিতে।

এদিকে আর সময়ও নেই। পয়লা সেপ্টেম্বর মামলার তারিখ। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করলেও বিচারকের সামনে কিছু বলার মত সুযোগ এখনো নরেন পায়নি। ওদিনই সে বিচারকের সামনে স্বীকারোক্তি করবে বলে জানা গেছে। না, সে সুযোগ আর ওকে দেওয়া হবে না। তার আগেই ওকে শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব। ওকে কাছে পেতে হবে তো।

প্রথমেই সত্যেন গিয়ে ভর্তি হলেন জেল হাসপাতালে। সবাই জানে তিনি হাঁপানীর রোগী। তাই তাঁর পক্ষে জেল হাসপাতালে ভর্তি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত কানাইলালকে পাঠাতে হল হাসপাতালে। উপায়ও ছিল না। ৩০শে আগস্ট সকাল থেকেই তার পেটে সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। হাসপাতালে না পাঠালে এর চিকিৎসা হবে কি করে?

এদিকে হাসপাতালে এসেই টোপ ফেলেছেন সত্যেন বসু। নরেনের মত আমিও স্বীকারোক্তি করব বিচারকের কাছে। তোমরা একবার ওকে নিয়ে এস আমার কাছে। দুজনের বক্তব্য এক হওয়া চাই তো! নইলে মামলা ফেঁসে যাবে যে।

সঙ্গে সঙ্গেই টোপ গিলল পুলিশ। বাঃ, এত সুখের কথা। ঠিক আছে, আমরা ওদিনই ভোরে তাকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে। ওদিন মামলার তারিখ। দশটায় আবার যেতে হবে কোর্টে।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সাল।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মত নরেনকে নিয়ে আসা হল হাসপাতালের ডিস্পেন্সারিতে। সঙ্গে প্রহরী হিগিন্স ও লিণ্টন। ওদিক দিয়ে আনা হল সত্যেনকে। পেছনে পেছনে কানাইও এক সময়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ভাল ছেলেটির মত।

সত্যেনের পকেটে সেই বেয়াড়া সাইজের রিভলবারটি। অন্যটি কানাইয়ের কাছে।

শুরু হল কথাবার্তা। সত্যেনের এক হাত তার জামার পকেটে। কথা বলতে বলতে জামার পকেট থেকেই এক সময়ে তাঁর রিভলবার গর্জে উঠল দ্রাম—!

ওরে বাপরে! এক হাতে উরু চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে নরেন গিয়ে আশ্রয় নিল হিগিন্সের আড়ালে। হিগিন্স তাকে আগলে দাঁড়াতেই আবার গুলি ছুটল—দ্রাম! এবার হিগিন্সের বুড়ো আঙ্গুলটাই উড়ে গেল গুলির আঘাতে।

শুরু হল দৌড়-ঝাঁপ-হৈ-হল্লা, চীৎকার চেঁচামেচি। সেই সঙ্গে পাগলা ঘণ্টি বেজে চলল একটানা—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং…

এদিকে নরেন একলাফে বেরিয়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করেছে গোরা ডিগ্রির দিকে। সঙ্গে হিগিন্স এবং লিন্টন। তবু রেহাই পাওয়া গেল না। ততক্ষণে কানাইলালের রিভলবার গর্জে উঠেছে দিক-বিদিক কাঁপিয়ে—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

লিন্টন রীতিমত বলশালী লোক। হঠাৎ সে সত্যেনকে মাটিতে ফেলে দিল ধাক্কা মরে। তারপরেই জাপ্টে ধরল কানাইকে।

কানাই তখন মরিয়া। ঐ যে নরেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে পালাচ্ছে। এদিকে রিভলবারে আর একটা মাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে। বিশ্বাসঘাতককে শেষ করতে হলে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। অথচ বাদ সেধেছে লিন্টন। ওর হাত থেকে মুক্ত হবার উপায় কি!

উপায়ান্তর না দেখে কানাই তার রিভলবারের বাট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে বসলেন লিন্টনকে, তবু কোন সুরাহা হল না। লিন্টন তেমনি অটল, অনড়।

ওদিকে ততক্ষণে নরেন আরো খানিকটা এগিয়ে গেছে গোরা ডিগ্রির দিকে। আর সামান্যই বাকি। তারপরই সে চলে যাবে পাল্লার বাইরে।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল কানাইয়ের। কোনরকমে তিনি লিন্টনের কবল থেকে ডান হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন শেষবারের মত —দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে নরেন পাশের নর্দমায় আছড়ে পড়ল দড়াম করে। ব্যস, শেষ।

তখনো আলিপুর জেলের পাগলাঘণ্টি সেই একইভাবে বেজে চলেছে ঢং ঢং করে।

ছুটে এল সেপাই-শান্ত্রীর দল। ছুটে এল জেলার, জেলসুপার, জমাদার, মেট্রন, ওয়ার্ডার ইত্যাদি সবাই। কাণ্ড দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন জেলার যোগেনবাবু। কি সর্বনাশ! আমার পেন্সনের কি হবে!

এদিকে খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। ইংরেজ সরকারের দুর্ভেদ্য কারাগারে আবদ্ধ থেকেও যে কেউ

এমন কাণ্ড করতে পারে তা এতকাল তাদের স্বপ্নেরও বুঝি অগোচর ছিল।

অভিনন্দন ভেসে এল সুদূর প্যারিস থেকে। বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওখানকার সোস্যালিস্টদের মুখপাত্র 'Humanite' পত্রিকায় বলা হল :

'ভারতীয় বিপ্লবীরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।' [ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃ ৬০]

বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে ঘটনাটা সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ মল্লিকা। এ ব্যাপারে আইনজ্ঞ না হয়েও সত্যেন যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা এক কথায় অপূর্ব। কারণ, ও দিনই ছিল শেষ দিন। কোনরকমে ফসকে গিয়ে একবার যদি নরেন কোর্টে দাঁড়িয়ে বলার মত সুযোগ পেত, তাহলে আলিপুর বোমার মামলার ফলাফল যে খুবই শোচনীয় হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ প্রসঙ্গে অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগো কি বলেছেন শোনা যাক।

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের (মিঃ বার্লো) কোর্টে অতিরিক্ত দেরি হচ্ছে বলে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেননি। তাতে আমাদের পক্ষের উকিল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে,—যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হলনা, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না—যাবৎ সে আবার যথারীতি সেসান আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়।

এই মঞ্জুরিটি না নিলে গোঁসাইকে মারা বৃথা হত, আর অরবিন্দবাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হত। তখন বার্লোসাহেবের কোর্টে কোন উকিলই এর আবশ্যকতা বা তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত এবং তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল।' [বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা : পৃ-৩২৭]

আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ. আর. রো-এর আদালতে শুরু হল নতুন মামলা। আসামী কানাই ও সত্যেন। অপরাধ—জেলের ভেতরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা।

সত্যেনের পক্ষে আইনজীবী নিযুক্ত হলেন ব্যারিস্টার এ. সি. ব্যানার্জী ও উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু।

কানাই কাউকেই রাখলেন না। তাঁর সাফ কথা—হ্যাঁ, আমিই মেরেছি। ঘটনাচক্রে সত্যেন কাছে থাকলেও তার কোন অংশ ছিল না। আমি একাই মেরেছি।

—রিভলবার পেলে কোথায়? প্রশ্ন করলেন বিচারক রো—কে দিয়েছে তোমাকে?

—কে দিয়েছে ! হাসলেন কানাই, দিয়েছে ক্ষুদিরামের আত্মা ।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি ?

—ধন্যবাদ । তার কোন প্রয়োজন নেই ।

—এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার আছে তোমার ?

—না ধন্যবাদ ।

সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড । ১৯০৮ সালের ২১শে অক্টোবর হাইকোর্টও সে সাজা বহাল রাখলেন যথারীতি ।

এবার আপীল । সময় সাত দিন । যা করার এই সাত দিনের মধ্যেই করতে হবে ।

যথাসময়ে সত্যেন আপীল করলেন ছোটলাটের কাছে । কানাই ওসবের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না । তাঁর এক কথা—'There shall be no appeal.'

সত্যেনের আপীলও কোন কাজে এল না । ফলে একই সাজা বহাল রইল দুজনের প্রতি । অর্থাৎ—ফাঁসি ।

সত্যেন ব্রাহ্মসমাজের লোক । সমাজের প্রধান আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই একদিন জেলে গিয়ে হাজির হলেন তাঁকে আশীর্বাদ করতে । সত্যেন নিজেই তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বে ।

'সত্যেনকে তো আশীর্বাদ করে এলেন, ঐ সঙ্গে কানাইকেও করলেন না কেন ?'

সাক্ষাৎ শেষে ফিরে আসার পরে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন শাস্ত্রী মশাইকে । শাস্ত্রী মশাইয়ের স্পষ্ট উত্তরঃ 'কানাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ । অনেক তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ।'

অন্যতম নেতা উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় :

'জীবনে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই । সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে ।

প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে । ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পাতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যান নাই ।' [নির্বাসিতের আত্মকথা : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ-৯৭]

শেষ দেখা দেখতে এলেন দাদা আশুতোষ দত্ত । সঙ্গে অশ্রুমুখী মা ।

কানাই তেমনি নির্বিকার, তেমনি প্রশান্ত। এতদিন তুমি ছিলে আমার মা। আজ গোটা বাংলা দেশের মা। তাহলে দুঃখ কিসের?

১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে মেলায় নি। একে একে এসে হাজির হলেন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাস, জেল সুপার এমারসন এবং ছোট বড় আরও অনেকেই।

আজ কানাইয়ের শেষ দিন। পররাজ্যলোভী বিদেশী শাসকদের প্রতিহিংসায় বলি হিসাবে আজ তাকে চলে যেতে হবে পৃথিবী থেকে।

আয়োজনের ত্রুটি নেই। জেল পুলিশ ছাড়াও বাইরে থেকে আরও তিনশত সশস্ত্র পুলিশ এনে জমায়েত করা হয়েছে জেলের অভ্যন্তরে। জেলের কড়া শাসনে থেকেও যারা তলে তলে এত বড় কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাদের বিশ্বাস নেই। তাই সাবধান থাকাই ভাল।

কানাইয়ের সেই একই চেহারা। ফাঁসি মঞ্চে তোলার পরে প্রশ্ন করা হল—'তোমার কিছু বলার আছে?'

—না, ধন্যবাদ। হেসে জবাব দিলেন কানাই। সেই হাসি, যে হাসি সবাই তাঁর মুখে দেখে এসেছে বরাবর।

নিজের কর্তব্য শেষ করে কানাই চলে গেলেন। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু, তাই জেল গেটের বাইরে সেদিন দেখা গেল এক অভাবনীয় দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘগুরু মতিলাল রায়ের লেখনী থেকেই তার বিবরণ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'জেলের ফটকের দিকে আমাদের গাড়িখানি অগ্রসর হইতেই সমবেত জনমণ্ডলী বুঝিয়া লইল—আমরাই কানাইলালের আত্মীয়, চন্দননগর হইতে আসিতেছি। বিশাল সমুদ্রের উত্তাল জনতরঙ্গ আমাদের পথ করিয়া দিল। জলদ-গর্জন ধ্বনি উঠিল—'বন্দেমাতরম্।'

চতুর্দিকে পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন ছিল। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় রেগুলেশন লাঠি লইয়া শান্তিরক্ষকের দল এবং ফোর্ট উইলিয়াম হইতে একদল সশস্ত্র বৃটিশ সৈনিক ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

আমরা ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব, আলিপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য পুলিশ কর্তৃপক্ষগণ রুক্ষ ভাষায় আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

হ্যালিডে সাহেব এক বাঙ্গালী গোয়েন্দা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ডাঃ আশুতোষ দত্ত কোন্ ব্যক্তি?'

আশুবাবুর পরিচয় তিনি সহজেই পাইলেন। তারপর আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কি? আশুবাবু আমাদের সকলকেই নিকটাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, আমাদের জেল-ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল।

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, হ্যালিডে সাহেব উদ্ধত কণ্ঠে বলিলেন—'আমরা মাত্র দুইজনকে জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দিব। আপনারা কে-কে জেলের ভিতর প্রবেশ করিবেন?'

আশুবাবু আমাকে লইয়া জেলের অন্তঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ওয়ার্ডারদের সংকেতে আমরা এক সেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কি দেখিলাম? অপ্রশস্ত কক্ষে মেঝের উপর আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া কানাইলালের মৃতদেহ রক্ষা করা হইয়াছে।

আশুবাবু অশ্রুসংবরণে অসমর্থ হইলেন। আমার চক্ষে অশ্রু নির্গত হইল না। জ্বালাময় অগ্নিশিখায় নয়নদুটি জ্বলিয়া উঠিল। ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিলাম—কয়েক জন দেশীয় ওয়ার্ডারের সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার।

এই ব্যক্তি কানাইলালের সেলে পাহারা দিত। ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর কানাইলালকে উৎফুল্ল দেখিয়া এবং তাহার দিন দিন ওজন বৃদ্ধি হওয়ায় এই আইরিশ ওয়ার্ডারই কানাইলালকে বলিয়াছিল—'ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করার কালে তোমার এই স্ফূর্তি কি আকার গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিব।'

দেখিলাম সেই আইরিশ ওয়ার্ডারের চক্ষে জল ঝরিতেছে। আশুবাবুর করমর্দন করিয়া সে বলিল—'মিঃ দত্ত, আপনি কাঁদিবেন না। আপনার ভাই একজন খাঁটি বীর এবং এত বড় নির্ভীক দেশপ্রেমিক আয়ার্ল্যাণ্ডেও অধিক মিলিবে না।'

এই আইরিশ ওয়ার্ডার চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আমাদের কানাইলালের অন্তিম কাহিনী বর্ণনা করিল। তাহারই মুখে শুনিলাম—'নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর কানাইলালের ১০৫ ডিগ্রী জ্বর উঠিয়াছিল। তারপর জ্বরের বিরাম হইলে, তাঁহাকে ডাক্তার কুইনাইন দিতে চাইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সিংহের মত সর্বদাই পদচারণা করিতেন। আর তাঁহার জ্বর হয় নাই। তাঁহার মুখে হাসি সর্বদাই দেখিতাম।' সে আরও বলিল—'আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, ফাঁসির সময়ে এই হাসি তাঁহার থাকিবে না।' কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার চক্ষু যখন আবৃত করা হইতেছিল, হাসিতে হাসিতেই তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'তুমি আমায় এখন কেমন দেখিতেছ?'

আইরিশ ওয়ার্ডার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—'গলায় ফাঁস কিছু কঠিন বোধ হওয়ায়, তিনি নিজেই তাহা ঠিক করিয়া লইলেন। তারপর তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।'

আশুবাবুও রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

আমরা কানাইলালের সেলে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথমে কম্বলটি অপসারণে প্রবৃত্ত হইলাম। ওয়ার্ডারগণ 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল। তাহাদের প্রতি হুকুম আছে—এই অবস্থায়ই জেলের বহিঃপ্রাঙ্গণে শবদেহ লইয়া যাইতে হইবে। পুলিশ কমিশনারের সম্মুখেই শবের দেহাবরণ মুক্ত করিতে হইবে।

আমি তদনুযায়ী কয়েকজন ওয়ার্ডারের সাহায্যে কম্বলমণ্ডিত কানাইলালের শবদেহ বুকে করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তারপর কমিশনারের সম্মুখে কানাইলালের অঙ্গাবরণ মুক্ত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনার ভাষা আমার নাই।

দেখিলাম—কণ্ঠের দুই পার্শ্বের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কানাইলালের দৃষ্টি উন্মীলিত। ওষ্ঠপুটে দন্ত রাখিয়া তাহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক বদনমণ্ডল মৃত্যুঞ্জয়ী রুদ্রের মত শোভা পাইতেছে।

আমি তাহার ললাট হইতে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া, তাহার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলাম। তারপর দৃষ্টি পড়িল দীর্ঘ দেহযষ্ঠির উপর। কানাইলালের বাহু দুটি ছিল আজানুলম্বিত। ইহা এতদিন লক্ষ্যে পড়ে নাই। আজ তাহার দীর্ঘ সুবিস্তৃত বাহুদ্বয় লক্ষ্য করিলাম। তাহার হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। মরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ইহা লক্ষণ অথবা ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হইবে, এই দৃঢ়প্রত্যয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

কানাইলাল চিরদিনই হাতের ও পায়ের নখরগুলি দীর্ঘ রাখিত। আজ সেগুলি আরও দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। কানাইলালের সেই বীরসজ্জা আজিও হৃদয় হইতে আমি মুছিতে পারি নাই। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই বীর শহীদ আমার মনে চিরজাগ্রত থাকিবে।

ডাঃ আশুতোষ দত্ত ভ্রাতার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাড়া দিয়া বলিলেন, 'শব দীর্ঘক্ষণ এইভাবে থাকিতে পারে না; শীঘ্র ব্যবস্থা করুন।'

আমি অপর দুইজন বন্ধুর সাহায্যে কোঁচান ধুতিখানি কানাইলালকে পরাইলাম। কোঁচান চাদর গলদেশে লম্বমান করিয়া পুষ্পমাল্যে তাহাকে বিভূষিত করিলাম। ললাটে চন্দন লেপন করিয়া তাহার বীর-মূর্তি শয্যাধারে উঠাইয়া লইলাম।

তারপর হরিধ্বনি করিয়া ফটকের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করা মাত্র হ্যালিডে সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, 'শবের মুখ অনাবৃত রাখিয়া শবযাত্রা করিতে দিব না। আর এ পথে আপনাদের গমন নিষিদ্ধ। আপনারা জেলের পাশ্চাৎদ্বার দিয়া বহির্গমন করুন।'

কানাইলালের অগ্রজ আশুতোষ বিহ্বল, বিমূঢ়। তিনি ক্রুরমূর্তি হ্যালিডে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি উদ্ধত কণ্ঠে বলিলাম, 'কানাইলালের মুখে আমরা কোনই আবরণ দিব না এবং প্রশস্ত পথ দিয়াই শবযাত্রা করিব।'

এই কথা শুনিয়া হ্যালিডে সাহেব রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আপনার নাম কি ?'

আমি গর্বের সহিত নিজের নাম বলিলাম। হ্যালিডে সাহেব একজন বাঙালী পুলিশ কর্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ইহার নাম লিখিয়া রাখ।' তারপর বল-দর্পিত অঙ্গুলী-সঙ্কেতে জেলের পশ্চাৎ দিক দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'এই দিক দিয়া শব লইয়া যাও। আর শবের মুখ আবৃত্ত করা হোক।'

আমার জিদ বাড়িল। আমি বলিলাম, 'ইহা কিছুতেই হইবে না। কানাইলালের মৃত্যুদণ্ডেও আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুর পর আমরা ইচ্ছামত তাহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবে—ইহাতে আপত্তি করা সংগত নহে।'

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বাড়ি কোথায় ?'

আমি বললাম, 'চন্দননগর।'

তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন, 'ইহা চন্দননগর নহে, আলিপুর, মনে রাখিবেন। আমার আদেশ অমান্য করিলে, এইখানেই শবদেহ রাখিয়া আপনাকে বন্দী হইতে হইবে।'

যৌবনের শোণিতপ্রবাহ উজানে বহিল। কি বলিতে যাইতেছিলাম—আশুবাবু অনুরোধ জানাইলেন, 'বিবাদে প্রয়োজন নাই—সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহাই পালন করুন।'

অবস্থা বুঝিয়া নীরব রহিলাম। কানাইলালের উল্লাসিত মুখমণ্ডলে বস্ত্রাবরণ দিয়া জেলের পশ্চাৎপথে পা বাড়াইতে হইল। কিছুদূর গিয়া দেখি—সারি-সারি পায়খানার বিষ্ঠাহ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজের অনুগ্রহ-স্মরণে নাকে কাপড় দিয়া—বামে আদিগঙ্গা, দক্ষিণে পায়খানা-শ্রেণী রাখিয়া, অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া আমরা জেলের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিশাল জনসমুদ্র সদর-ফটক দিয়া শবদেহ লইয়া যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া জেলের পশ্চাৎ প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা

জেল সীমা অতিক্রম করিতেই তুমুল ধ্বনি উঠিল, 'বন্দেমাতরম্।'

লক্ষ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা। সে অপূর্ব দৃশ্য যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্মৃতি কোন দিন মন হইতে মুছিতে পারিবেন না। কয়েকজন ইংরাজ পুলিশ শবযাত্রার অনুগমন করিতেছিলেন। জনগণের উৎসাহ-দর্শনে সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যে একজন আত্মবিস্মৃত হইয়াই বলিলেন, 'শবের মুখ হইতে বস্ত্রাবরণ দূর করিয়া দিন।'

আমি তাহাই করিলাম। চতুর্দিক হইতে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ শবাধারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তরুণের দল আসিয়া শবাধার বহন করিতে চাহিল। পথের দুই ধারে অগণন দেশবাসী দাঁড়াইয়া জয়-রবে দিঙমণ্ডল ধ্বনিত করিল। পথের উভয় পার্শ্বে অলিন্দ হইতে কুলকামিনীগণ হুলুধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আমরা কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলাম। এমন জনসমাগম জীবনে লক্ষ্য করি নাই। জাতীয়তাবোধে উন্মত্ত আবালবৃদ্ধ-বনিতা কানাইলালের চরণ-স্পর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমরা শ্রেণীবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক দাঁড় করাইয়া প্রশস্ত পথ রচনা করিলাম। গীতা উপহার কানাইলালের শবদেহ আচ্ছন্ন করিল। পুষ্পমাল্যের স্তূপ-রচনা হইল। কানাইলালের চরণ চুম্বন করিয়া কত নারীপুরুষ যে এমন বীর পুত্রের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য-কামনা উচ্চারণ করিল তাহা বর্ণনা করার নহে।

আমরা শবদেহ শ্মশানে আনিয়া কর্তব্য শেষ করিলাম। কাহারা যে প্রশস্ত চুল্লি কাটিল, ভারে-ভারে চন্দনকাষ্ঠ আনিল—তাহার সন্ধান কে রাখে!

শবদেহ চিতার উপর রক্ষা করিয়া জনগণের অনুরোধে সেই দিন আমার শহীদ কানাইলালের জীবনবৃত্তান্ত উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে হয়। একখানি উন্নত টুলের উপর দাঁড়াইয়া সেই দিন দেখিয়াছি—অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতার অগ্রপুরোহিত কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমার কণ্ঠে এত অগ্নি ছিল, এত ভাষা ছিল—সেইদিন তাহার প্রমাণ পাইলাম। লক্ষ লক্ষ নরনারী নীরবে আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিল। তারপর উচ্চারণ করিল তুমুল রবে, 'বন্দেমাতরম্।'

কানাইলালের চিতা জ্বলিল। চন্দনকাষ্ঠ ভারে-ভারে আসিয়া চুল্লিকে নিভিতে দিল না। হেমন্তের মধ্যাহ্ন মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অপরাহ্ন আসিয়া দেখা দিল। কানাইলালের চুল্লি নিভিতে চাহে না, ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে হরিধ্বনির সহিত তরুণ কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' শব্দ উঠিতেছে।

লক্ষ লক্ষ নরনারী নীরবে প্রজ্জ্বলিত চুল্লির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য অস্তগামী হয়—আশুবাবু বিদায় প্রার্থনা জানাইলেন। চুল্লি নিভিল, কিন্তু কানাইলালের অস্থি খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো খুঁজিয়া বাহির করিতে সমবেত জনতা প্রবৃত্ত হইল। আমরা কানাইলালের চিতাভস্ম আদিগঙ্গায় বিসর্জন দিয়া কানাইলালের শেষকৃত্য সমাপ্ত করিলাম।'

[আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী : মতিলাল রায় : পৃ ৩৬-৪২]

সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে সহবন্দী উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলোও এই ফাঁকে শুনে নাও।

'কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির সময় তাঁহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। তাহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই, এজন্য প্রহরীকে ডাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন।

একজন ইয়োরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?' যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।'

[নির্বাসিতের আত্মকথা : পৃ ৬৪]

সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ।

শবযাত্রীরা সবাই ফিরে গেছে শ্মশান থেকে। যায়নি শুধু দুটি তরুণ। চুপচাপ একপ্রান্তে বসে মনে মনে তারা কি ভাবছে কে জানে।

—কিরে! বাড়ি যাবিনে আজ!

কোন উত্তর এল না অন্য তরুণটির কাছ থেকে। বেশ বোঝা যায় যে, মনে তার ঝড় বইছে। উদ্দাম ঝড়।

কে এই তরুণ দুটি! একজন বিপ্লবী নায়ক ও মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। আর অন্যজন! অন্যজন তাঁরই বন্ধু বীরেন দত্তগুপ্ত।

বীরেন দত্তগুপ্ত! নামটা মনে রেখো মল্লিকা। একটু বাদেই আবার তুমি দেখতে পাবে ধ্যানমগ্ন তরুণ এই বীরেন দত্তগুপ্তকে।

২১শে নভেম্বর, ১৯০৮ সাল।

এবার সত্যেন। অবশ্য অনেক আগেই তাঁর ফাঁসি হয়ে যেত; শুধু আপীল করেছিলেন বলেই তারিখটা পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল সাময়িকভাবে।

ভোর পাঁচটা। সেই একই দৃশ্য। একই ফাঁসি মঞ্চ। জেল গেটের বাইরে সেই হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতা।

কিন্তু এবার আর আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন না শাসক সম্প্রদায়। প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন,—ওরা যে ভারতবর্ষের এতদিনকার শান্ত ও নিস্তরঙ্গ দীঘির জলে এমন করে ঢেউ তুলবে, তা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

তাই উদ্বেলিত জনতার হাতে শবদেহ না দিয়ে নিজেরাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে। ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠেছে। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই।

যুক্তি হিসেবে বলা হল—এখন থেকে কোন 'ক্রিমিনাল'-এর মৃতদেহ আর বাইরে আনতে দেওয়া হবে না। সরকারী নির্দেশ তাই।

'ক্রিমিনাল!' হ্যাঁ, এই বিশেষণই সেদিন বিদেশী সরকার দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে অসংখ্য বিপ্লবী শহীদবৃন্দকে।

বাইরে অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজন। সবকিছু চুকে যাবার পরে কাছে এসে দাঁড়ালেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট। বললেন :

'You can go now. The thing is over. Satyender died bravely!'

একটু থেমেই আবার বলতে লাগলেন সেই শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টটি :

'When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, be ready, he answered : Well, I am quite ready, and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully. A brave lad!'

এখন যেতে পারো। কাজ শেষ। সত্যেন বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছেন। ফাঁসি মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্য ডাকতে গিয়ে দেখলাম—তিনি জেগেই রয়েছেন। বললাম—প্রস্তুত হোন। হেসে বললেন—আমি প্রস্তুতই রয়েছি। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন ফাঁসি মঞ্চের দিকে। বীরের মতই আরোহণ করলেন ফাঁসি মঞ্চের ওপর। বীর বালক।

ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। একই বছরে কানাই প্রাণ দিলেন ১০ই নভেম্বর এবং সত্যেন—২১শে নভেম্বর। অপরাধ, জেলের অভ্যন্তরে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করা। কারণ, নরেন স্বীকারোক্তি করেছিল পুলিশের কাছে।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় মল্লিকা। নরেন একাই কি সেদিন স্বীকারোক্তি করেছিল পুলিশের কাছে! অন্য সবাই করেনি।

তাহলে একা নরেনকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবন দিয়ে?

তফাৎটা কোথায় ?

আলিপুর বোমার মামলার সেই দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়টির কথাই এবার তোমাকে আমি বলবো মল্লিকা।

বলতে না পারলেই বোধ হয় ভাল হত, কিন্তু ইতিহাস যে বড় নির্মম, বড় ক্ষমাহীন। তাই অপ্রিয় হলেও এ কথা আমাকে বলতেই হবে ইতিহাসের খাতিরে।

নরেন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল একথা সত্য। কিন্তু শুধু কি নরেন একাই ? সবার আগে দলের প্রধান সংগঠক বারীন ঘোষ করেন নি ? দলনেতা অরবিন্দ বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তা অমান্য করে তিনি স্বীকারোক্তি করেন নি পুলিশ অফিসার রামসদয় মুখার্জীর কাছে ?

শুধু কি তাই। অরবিন্দের নির্দেশ ছিল—কোর্টে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নাও। দুর্ভাগ্য, সে নির্দেশও তিনি অমান্য করেছিলেন নিজের খেয়ালে।

স্বভাবতই উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণবৃন্দ তখন বিভ্রান্ত, দিশেহারা। দলের প্রধান সংগঠক যেখানে স্বীকারোক্তি করেছেন, সেখানে কোন পথে যাবেন তাঁরা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের স্বীকারোক্তি করতে হল বাধ্য হয়ে।

মল্লিকা, কোন বিপ্লবী দলের প্রধান সংগঠনের পক্ষে এ ভূমিকা কি সমর্থনযোগ্য ?

মনে রাখতে হবে, নিয়মতান্ত্রিক দল, আর বিপ্লবী দল এক নয়। নিয়মতান্ত্রিক দলে একের বিরুদ্ধে অন্যের বিবৃতি দিতে বা প্রকাশ্যে খেয়োখেয়ি করে লোক হাসাতে কোন বাধা নেই, কিন্তু সত্যিকারের বিপ্লবী দল তো ভোট-প্রার্থী কোন Constitutional দল নয়। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা সেখানে থাকবেই।

বিপ্লববাদ বুঝতে হলে তার তাৎপর্য তোমাকে বুঝতে হবে মল্লিকা। বিপ্লবী সংগঠনের শক্তির উৎস বিশেষভাবে নির্ভর করে দুটি জায়গায়। এক—মন্ত্রগুপ্তি আর—নিয়মানুবর্তিতা। নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে মন্ত্রগুপ্তির কোন মূল্য থাকে না। সে ক্ষেত্রে বিপ্লবকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

বিপ্লববাদ মুখের কথা নয়। খাঁটি বিপ্লবী হতে গেলে চাই বিপ্লববাদের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। চাই নিজ আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। চাই গভীর দেশাত্মবোধ। চাই ইস্পাতকঠিন অনমনীয় চরিত্র, যা হাজার আঘাতেও এতটুকু টলবে না।

দলনেতা শ্রীঅরবিন্দ বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও বারীন ঘোষ স্বীকারোক্তি করেছেন। তার যুক্তি : 'My mission is over'. এবার দেশবাসীকে জানিয়ে যেতে চাই যে, আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল।

মানলাম, কিন্তু কোন খাঁটি বিপ্লবী দলে দলীয় নির্দেশ অমান্য করে খেয়াল খুশি মত কিছু করার অধিকার কারো থাকে কি? থাকা উচিত কি?

বিপ্লবী দলে কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি নেতৃস্থানীয় কাউকে না জানিয়ে কোন over-act করতেন, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত বলেই ইতিহাসের উক্তি। এ কাজ বিপ্লবী সংস্থায় অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি দিতে না পারাটাই বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির অযোগ্যতা। এসব আত্মঘাতী কাজকে সমূলে বিনষ্ট করাই গুপ্ত সমিতির যথার্থ যোগ্যতা। মিলিটারী ডিসিপ্লিন যে দলের নেই, সে দলের লোক আর যাই হোন, বিপ্লবী নন।

এবার নরেন গোঁসাইয়ের কথায় আসা যাক। অরবিন্দের অভিমত :

'গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসে পূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই অ্যাপ্রুভার হয়।'

[কারাকাহিনী : পৃ-৩৩-৩৪]

হয়ত তাই। কিন্তু সেদিনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিন্তু এর পেছনে কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এটাই দেখা যায় যে, এর আগে পর্যন্ত তার ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। কোন ত্রুটিই তার ছিল না কর্তব্য পালনে। প্রতিটি দলীয় নির্দেশ সে পালন করেছিল যথাযথভাবে। তাহলে পরবর্তীকালে তাকে বিপরীত ভূমিকায় দেখা গেল কেন?

কারণ, বারীন ঘোষ। তাঁর misson over হয়েছে, তাই সবকিছু তিনি জানিয়ে যেতে চান দেশবাসীকে। অতি উত্তম কথা।

কিন্তু স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে তখনও পর্যন্ত যাঁরা ধরা পড়েন নি, তাঁদের নামগুলো কেন তিনি প্রকাশ করতে গেলেন পুলিশের কাছে? এর পেছনে যুক্তি কোথায়?

উল্লেখযোগ্য, তখনও পর্যন্ত নরেন ছিল সন্দেহমুক্ত। পুলিশের কোন অভিযোগই ছিল না তার বিরুদ্ধে। তবু তাকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হল বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তির ফলে।

ব্যস, সেই হল কাল। গ্রেপ্তারের পর সব কথা শুনে ক্ষেপে গেল নরেন! দলের প্রধান সংগঠক হয়ে বারীন ঘোষ যদি তাকে এভাবে ধরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সেও কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না, তাতে যা হবার হোক।

এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক কালের খ্যাতনামা লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর বহু আলোচিত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'বারীন্দ্র যদি নরেন গোঁসাইকে ধরাইয়া না দিতেন, তবে গোঁসাই রাজসাক্ষী

হইয়া অরবিন্দকে জড়াইতেন না। অরবিন্দকে জড়াইবার ফলেই না সত্যেন ও কানাই গোঁসাইকে জেলের মধ্যে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিল। ফলে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হইল। ব্যাপার এতদূর গড়াইবার জন্য বারীন্দ্রই দায়ী।'

একই বক্তব্য রেখেছেন বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

'নরেন গোঁসাই প্রথমে ধরা পড়েনি। বারীনবাবু নাকি পুলিশের কাছে প্রদত্ত তাঁর স্বীকারোক্তিতে নরেনের নাম উল্লেখ করেন। ফলে, নরেন ধৃত হয়ে আক্রোশ মেটাবার জন্য রাজসাক্ষী হয়।'

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ঃ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় : পৃষ্ঠা ৮৬]

আর বারীনবাবু। তিনি কি বলেন এ সম্বন্ধে ?

'আমাদের দফা তো এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।...এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর গাঢ় প্রলেপ আছে।...আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতক হস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।...খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাই-এর নাম বলা হইয়াছিল।'

[আত্মকথা : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

চমৎকার যুক্তি। অর্থাৎ—একা মরি কেন, মরি তো দলের সবাইকে নিয়েই মরব। দলের অন্যতম প্রধান নেতার এ মনোভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক নয় কি ?

আর শুধু কি নরেন ? চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারু রায় এবং আরো কয়েকজন কেন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পরবর্তীকালে ? ঐ একই কারণে নয় কি ?

এবার রাজা সুবোধ মল্লিকের কথায় আসা যাক। কলকাতা শহরে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নামটা আজ আর বোধ হয় কারো অজানা নয়।

কে এই রাজা সুবোধ মল্লিক। বিখ্যাত দানবীর এবং দেশসেবক, যিনি সেদিন এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। উল্লেখযোগ্য, তাঁর এই রাজা উপাধিটা সরকারের দেওয়া নয়, জনসাধারণের দেওয়া। জনসাধারণই সেদিন তাঁকে এই আখ্যা দিয়েছিল শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে।

নিজে বিপ্লবী না হলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অরবিন্দের একজন গুণগ্রাহী এবং বিপ্লবীদের পরম শুভার্থী বন্ধু। কিংসফোর্ডকে শাস্তি দেবার ব্যাপারেও তীনি ছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তাঁকে কেন দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছিল রুদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে ? বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তিই কি তার জন্য দায়ী নয় ?

তবে সব চাইতে বেশী মাশুল বোধ হয় দিতে হয়েছিল অগ্নিযুগের

দ্রোণাচার্য অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র কানুনগোকে। দলনেতা অরবিন্দের মত তিনিও নিজের আদর্শে অবিচল ছিলেন সর্বক্ষণ। বিচারকালে পুলিশ কোন প্রমাণও দাখিল করতে পারেনি তাঁর বিরুদ্ধে। তবু তাঁকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল বারীন ঘোষের ঐ স্বীকারোক্তির ফলে।

'হেমচন্দ্র অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বারীন তাঁহার নাম প্রকাশ করাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করিলেন।'

[শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী]

মল্লিকা, বারীন ঘোষের সেদিনের সেই ভূমিকাকে পরবর্তীকালের একজন বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় নিকুঞ্জ সেন কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন আমি তা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, স্বীকারোক্তি—স্বীকারোক্তিই। তাছাড়া একথাও সবাই স্বীকার করবেন যে, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেতাদের স্বীকৃতিতে দলের যতটা ক্ষতি হয়, নরেন গোঁসাইয়ের মত কোন সাধারণ সভ্যের স্বীকারোক্তিতে দলের তেমন ক্ষতি হতে পারে না। কেননা দলের সব কথা সে জানে না, তাই কতটুকু সে বলবে?

ওদিকে বারীন্দ্র ছিলেন দলের নেতা। তিনি তো সবই জানতেন। সব কথাই অকপটে বলেছেনও। শুধু অরবিন্দের নামটা বলেন নি।

বারীন্দ্র বলেছেন, 'খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময় নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল।' খুন সত্যিই তাঁর চেপেছিল। তা না হলে বিপ্লবী নায়ক হয়েও বিপ্লবীর ধর্ম থেকে তিনি এমন করে বিচ্যুত হলেন কি করে?

মন্ত্রগুপ্তির শপথ যে তিনি নিজে নিয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রেরণায় অন্য সভ্যরাও নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবী নেতা হয়েও ধরা পড়া মাত্র তা এমন করে নির্বিবাদে ভেঙে ফেলবার ঝোঁক তার কি করে এল? সত্যই খুন না চাপলে এমন মারাত্মক ভুল মানুষ করতে পারে না।

শুধু এটুকুই নয়। আরো কত কি যে সেদিন করেছিলেন, আর কত কথাই যে বলেছিলেন, তার শেষ নেই।

হেমচন্দ্র সম্পর্কে বারীন্দ্র বলেছেন যে, হেমচন্দ্র যখন জেলে ওদের কাছে এলেন, তখন হেমচন্দ্রকেও তিনি স্বীকারোক্তি করতে বলেছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র বারীন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করলেন না। বরঞ্চ বারীন্দ্রকে বললেন,—তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিতে।

পুলিশ যখন বুঝতে পারল যে, হেমচন্দ্রকে দিয়ে ওদের কাজ হবেনা, তখন তাঁকে আর ওখানে না রেখে অন্যত্র সরিয়ে নিল।'

[নিশানা : জুন সংখ্যা : ১৯৮০]

মল্লিকা, বারীন ঘোষ বাংলার বিপ্লববাদের অন্যতম পথিকৃৎ, একথা একশবার সত্য। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় কি?

সেদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি করা। কিন্তু সবাইকে না জড়িয়ে তিনি একা প্রাণ দিলে কি কিছু কম আলোড়নের সৃষ্টি হত সারা দেশে?

অবশ্য অগ্নিযুগের ইতিহাসে স্বীকারোক্তি করা নতুন কিছু নয়। এমন অনেকেই স্বীকারোক্তি করেছিলেন পরবর্তীকালে। কিন্তু তার পেছনে যুক্তি ছিল একটাই। সেটা হল—নিজের উপর সব দায়িত্ব টেনে নিয়ে সহকর্মীদের রক্ষা করা। তা না করে 'মরতে হয় তো সবাই মিলে মরব'—এ যুক্তি একেবারেই অর্থহীন নয় কি বিপ্লববাদের ইতিহাসে?

বারীন ঘোষ কি জানতেন না যে, তাঁর এই স্বীকারোক্তির পরিণাম কি। নিশ্চয়ই জানতেন। তাহলে কেন তাঁর এই অদ্ভুত মানসিকতা?

সেদিন একটা বই পড়েছিলাম মল্লিকা। মার্কসবাদী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের লেখা। এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

'কোন আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয়। বুদ্ধি এবং হৃদয়-বৃত্তির কারবার। বিপ্লবটাও তাই। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে হৃদয়-বৃত্তির আধারটা নিচু স্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হবে।'

যদিও আমি রাজনীতি করিনে, তবু তাঁর এই কথাগুলো আমার খুবই ভাল লেগেছিল মল্লিকা। মনে হয়েছিল, সেদিন বারীন ঘোষ যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, তার আসল কারণ রয়েছে এইখানেই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা থাকলে রাগিনীতে আলাপ করা চলে না। তা করতে গেলে বুদ্ধি, চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য।

বারীন ঘোষকেই কি কম মূল্য দিতে হয়েছিল এই স্বীকারোক্তির ফলে?

অনুগামীদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি তখন বিলুপ্তপ্রায়। বিশেষ করে তরুণ সদস্যদের তো কথাই নেই। তাঁরা তখন রীতিমত ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। তাঁদের একান্ত প্রিয় বারীনদা যে কখনো এমন কাজ করতে পারেন, এ বুঝি তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

বারীন ঘোষ নিজেও জানতেন সে কথা। আগেকার সেই ভাবমূর্তি ফিরে পাবার জন্য চেষ্টাও তখন তিনি কিছু কম করেন নি, কিন্তু সবই পর্যবসিত হয়েছিল ব্যর্থ লজ্জার গুরুভারে।

যেমন ধরো, রিভলবারের ঘটনা। নরেন গোসাই প্রাণ দিয়েছিলেন রিভল-বারের গুলিতে। কিন্তু জেলের অভ্যন্তরে ও দুটো এল কি করে?

এ নিয়ে বহু রকম গাল-গল্প প্রচলিত আছে মল্লিকা। কেউ বলেন—ও দুটোকে কাঁঠালের ভেতরে ভরে পাঠানো হয়েছিল বাইরে থেকে। কারো অভিমত ভগ্নি সরোজিনী দেবীই নাকি ও দুটো পাচার করেছিলেন দাদা অরবিন্দের কাছে। আবার এমন বইও আমি কিছু কিছু পড়েছি; যেখানে প্রতিটি বিপ্লবী গ্রন্থকারই দাবী করেছেন যে, এ কৃতিত্ব শুধু তাঁরই, আর কারো নয়।

কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়! আসলে বারীন ঘোষই ওগুলো বাইরে থেকে আমদানী করেছিলেন জেলের দু-একজন কর্মীকে বশীভূত করে। উদ্দেশ্য ছিল; তরুণ সম্প্রদায়কে ওগুলো দেখিয়ে জেল ভাঙার কাহিনী শুনিয়ে নতুন করে ইমেজ গড়ে তোলা।

পেরেছিলেন কি? না, পারেন নি। বরং তাঁর ভাণ্ডার থেকে কখন যে দুটো রিভলবার হাত সাফাই হয়ে গিয়েছিল, সে খবরও তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত।

তবে পরবর্তীকালে দুজন মানুষকে কিন্তু বেশ মূল্য দিতে হয়েছিল এই রিভলবার দুটোর ব্যাপারে। একজন জেলার যোগেন ঘোষ, নিজের পেনশন সম্বন্ধে যাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কার্যকাল শেষ হবার আগেই তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল অবসর গ্রহণ করতে। অন্যজন—জেল হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁর ড্রয়ারে বেশ কিছু টাকা এবং অলঙ্কার পাওয়া গিয়েছিল তল্লাসীর সময়ে, যার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তিনি দিতে পারেননি পুলিশের কাছে।

নরেন গোঁসাই নিহত হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। বারীন ঘোষ কি জানতেন তাঁরই মন্ত্রশিষ্য কানাই-সত্যেনের এই পরিকল্পনার কথা?

না; জানতেন না। দলের প্রধান সংগঠক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখন বিশ্বাসের বাইরে। তাই গোটা ব্যাপারটাই ঘটেছিল তাঁকে বাদ দিয়ে। বারীন ঘোষের নিজের ভাষায়:

'আমি জানিতাম না যে, ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে।...কাঁচা লীডারের যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদ্রূপই ছিল; বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের। সবাইকে লইয়া কাজ করিতাম বটে; কিন্তু আপন গোঁয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া ছেলেদের কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের ভাব যে দেখা দিয়েছে, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই যে আমাকে বাদ দিয়া, অন্ততঃ আমাকে না বলিয়া তাহারা একটা কিছু করিবে।' [আত্মকথা : পৃ—৮৫-৮৭]

জানি; একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তোমার মনে। ভাবছ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই যদি

স্বীকারোক্তি করে থাকেন, তাহলে নরেন গোঁসাইয়ের দোষটা কোথায় ? একমাত্র তাকেই কেন প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবন দিয়ে ? পার্থক্য কোথায় ?

পার্থক্য আছে বৈকি। বারীন ঘোষ সব কিছু স্বীকার করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু স্বীকার করেন নি দলনেতা অরবিন্দের কথা। উল্লাসকর বা উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সেই একই কথা। তাঁদের সবারই সেদিন লক্ষ্য ছিল—অরবিন্দকে আড়াল করে রাখা।

ব্যতিক্রম নরেন গোঁসাই। স্বয়ং অরবিন্দকেও সে রেহাই দিতে রাজী নয়।

'বারীনবাবু সকলের নামই উল্লেখ করেছিলেন, কেবল দয়া করে তাঁর 'সেজদা' অরবিন্দের নামটি উল্লেখ করেন নি। নরেন গোঁসাই অরবিন্দের নাম ও বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে সে অভাব পূর্ণ করে দিল।' [ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃ—৮৬-৮৭]

নরেনের স্বীকারোক্তি থেকে আমি তোমাকে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি মল্লিকা। তাহলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে তোমার চোখের সামনে।

'অরবিন্দ মাঝে মাঝে মুরারীপুকুর বাগানে যেতেন। একদিন আমাকে বারোটা টাকা দিয়ে বললেন—এক বিধবার বাড়ি ডাকাতি করার জন্য তোমাকে রংপুর যেতে হবে। ওখানে ঈশান চক্রবর্তী রয়েছেন। উনিই তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমি, হেমদাস (কানুনগো), পরেশ মৌলিক আর মহেন্দ্র লাহিড়ী ওই দলে ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমি যে রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা অবিনাশ ভট্টাচার্যের। ঈশান চক্রবর্তী আমাদের সাহায্য করেন। কিন্তু ওদিন গাঁয়ে পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাই আমরা বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসি।

অরবিন্দ বলেন—চিন্তার কি আছে। একবার হয়নি, আবার হবে।'

পার্থক্য এইখানেই। নরেনের লক্ষ্য ছিল—সব কিছু স্বীকার করে দণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া। বারীন স্বীকারোক্তি করলেও কোন সময়েই তিনি বাঁচাতে চান নি নিজেকে। বরং ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের ভয় না করে সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। হ্যাঁ, আমিই করেছি। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে আমিই পাঠিয়েছিলাম মজঃফরপুরে।

'নরেন গোঁসাইয়ের অপরাধ স্বীকার আর বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে দেখা যায় যে, বারীন্দ্র মরণভীরু জাতিকে মরিতে শিখাইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, আর নরেন গোঁসাই সবসুদ্ধ দলটিকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।' [শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ : গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী : পৃ—৭৩৫-৩৬]

অপরপক্ষে বারীন ঘোষের সেদিনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রখ্যাত বিপ্লবী

নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'নরেন গোঁসাইয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, কিন্তু বারীনবাবুর অপরাধও সামান্য নয়। বিপ্লবীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন বারীনবাবু। গুপ্ত সমিতির কথা কোন অজুহাতেই শত্রুর কাছে প্রকাশিত হবে না—এই যে টেক্‌নিক; তা মানলেন না বারীনবাবু। অহিংসার যা টেক্‌নিক, সশস্ত্র-বিপ্লবের তা নয়।

অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র বিপ্লবের টেক্‌নিক মেনে সকল অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কারণ, তাঁরা 'বিপ্লবী'। বারীনবাবুরা অপরাধ স্বীকার করে এবং নেতার নির্দেশে সে স্বীকৃতি জজের কাছে প্রত্যাহার (retract) না করে তাই বিপ্লব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন। আত্মপ্রসারী ব্যক্তিত্বের এই অহংসৌধে বসে বারীন্দ্রকুমার যে ভুল করলেন তা মারাত্মক। ।

কিন্তু তবু বাংলার বিপ্লবীকুল চিরদিন বারীনবাবুকে ক্ষমা করে এসেছেন, শ্রদ্ধাও করেছেন। কারণ, তাঁরা ভুলতে পারেন না যে, বারীন্দ্রকুমার বীর; বারীন্দ্রকুমার বিপ্লব-কর্মের 'পাইওনিয়ার'। তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, সে অন্যায়ের দণ্ড তিনি মাথায় তুলে নিতেও ভয় পান নি। আন্দামানের দীর্ঘ কারাযন্ত্রণায় তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ধুয়ে-মুছে গেছে বিপ্লবীর কাছে। তাঁর 'অতীত' বিপ্লবীর বরণীয়, তাঁর 'বর্তমান' বিপ্লবীর বর্জনীয়।

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃ—৮৭-৯০]

এবার ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব মল্লিকা।

প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিল, তারপর বার্লো, সব শেষে সেসন জজ মিঃ বীচক্রফট্-এর আদালতে শুরু হল আসল মামলা। বীচক্রফট্-এর সঙ্গে অ্যাসেসার হিসেবে রইলেন আরো দুজন। এরা হলেন গুরুদাস বসু; আর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আসামীর সংখ্যা আগে ছিল আটত্রিশ। দুজন কমে দাঁড়িয়েছে ছত্রিশে। নরেন গোঁসাই নিহত। তাছাড়া অশোক নন্দী ইতিমধ্যেই পরলোকগমন করেছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

আইনজীবী হিসেবে সরকার পক্ষে রয়েছেন ব্যারিস্টার আর্ডলি নর্টন। সেই সঙ্গে বার্টন ও উইথহল। তাছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটর আশু বিশ্বাস এবং গোয়েন্দা বিভাগের জাঁদরেল অফিসার শামসুল আলম তো আছেই।

আসামী পক্ষে রইলেন ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, তখনকার দিনেই যার পারিশ্রমিক ছিল দৈনিক হাজার টাকা। তাছাড়া আরো সাতজন ব্যারিস্টার এবং নয়জন উকিল।

১৯শে অক্টোবর, ১৯০৮ সাল। শুরু হল বিচার।

বিচারকের আসনে বসে ম্যাজিস্ট্রেট সি. পি. বীচ্‌ক্রফট্‌। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দ এবং অন্যান্য পঁয়ত্রিশজন।

অদৃষ্টের কি পরিহাস! এককালে এই বীচ্‌ক্রফট্‌ ছিলেন অরবিন্দেরই সহপাঠী। আই. সি. এস. পরীক্ষায় অরবিন্দের স্থান ছিল বীচ্‌ক্রফট্‌-এর চাইতে অনেক উঁচুতে। অথচ শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সেই বীচ্‌ক্রফট্‌ই আজ অরবিন্দের বিচারক। আর অরবিন্দ হলেন তাঁরই আদালতে বিচারাধীন একজন আসামী মাত্র।

ঘুম নেই পাবলিক প্রসিকিউটর আশু বিশ্বাস আর গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা শামসুল আলমের চোখে। সব ক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। এমনভাবে নথিপত্র সাজাতে হবে, যাতে কেউ রেহাই না পায়। সব চাইতে ডেঞ্জারাস হল পালের গোদা ঐ অরবিন্দ। কলম দিয়ে যেন আগুন ঝরে ও'র। 'ইন্দু প্রকাশ' থেকে শুরু করে 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম' ইত্যাদি পত্রিকায় কি আগুনটাই না ও ছড়িয়েছে মহামান্য সরকারের বিরুদ্ধে। সবার আগে ওকেই ঝোলাতে হবে ফাঁসির দড়িতে।

অরবিন্দ নিরাসক্ত, নির্বিকার। দেখে মনে হয়, এ যেন আগেকার সেই অরবিন্দ নয়। আমূল পরিবর্তিত এক ভিন্ন সত্তা। নতুন পৃথিবীতে এ যেন সদ্যোজাত এক অরবিন্দ। নবজন্ম হয়েছে তাঁর।

সরকার পক্ষে প্রথমেই সাক্ষী দিলেন সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। তারপর একে একে ফেরিজোনী, সতীশ ব্যানার্জী, বিনোদ গুপ্ত, রিচার্ড ক্রেগান প্রমুখ দুশো ছয়জন। বক্তব্য সবারই এক। এরা সন্ত্রাসবাদী। মহামান্য সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেশটাকে এরা ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছিল জাহান্নামের পথে।

বন্দীরা নির্বিকার। বিশেষ করে অগ্নিযুগের রোম্যান্টিক নায়ক উল্লাসকর দত্তর তো কথাই নেই। অদৃষ্টে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর যাই থাক না কেন, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তাঁর। বিচারক বীচ্‌ক্রফট্‌-এর ভুঁড়িটা কত ইঞ্চি মোটা হতে পারে, তাই নিয়ে তিনি তখন রীতিমত গবেষণারত।

বিপ্লব কখনো থেমে থাকে না। এগিয়ে চলাই তার সহজাত ধর্ম। তাই অরবিন্দ থেকে শুরু করে দলের প্রায় সবাই বন্দী হলেও ইতিমধ্যেই আবার একদল মৃত্যুভয়হীন তরুণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ভেতরে ভেতরে। সংকল্প তাদের একটাই। তোমরা আমাদের ছাড়ো নি, আমরাও সহজে ছেড়ে দেব না তোমাদের।

শপথ তাদের মিথ্যে নয় মল্লিকা। তাই নভেম্বর মাসেই ছোটলাট ফ্রেজারকে লক্ষ্য করে আবার আগুন ছুটল ওভারটুন (Y.M.C.A.) হলে। কিন্তু

না, হল না। এবারও ছোটলাট ফ্রেজার ফসকে গেলেন আগেকার মত। বিচারে ঘটনাস্থলে ধৃত জিতেন রায় চৌধুরীকে দেওয়া হল দশ বছরের কঠোর কারাদণ্ড।

এখানেই কি শেষ। অসম্ভব। ইতিমধ্যেই তালিকায় আরো দুজনের নাম লেখা হয়ে গেছে রক্তের অক্ষরে। তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে হবে না।

মামলা গড়িয়ে চলল দিনের পর দিন।

আসামী পক্ষের তখন সবচাইতে বড় সমস্যা হল—টাকা। মামলা চালাতে হলে বিস্তর টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা?

বাধ্য হয়েই ভগ্নি সরোজিনী দেবী আবেদন জানালেন দেশবাসীর কাছে। অরবিন্দ দেশের গৌরব। দেশবাসীই তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

পাওয়া গেল তেইশ হাজার টাকা। তখনকার দিনের হিসেবে খুব একটা কম নয়। কিন্তু এতগুলো আইনজীবী—বিশেষ করে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বিরাট চাহিদার কাছে এ আর ক'দিন!

ভাবনায় পড়ে গেলেন অরবিন্দের মেসোমশাই সেই 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। টাকা না পেলে ওঁরা কেউ আর এ মামলা নিয়ে অগ্রসর হতে রাজী নন। কি করা যায় এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে!

সবচাইতে বড় ভাবনা তাঁর নিজের সম্বন্ধে। 'সঞ্জীবনী'র উপর ওদের আক্রোশ বহুদিনের। এবারের এই সুযোগ ওরা ছাড়বে বলে মনে হয় না। মনে হয় গ্রেপ্তার আসন্ন। তার আগেই যে মামলা পরিচালনা সম্বন্ধে একটা কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৃষ্ণকুমারের মুখ। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। চিত্তরঞ্জন। বন্ধুপুত্র চিত্তরঞ্জন দাস। যদিও বয়েসে সে একেবারেই তরুণ, আইন ব্যবসাও তাঁর বেশীদিনের নয়। তবু আদর্শবাদী চিত্তরঞ্জনের উপর এ ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা চলে।

সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কৃষ্ণকুমারের পুত্র সুকুমার মিত্র কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'আইনজীবীদের অনুপস্থিতি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। বিনা অর্থে কেহ এ মামলা চালাইবে না। অর্থ সংগ্রহ করাও কঠিন। আসামীদের অভিভাবকগণের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ নাই এবং এমন অবস্থা নহে যাহাতে কোনও প্রকারে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।

অনেক চিন্তার পর কৃষ্ণকুমার মিত্রের মনে পড়িল তাঁহার বন্ধুপুত্র চিত্তরঞ্জন দাসের কথা। চিত্তরঞ্জন তখন সবে বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়াছেন।

…এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন প্রাতে চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অরবিন্দের মামলার সমস্ত অবস্থা বলিলেন এবং চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করিলেন যে, যে সামান্য অর্থ আছে তাহা লইয়া তিনি যেন শেষ পর্যন্ত মামলা পরিচালনা করেন।

চিত্তরঞ্জন এই অনুরোধ শুনিবামাত্র এক কথায় অরবিন্দের মামলার ভার লইতে রাজী হইয়া গেলেন এবং পারিশ্রমিকের কথা ভুলেও ভাবিলেন না। নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণকুমার মিত্র বিদায় লইলেন। এই ঘটনার তিন চারদিন পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিন আইনে State Prisoner করিয়া বিনা বিচারে ১৯০৮ হইতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত আটক করিয়া রাখেন।'

[বিপ্লবী নিকেতন : দেশবন্ধু শতবার্ষিকী সংখ্যা]

কৃষ্ণকুমারের আশংকা অমূলক ছিল না। তাই ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শুধু তাঁকে নয়, সেই সঙ্গে আরো আটজন দেশবরেণ্য ব্যক্তিকে আটক করা হল বিনা বিচারে। এঁরা হলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিন দাস এবং ভুপেন দাস।

এদিকে মামলার গতি লক্ষ্য করে পাবলিক প্রসিকিউটর আশু বিশ্বাস এবং গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা সামশুল আলম তখন মহা খুশি। সব ক'টার ফাঁসি অনিবার্য। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি। এবার যাবে কোথায় ?

কিছুই চোখ এড়ায় নি বাইরে অবস্থিত তরুণবৃন্দের। বড্ড বাড় বেড়েছে সরকারের এই খয়ের খাঁ দুটোর। ঠিক আছে। সময় হোক, তখন দেখা যাবে।

সাক্ষী সাবুদ শেষ। এবার দুপক্ষের সওয়াল।

সরকার পক্ষে ১৯০৯ সালের ৫ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চ—একটানা পনেরো দিন ধরে সওয়াল করলেন ব্যারিস্টার আর্ডলি নর্টন। একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা গুরুতর অপরাধে অপরাধী এবং এদের প্রধান নেতা হল অরবিন্দ। সুতরাং চরম শাস্তিই ওঁদের একমাত্র প্রাপ্য।

অরবিন্দের নিজের ভাষায় :

'আর্ডলি নর্টন মাদ্রাজী সাহেব…একসময়ে তিনি জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, তার জন্যই বোধহয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত।

নর্টন সাহেব কখনও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কিনা বলিতে পারি না; তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন, সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু

বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোখে ধুলো দিয়ে সাক্ষীকে গরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়র ব্যারিস্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত।

…সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। সরকারের এই অর্থব্যয় যেন বৃথা না যায় নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন।

নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সাময়িক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

যেমন মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের প্লটের কল্পনাপ্রসূত কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী 'Bold bad man.' আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পিতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরেজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—'অরবিন্দ ঘোষ।'

তাঁহার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে, আমি ধরা না পড়িলে দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য বোধহয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।"

নর্টনের পরে চিত্তরঞ্জন। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী হিসেবে অরবিন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে সেদিন তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইতিহাসে সোনার অক্ষরে তা লেখা থাকবে চিরকাল।

'আপনারা মনে করবেন না যে, আজকের এই আদালতেই এ মামলার শেষ। মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এ মামলার শুনানী চলবে চিরকাল।

একদিক যখন আপনাদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না, আজ যিনি আসামী হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন; তিনিও পৃথিবী থেকে চলে যাবেন; সেদিন সেই অনাগত যুগের মানুষ এই অরবিন্দকেই স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে সেদিন পুষ্পাঞ্জলি।

আজ যে বাণী প্রচারের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।'

সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বোমার মামলার অন্যতম বন্দী পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত কি বলেছেন শোন :

শেষ দিনের কথা। আমরা সকলে রোজ দিনের মতই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করে বসেছি। এমন সময় হঠাৎ কোর্টকক্ষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে চড়তে লাগল। আমরা সব দাঁড়িয়ে গেলাম। উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ, নির্বাক, নিষ্কম্প। শুনলাম চিত্তরঞ্জন দেবাবিষ্ট হয়ে যেন বলে চলেছেন :

'He stands not only before the bar in this court but stands before the bar of the High Court of History...Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and reechoed not only in India but across distant seas and lands.'

রায় দেওয়া হল ১৯০৯ সালের ৬ই মে।

স্বীকারোক্তি করা সত্ত্বেও বারীন ঘোষ ও বোমা বিশেষজ্ঞ উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন ব্যানার্জী, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দুভূষণ রায়কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

তাছাড়া পরেশ মৌলিক, নিরাপদ রায় ও শিশির ঘোষের দশ বছর কারাদণ্ড। পনেরো ঘা বেত খাওয়া ছেলে সুশীল সেন সাত বছর। কৃষ্ণজীবন সান্যাল এক বছর। বাকী সবাই মুক্ত।

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, তবে তখন তিনি আর শুধু বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ নন, কারাজীবনের নির্জন অবকাশে ইতিমধ্যেই কখন বিপ্লবী অরবিন্দের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ,—নাম তাঁর ঋষি অরবিন্দ।

রায় দিতে গিয়ে অরবিন্দ সম্বন্ধে বিচারপতি বিচক্রফট্ মন্তব্য করলেন :

'Taking all the evidence together I am of opinion that it falls short of such proof as would justify me in finding him guilty of so serious a charge'.

অর্থাৎ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার মত কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

রায়দান শেষ।

সহসা এক অপূর্ব সংগীতলহরী ছড়িয়ে পড়ল কোর্ট ঘরের সর্বত্র—'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে'।

গোটা আদালতগৃহ নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। কে গান গাইছে এমন মনপ্রাণ ঢেলে! কে আবার! উল্লাসকর ছাড়া এত উল্লাস কার আর হতে পারে!

বিচারপতি বীচক্রফট্ বিস্মিত, নির্বাক। তিনিও গান শুনতে লাগলেন অবাক হয়ে। একবারও তাঁর মনে হল না যে, আদালতগৃহে গান গাওয়াটা বেআইনী কাজ। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী যে এমন তন্ময় হয়ে গান গাইতে পারে, একথা বুঝি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

চিত্তরঞ্জনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মুক্তি পেলেন অরবিন্দ। মুক্তি পেলেন আরো অনেকেই। পরের কাহিনী পণ্ডিচেরী আশ্রমের নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখনী থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'বের হলাম জেল থেকে, পুরো এক বৎসর পরে। এখন কোথায় যাই? কোথায় গিয়ে উঠি? ঘর-বাড়ি? বহু দূরে। চিত্তরঞ্জন জানালেন—আমরা যারা খালাস পেলাম, সবাই যেন—বারো-তেরোজন হবে—তাঁর অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠি।

গাড়িতে উঠে চললাম। বাইরে মুক্ত হাওয়া বন্ধ প্রাচীরের পরিবর্তে। বড় মিষ্টি মধুর লাগল। প্রায় বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্বাধীনতা এসে গিয়েছে। যেমন তেমন হাত-পা ছুঁড়তে পারি। ঘুরতে ফিরতে পারি। যথা-তথা যেতে পারি। মুক্তির, স্বাধীনতার জাগ্রত জীবন্ত স্পর্শ পেলাম যেন। এ এক নূতন জীবন।

...চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পুকুরে নেমে স্নান করলাম। তারপর বসলাম খেতে একফালি বারান্দায়। সব এক লাইনে বসে, শ্রীঅরবিন্দ সহ। বোধ হয় বাসন্তীদেবী নিজে পরিবেশন করছিলেন। আহার্য বিতরণ নয়, এ হল সেবা। সমাদের পুজা, দেশসেবীদের জন্য।

কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করে ফেলেছিলাম। সামনে থালা রয়েছে। আমি করেছি কি—থালাখানা বাঁ হাতে চেপে ধরে তবে ডান হাতে খেতে শুরু করেছি। পরিবেশনকারিণী বলে উঠলেন—ও কি! বাঁ হাতে থালা ধরেছ!

খেয়াল হল আমার। জেলের অভ্যাসের ফল এটি। জেলে যে সানকিতে ভাত দেওয়া হত, তার তলা সমান নয়, বাঁকানো। তাই ডান হাত দিয়ে খাবার তুলতে গেলে সানকিটা ঘুরতে থাকে। বাধ্য হয়ে তাই বাঁ হাতে চেপে ধরে দক্ষিণ হস্ত চালনা করা যায়।

তারপর সকলেরই নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরবার পালা। চিত্তরঞ্জন

সকলকে দিলেন একখানা করে নূতন ধুতি, চটি জুতো আর গেঞ্জী বা উড়ুনি হবে। পুরো ব্রাহ্মণ বিদায় হল। কাপড়-জামা কারো তো তেমন কিছু ছিল না। এ শুধু অনুকম্পা নয়, সত্যিকারের দরদ এবং দরদের সঙ্গে শ্রদ্ধা।"

[বিপ্লবী নিকেতন : দেশবন্ধু শতবার্ষিকী সংখ্যা]

অভিনন্দন জানালেন ভগিনী নিবেদিতা। চিত্তরঞ্জনের কোটের বোতামঘরে একটি লাল গোলাপ গুঁজে দিতে দিতে স্মিত হাস্যে তিনি বললেন—'I know you to be great, but I do not know you are so great.'—আমি জানতাম, তুমি বড়,—কিন্তু জানতাম না যে তুমি এত বড়।

ওদিকে তখন হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স ও বিচারপতি মিঃ কার্ণডাফের এজলাসে তার শুনানী শুরু হল ৯ই আগস্ট থেকে। চলল সাত-চল্লিশ দিন ধরে।

অবশেষে রায়দান। রায়ে অবশ্য কিছুটা হেরফের হল। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকরকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হেমচন্দ্র কানুনগো ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাই। অন্যান্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের সাজা কমিয়ে করা হল দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আর ইন্দ্রনাথ নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে, সুশীল সেন ও কৃষ্ণজীবন সান্যালকে দেওয়া হল মুক্তির আদেশ।

রায় দিতে গিয়ে বিচারপতিদ্বয় মন্তব্য করলেন :

'The question of punishment is one of considerable difficulty ; those who have been convicted are not ordinary criminals, they are for the most part men of education of strong religious instincts and in some cases of considerable force of character.

At the same time they have been convicted of one of the most serious offence against the state in that they have conspired to wage war against the king and the punishment must be in proportion to the gravity of the offence.'

অর্থাৎ—এ মামলার আসামীদের শাস্তির ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা একটু কষ্টকর। কারণ, আসামীরা সাধারণ আসামী নয়। তারা শিক্ষিত, ভগবানে বিশ্বাসী ও চরিত্রবান। অপরপক্ষে তারা সবাই রাষ্ট্র ও সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অপরাধী। তাই সর্বদিক বিবেচনা করে তাদের এই শাস্তি দেওয়া হল।

এ অধ্যায়ের উপসংহার টানবার আগে একটা কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন মল্লিকা। বিপ্লবীদের ভাগ্যে ফাঁসি, দ্বীপান্তর বা মামলা নতুন কিছু নয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা, আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—এমনি অনেক বড় বড় মামলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার মত অন্য কোন মামলাই বোধ করি এতখানি গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি অগ্নিযুগের ইতিহাসে। প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা এবং চিন্তানায়ক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় কি ভাবে এ অধ্যায়টির মূল্যায়ন করেছেন দেখা যাক।

'অরবিন্দের মামলা এবং মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দুটি কারণে। প্রথমত, এর প্রধান আসামী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী নেতা এবং ভাবীকালের পৃথিবীর সর্ববরেণ্য 'সুপারম্যান' শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে অথচ প্রভূত ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তৎকালের তরুণ ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাস, অর্থাৎ ভাবীকালের সর্বোত্তম আইনজীবীদের অন্যতম ও ভারতীয় জননেতাদের অগ্রগণ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

আলিপুর মামলা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী ইতিহাসের একখানি নিগূঢ় সংকেত। এখানে অফুরন্ত 'দেশপ্রেম' নবীন কৌঁসুলির রূপ ধারণ করে নিগৃহীত 'দেশপ্রেম'কে দম্ভ ও সর্বগ্রাসী পাশবিক শক্তির আক্রমণ থেকে প্রাণ ঢেলে প্রাণদান করেছে। যে মহান বিপ্লবী কারাকক্ষে 'বাসুদেব দর্শন' লাভ করে এবং পণ্ডিচেরিতে ঋষি ও ভগবৎদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদান করে বারে বারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নমস্কার' পেয়েছিলেন, তাঁরই বিরাট স্বরূপ চিত্তরঞ্জন তাঁর বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি আলিপুর মামলাটিকে একখানি অনন্য তপস্যার গৌরবে গ্রহণ করে জয়মাল্য লাভ করতে পেরেছিলেন।

এই মামলাকে ঘিরে যে স্বদেশপ্রেম ও কর্মসাধনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তার দৃশ্য ও অদৃশ্য তরঙ্গদোলা দোল দিতে থাকল ভারতবর্ষের সংগ্রামী মনকে ভাবীকাল পর্যন্ত।"

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃঃ—৮১-৮২]

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি'।
—রবীন্দ্রনাথ

আলিপুরে বোমার মামলা শেষ হল, তাবলে 'অরবিন্দ পর্ব' কিন্তু এখানেই শেষ হল না মল্লিকা। কি করে হবে! বিপ্লবী শপথ তো একালের জনপ্রিয় নেতাদের মত ফাঁকা আওয়াজ নয়। তালিকায় একবার যার নাম উঠে গেছে, মাশুল যে তাকে দিতেই হবে।

প্রথম টার্গেট সেই অতি উৎসাহী পাবলিক প্রসিকিউটর আশু বিশ্বাস।

'কি করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কি করে সরকারী সাক্ষী তৈরের করা যায়, কি করে মিথ্যা মামলাকে সত্য করে বানিয়ে তরুণ-বাঙলার সাহসীদের শাস্তি দেওয়া চলে—এসব চিন্তায় ও কর্মসাধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সরকারের এতবড় একটি খয়ের খাঁ সুহৃদ সে যুগেও অধিক ছিল না।" [ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃঃ ১০০]

এত করেও কিন্তু আলিপুরে বোমার মামলার ফলাফল নিজের চোখে দেখে যেতে পারেন নি সরকারী উকিল আশু বিশ্বাস। তার আগেই একদিন তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছিল তরুণ এক বিপ্লবীর অব্যর্থ গুলিতে।

তারিখটা ছিল ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

স্থান—কলকাতা সুর্বাবন পুলিশের আদালত। কাজ শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসছেন আশু বিশ্বাস। হঠাৎ রিভলবার গর্জে উঠল দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।

আততায়ী চারু বসু ধরা পড়লেন ঘটনাস্থলেই। কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে পুলিশ অবাক। আসামীর ডান হাতটা যে একেবারেই পঙ্গু। তাই রিভলবারটাকে সে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে ডান হাতের তালুতে। তারপর যা কিছু করেছে সবই বাঁ হাতে। রিভলবারের ট্রিগারও টেনেছে ঐ বাঁ হাত দিয়েই। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

সত্যিই অদ্ভুত ছেলে ছিলেন খুলনার শোভনা গ্রামের কেশব বসুর ছেলে এই চারু বসু। নামমাত্র মাইনের কাজ করতেন হিতৈষী প্রেসে। থাকতেন বস্তীর একটা খোলার ঘরে মাসিক আট আনা ভাড়া দিয়ে। এই ভয়াবহ কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে থেকেও একটা মাত্র হাত সম্বল করে তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাসের আদালতে শুরু হল মামলা। আসামী চারু বসু একা। তাঁর পক্ষে কোন উকিল নেই।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি। জানতে চাইলেন মহামান্য আদালত।

—না, কোন দরকার নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।

'No sessions, trial, but hang me tomorrow. It was all preodained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall

be hanged. I killed him as he was an enemy of the country.'

সেসন চাই নে। কালই আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। এটা ভবিতব্য যে, আশুবাবু আমার গুলিতে মরবেন এবং আমি ফাঁসিতে ঝুলব। দেশের শত্রু বলেই আমি তাকে হত্যা করেছি।

তাই হল। সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টও সে দণ্ড বহাল রাখলেন যথারীতি।

এবার ছোটলাটের দরবারে আপীল। কত অনুরোধ, কত মিনতি, কিন্তু বেঁকে বসলেন চারু বসু নিজেই। তার এককথা—'No appeal. Hang me tomorrow.'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। ১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হল আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে। তখনো বোমার মামলা যথারীতি চলছে আলিপুর আদালতে।

ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ চারু বসুকে আজো কোনরকম স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি আমাদের এই স্বাধীন দেশে। তা বলে 'সরকারী শহীদ' আশু বিশ্বাসের বেলায় কিন্তু ভুল হয় নি যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে। তার নামে আজও একটি রাস্তা সগৌরবে বিরাজ করছে ভবানীপুর অঞ্চলে। আমাদের পূর্তমন্ত্রী কি বলেন এ সম্বন্ধে। অবশ্য চারু বসুর নামটা তাঁর জানা আছে কিনা সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা মুস্কিল।

শুধু আশু বিশ্বাস নয়, সেদিন মোট দুটি লোকের নাম উঠেছিল বিপ্লবীদের কালো তালিকায়। একজন আশু বিশ্বাস; অন্যজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা সামশুল আলম।

আশু বিশ্বাস শেষ। এবারের টার্গেট সামশুল আলম। যে ভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, এবার তাকে চাইই।

খুবই কৃতী পুরুষ সন্দেহ নেই। এসব কৃতী পুরুষরা ছিলেন বলেই তো দুশো বছর রাজত্ব করা সম্ভব হয়েছিল পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজের পক্ষে। কৃতিত্বের বহরটা বরং একটু শোনা যাক।

'আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বিরের ভার ছিল সামশুল আলমের উপর। সরকারী কৌঁসুলি মিঃ নর্টনের তিনি ছিলেন দক্ষিণ হস্ত। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আলমকে ব্রিটিশ সরকার চোখের মণি করে রেখে-ছিলেন। মামলা সাজানো, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো, রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁরা কাঁচ ও কাঁচা, তাঁদের দুর্বলতা খুঁজে-পেতে বের করে তা মামলার সুবিধার্থে প্রয়োগ করা, গড়ে-

পিটে 'রাজসাক্ষী' রূপে কাউকে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন। সামশুল আলম মানে, আলিপুর মামলার একটি জীবন্ত নথিপত্র। তার অভাব মানে, মামলার খুঁড়িয়ে চলা।"

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃঃ—১০২-১০৩]

সুতরাং আর রেহাই দেওয়া চলে না এহেন কৃতী পুরুষটিকে। অবশ্য ইতিপূর্বেই তাকে দু-দুবার টার্গেট করা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু প্রতি বারই সে ফসকে গেছে কপাল জোরে। এবার জান কবুল। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারীর অপরাহ্ন বেলায়।

হাইকোর্টের বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত থেকে বেরিয়ে সামশুল আলম তখন নিচে নামতে শুরু করেছেন সিঁড়ি বেয়ে। আর কয়েক ধাপ মাত্র বাকি। হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজ—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে সামশুল আলম লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির উপর। তারপর গড়িয়ে একেবারে মাটিতে।

নিমেষে হৈ চৈ পড়ে গেল গোটা হাইকোর্ট জুড়ে। ছুটে এলেন বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ কেনরিক এবং ছোট বড় আরো অনেকেই। ঐ যে পালাচ্ছে। শীগগির ধরো ওকে। জলদি।

ভরসা পেয়ে প্রথমেই ছুটে এল অস্ত্রধারী পুলিশ ধুরা সিং। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হল—দ্রাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ধুরা সিং বেপাত্তা। কে যাবে জেনেশুনে বেঘোরে প্রাণটা দিতে।

এবার দুদিক থেকে আক্রমণ চালাল হাইকোর্টের দুই চাপরাশি রামঅধীন সিং আর রামজানি সিং। এদিকে রিভলবারের গুলি তখন শেষ। ফলে আততায়ী বীরেন দত্তগুপ্তকে কাবু করা খুব একটা কষ্ট হল না ওদের দুজনের পক্ষে।

কাণ্ড দেখে শাসক সম্প্রদায় স্তম্ভিত। আশু বিশ্বাস আগেই গেছে। অবশেষে একান্ত প্রিয়পাত্র খানসাহেবকেও কিনা হারাতে হল এমন করে! তাও কিনা খোদ হাইকোর্ট ভবনে। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার।

পাঁচদিন বাদে—২৯শে জানুয়ারী আবার আগুন ঝরল শ্রীঅরবিন্দের কলম থেকে। সেদিন 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবেই তিনি লিখলেন :

'Boldest of the many bold acts of violence. They (the revolutionaries) prefer public places and crowded buildings-Nasik-London-Calcutta-Goswami in Jail—these are remarkable features.'

বহু দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক ঘটনার চাইতেও অনেক বেশী দুঃসাহসিক হল

এবারের ঘটনা। মনে হয়, জনবহুল স্থান এবং প্রাসাদগুলোতে আঘাত হানতেই যেন বিপ্লবীরা বেশী পছন্দ করেন। তাই তো দেখা যায় যে, নাসিকের প্রেক্ষাগৃহ, লণ্ডনের সভাস্থল, কলকাতার হাইকোর্ট ও'দের মনোমত লক্ষ্যস্থল। জেলখানায় গোস্বামী হত্যা—এটাও একটা লক্ষ্যণীয় দিক।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর আদালতে শুরু হল বিচার। তারপর সেই একই ব্যাপার। উকিল নেই কেন? উকিল রাখতে চাও কি?

—না, ধন্যবাদ। জবাব দিলেন বীরেন দত্তগুপ্ত; ও কাজটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব। জেরা যা করবার আমিই করব। ডাকুন আপনার সাক্ষীদের।

প্রথমেই সাক্ষী দিতে এল সেই চাপরাশি রামঅধীন সিং। সারা মুখ তার বিবর্ণ। রক্তশূন্য।

—আমার দিকে তাকাও। জেরা শুরু করলেন বীরেন দত্তগুপ্ত।

করুণ দৃষ্টিতে সাক্ষী তাকিয়ে রইল বিচারপতি সুইনহোর মুখের দিকে। যেন শুনতেই পায় নি সে কথাটা।

—কি ব্যাপার! ধমকে উঠলেন বীরেন, তাকাও বলছি আমার দিকে।

—জি নেহি।

কোনরকমে কথাটা বলেই সহসা ভেউ ভউ করে কেঁদে উঠলো রামঅধীন সিং। এসব স্বদেশী বাবুদের বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় ওরা মন্ত্রটন্ত্র জানে। এই তো সেদিন মন্ত্রবলে বাইরে থেকে রিভলবার এনে জেলের ভেতরে কি কাণ্ডটাই না ওরা করলে। এরপর চোখের দিকে তাকাতে গেলে যে পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে হবে না তা কে বলতে পারে!

পরবর্তী সাক্ষী হাইকোর্টের সেই অস্ত্রধারী বীর ধুরা সিং। বেশ বীরের মতই সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়া। বুক টান করে। হাইকোর্টকা আদমী কিনা!

—আমার দিকে তাকাও। একই নির্দেশ দিলেন বীরেন।

—নেহি। বিচারপতির চোখে চোখ রেখে বীরের মতই জবাব দিলেন ধুরা সিং।

—তোমাকে আমার দিকে তাকাতেই হবে।

—কভি নেহি। যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা।

—আসামীর দিকে তাকাও। এবার নির্দেশ দিলেন স্বয়ং বিচারপতি সুইনহো।

—জী! নিমেষে চুপসে গেল ধুরা সিং। সারা মুখে তার সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ।

—আমি আদেশ করছি, তুমি আসামীর মুখের দিকে তাকাও।

—মর্ যায়েগা হুজুর। বাল-বাচ্চা লেকে একদম মর্ যায়েগা।

কোন রকমে কথাটা উচ্চারণ করেই হঠাৎ দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ধরা সিং। আর কোন রকমেই সেদিন সাক্ষী দেওয়া সম্ভব হল না তার পক্ষে।

কাণ্ড দেখে হা-হা করে হেসে উঠলেন বীরেন। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণ খোলা হাসি। সে হাসিতে কোন খাদ নেই।

এবার মামলা স্থানান্তরিত হল প্রত্যক্ষদর্শী বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের আদালতে। উপযাচক হয়েই তিনি প্রখ্যাত আইনজীবী নিশীথ সেনকে অনুরোধ জানালেন আসামীর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য, কিন্তু বাধ সাধলেন বীরেন নিজেই। কি হবে আইনজীবী দিয়ে? যা হবার সে তো হবেই।

তাই হল। সাজা দেওয়া হল—প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী করা হল ১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

মল্লিকা, এই সেই বীরেন দত্তগুপ্ত, যাকে তুমি কানাইলালের শবদাহের দিন দেখেছিলে কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বন্ধু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'সেই দিন হইতে বীরেনের সহিত আমার কদাচিৎ কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং যাহা হইয়াছে তাহাও স্বল্প সময়ের জন্য। সে যেন হঠাৎ চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল।

সামশুল আলমের হত্যার পূর্বদিন রাত্রি ৮টার সময় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর প্রায় ১টার সময় আমাকে আলিঙ্গন করিয়া 'বিদায় বন্ধু' বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বুঝি নাই, এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

তাহার এই অদ্ভুত আচরণের মধ্যে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও তখন মনে করিয়াছিলাম, হয়ত কোন এক গুরুতর কার্যে যাইতেছে। মন্ত্রগুপ্তির কঠোর বিধানে তাহারও কিছু বলা নিষেধ ছিল এবং আমারও কিছু জিজ্ঞাসা করা সমানভাবেই নিষেধ ছিল।

দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহার সহিত কত কথাই না হইল। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম, স্বাধীন ভারত দেখিবার সাধ, জন্মান্তরে তাহা সম্ভব কিনা—এই প্রকার কত কথাই সে বলিল। তখন বুঝি নাই, পরের দিনই সে এক দুঃসাহসিক কার্য করিয়া জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া অমর ধামে চলিয়া যাইবে।

...বীরেন আমার সহপাঠী ছিল। কলিকাতাতেই বীরেনের সহিত আমার পরিচয় এবং উহা ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হয়। বীরেনের বাড়ি বিক্রমপুরের

ছিল। প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি, দেশের কাজ করিবার জন্য তাহার আকুল আগ্রহ।

সেই সময় আমরা দুইজনে সমিতিতে গিয়া ব্যায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিতাম। প্রত্যহ নির্জন স্থানে বসিয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেশ স্বাধীন করিবার গল্পে ও স্বপ্নে তন্ময় হইয়া থাকিতাম। বহু বিষয়েই আলাপ হইত।

সম্মুখে মুরারি পুকুর বাগানের আদর্শ, আর কানাইলাল দত্তের মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে দাহ করিবার পূর্বে বিরাট শবযাত্রায় যে উন্মাদনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বীরেনের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। দেশের কাজে আত্মাহুতি দিবার জন্য সে প্রায়ই অস্থিরতা দেখাইত।

প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া কানাইলালের চিতাভস্ম একবার করিয়া মাথায় ঠেকাইত। ভস্ম তাহার বালিশের নিচে থাকিত। বীরেন খুব শান্ত ও ধীর প্রকৃতির ছিল। কাজেই এই উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী চঞ্চলতার জন্য নয়—তাহা বুঝিয়াছিলাম। স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে সার্থক করিতে হইলে সংঘবদ্ধ চেষ্টা ও চরম ত্যাগের প্রয়োজন, তাহা সে ভালভাবেই বুঝিত।"

[সে যুগের আগ্নেয় পথ : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী : পৃঃ—৩৯-৪২]

সামশুল আলম নিহত হয়েছিলেন ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী।

কাণ্ড দেখে শাসক সম্প্রদায় তখন দিশেহারা। বারীন, উল্লাসকর, উপেন, হেমচন্দ্র প্রমুখ দস্যি ছেলেগুলো সবাইতো এখন ঘানি টানছে সুদূর আন্দামানে। তাহলে এরা কারা? কেন একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে এই বাংলা দেশে?

কাণ্ড দেখে সরকার বাহাদুর চিন্তিত। এত চেষ্টা করেও আশু বিশ্বাস ও সামশুল আলমকে বাঁচানো গেল না। কে সেই লোক, যার নির্দেশে মাঝে মাঝেই আগুন ঝলসে উঠছে এখানে ওখানে? কে এসব কাণ্ডের প্রধান হোতা?

নাম তাঁর যতীন মুখার্জী, তোমরা যাকে জানো বাঘা যতীন বলে। তাঁর বিরাট কর্মকীর্তির কাহিনী তোমাকে আমি শোনাব আরো পরে।

বীরেন দত্তগুপ্ত ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন ১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। তবু 'অরবিন্দপর্ব" শেষ হল না। কারণ সুশীল সেন। কি হল সেই পনেরো ঘা বেত খাওয়া সুশীল সেনের?

বোধ হয় জান, তখনকার দিনের বিপ্লবীদের মাঝে মাঝেই রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে হত বাধ্য হয়ে। কাজটা সুখের নয়। কিন্তু উপায় কি। বিদেশী শাসক যুগ যুগ ধরে নিরস্ত্র করে রেখেছে ভারত-বাসীকে। অথচ বিপ্লবের প্রয়োজনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হলে

প্রচুর অর্থের দরকার।

আর শুধু কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপার। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'সিডিসান কমিটির' রিপোর্টে দেখা যায়—পূর্ববঙ্গে একমাত্র অনুশীলন সমিতির শাখা-প্রশাখাই তখন ছিল পাঁচ শত। দেশের ডাকে শত শত ছেলে চিরদিনের মত ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে এসেছে সমিতির আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে। কি করে সমিতি এত ছেলের দায়িত্ব বহন করবে? আহার্যই বা জুটবে কোথা থেকে? একমাত্র ভরসা, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মুষ্টিভিক্ষা। কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে তো আর অস্ত্র সংগ্রহ করা চলে না।

তাহলে কোথায় পাবে বিপ্লবীরা এই অর্থ? কেউ তো আর স্বেচ্ছায় টাকা তুলে দেবে না তাদের হাতে। তাই এমনি করেই বিত্তবান লোকদের কাছ থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হতো বাধ্য হয়ে। কিন্তু সেখানেও সবাইকে একটা নীতি মেনে চলতে হতো কঠোরভাবে। অন্যথায় কঠোর শাস্তি। প্রতিজ্ঞা-পত্রটি ছিল এইরূপ:

'স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা ডাকাতি করিতে বাধ্য হই। ডাকাতি-লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত নেতার হাতে অর্পণ করিব। তিনি প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব।

যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দুর্বল ও দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার-কারী, যাহারা জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর এবং ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়িতেই ডাকাতি করিব। শপথ করিতেছি যে, আমরা ডাকাতি উপলক্ষ্যে কোন রমণী, শিশু দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কখনও কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।' [ভারতের বিপ্লব কাহিনী : ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত]

এমনি একটি রাজনৈতিক ডাকাতিতে সেদিন অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল সুশীল সেনকে। সেদিনের সেই বেদনাদায়ক কাহিনী বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতা স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখনী থেকেই তোমাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

'ইতিমধ্যে সুশীল সেন চলে গেছেন তাঁর গ্রামে। সিলেট জিলায় 'বানিয়াচঙ' হল তাঁর গ্রাম। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তারিখটি ছিল ১৯০৮ সালের ২৫ই মে। তাঁকে কলকাতায় আনা হল। তিনি অভিযুক্ত হলেন 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য়। নিম্ন আদালতে সাত বছরের সাজা হলেও হাইকোর্টে প্রমাণাভাবে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটে।

১৯১৫ সালে সুশীল সেনকে তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনে পুনরায় দেখা যায় অপর একটি বৈপ্লবিক কান্ডে জড়িত হতে। কয়েকটি সতীর্থ মিলে তাঁরা নদীয়া জেলার 'প্রাগপুরে' একটি অর্থ লুটের পরিকল্পনা নিয়ে যান।

৩০শে এপ্রিল এবং ২রা মে সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা একাধিক ডাকাতি করেন। তারপর এক সময় গ্রামের লোক ও পুলিশের লোকের তাড়া খেয়ে জলপথে পালাবার কালে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়।

নিজেদের গুলিতেই বিপ্লবীদের একজন আহত হন। রক্তে স্নান করে উঠলেন আহত যুবক। অতি ত্বরায় আহত যুবককে নৌকায় তুলে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে পালিয়ে যেতে লাগলেন। এই আহত যুবকই সুশীল সেন।

সুশীল ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বন্ধুদের বললেন : 'আমার মৃত্যু এসে গেছে। মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করা মাত্র তোমরা দেহ থেকে আমার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। মাথা কাদামাটির মধ্যে লুকিয়ে রেখো ; দেহটা ভাসিয়ে দিও জলে। নইলে মৃতের বোঝা নিয়ে সবাই ধরা পড়ে যাবে। বিপ্লবের কাজ ব্যাহত হবে।

মুহূর্ত পরে সুশীল ঢলে পড়লেন মৃত্যুর ক্রোড়ে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলা হল। দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল স্রোতের জলে। মাথা পুঁতে রাখা হল কাদামাটিতে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে। ভারতবর্ষের একটি বর্ণোজ্জ্বল অশান্ত বিপ্লবীর জীবনদীপ এই ভাবে নির্বাপিত হল।'

অরবিন্দ পর্বের উপর এখানেই আমি ইতি টানছি মল্লিকা। পরবর্তী-কালে যে অরবিন্দকে আমরা দেখেছি তিনি হলেন ঋষি অরবিন্দ। সঞ্জীবনী সম্পাদক-মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র স্বর্গীয় সুকুমার মিত্রের লেখনী থেকেই কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

"আমার পিতা নির্বাসন হইতে মুক্তি পাইয়া ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখ কলিকাতা পৌঁছান। কলেজ স্কোয়ারের গৃহে অরবিন্দকে দেখিয়া আনন্দিত হন।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে এক গুজব উঠিল যে, অরবিন্দকে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিবেন। একদিন প্রাতে রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, অরবিন্দকে পুনরায় এক মামলায় যুক্ত করা হইবে অথবা নির্বাসিত করা হইবে।

কোন দুশ্চিন্তা না করিয়া অরবিন্দ যথারীতি আহারাদি সমাপনান্তে তাঁহার শ্যামপুকুরের 'কর্মযোগীন' কার্যালয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্মস্থলের সম্মুখে গোয়েন্দা পুলিশ দল যথারীতি বসিয়াছিল, যেমন থাকিত

কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গোলদীঘিতে দিবারাত্রি অপর এক দল গোয়েন্দা।

ঐ দিন বৈকালে কর্মযোগীন অফিসের পিছনের দিকে দেওয়াল টপকাইয়া অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন শোভাবাজারের রাজগৃহের ভিতর দিয়া আহিরীটোলার গঙ্গা ঘাটে যাইয়া নৌকা ভাড়া করিয়া সারারাত্রি নৌকা বাহিয়া রাত্রি শেষে অন্ধকারের মধ্যে চন্দননগর পৌঁছিয়া ডুপ্লে কলেজের প্রফেসর চারু রায়ের নিকট আশ্রয় চাহিয়া লোক পাঠাইলেন।

প্রফেসর রায় মানিকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনিও বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি আশ্রয় দিতে পারিবেন না।

শেষ রাত্রে এই সংবাদ প্রবর্ত্তক আশ্রমের মতিলাল রায়ের নিকট পৌঁছিল। তিনি ঐ শেষরাত্রের অন্ধকারে গঙ্গাতীরের গভীর কাদা ভাঙিয়া খুঁজিয়া নৌকা বাহির করিলেন এবং অরবিন্দকে লইয়া তাঁহার গৃহে তক্তা রাখার ঘরে স্থান দিলেন। তাঁহার স্ত্রীকেও তিনি জানিতে দেন নাই যে, তিনি একজনকে গৃহে স্থান দিয়াছেন। অপর স্থান হইতে সকালে ও রাত্রে আহার্য আনিয়া দুইবেলা অরবিন্দকে খাইতে দিলেন। মতিলাল রায়ের সহিত এই প্রথম পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়।

একদিন মতিলাল রায়ের পত্নী তক্তা রাখার ঘর পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া গামছা পরিয়া ঝাঁটা হস্তে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন যে, একজন অজানা ব্যক্তি সেখানে বসিয়া আছেন, অমনি জিব কাটিয়া দ্রুত ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিপ্রহরে আহার্য লইয়া মতিলাল রায় ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেই অরবিন্দ উত্তেজিত হইয়া মতিলাল রায়কে বলিলেন "Moti, Moti, I have seen Kali." এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মতিলাল রায় আমাকে বলিলেন, "কি সরল মানুষ!"

এই স্থানে প্রায় একমাস তিনি ছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে আমরা যত না চিন্তিত হইয়াছিলাম, গোয়েন্দা পুলিশ তাহা অপেক্ষা অধিকতর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে খবর পাই যে তিনি চন্দননগর গিয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১০) অরবিন্দ আমাকে পেন্সিলে লেখা এক পত্র লোক মারফৎ পাঠাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল। "তুমি আমাকে ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠাইয়া দাও, ট্রেনে যাইব।" আমি উত্তর দিলাম "ট্রেনে যাইলে আধঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়িবে।" পরে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী রাজ্যে যাইতে চাহিলেন।

আমাদের গৃহের সম্মুখে গোল দীঘির এক প্রান্তে দিবারাত্রি আমাদের গৃহের উপর নজর রাখিতেছিল একদল গোয়েন্দা। ইহা দেখিয়া আমি তিনমাস বাড়ির বাহির হইলাম না। আমার বিশ্বস্ত দুই যুবক নগেন্দ্রকুমার গুহরায় এবং সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করিলাম। নিজে আর গৃহের বাহির হইলাম না। একজন কি করিতেছে তাহা অপরজন জানিল না। কখনও দুইজনকে একই সময় ডাকি নাই। দুইজনকে দুই রকম কার্যভার দিলাম।

সংবাদপত্রে পড়িলাম মার্সাই নামক একটি ফরাসী জাহাজ প্রিন্সেপঘাটে আসিয়াছে; উহা পণ্ডিচেরী, কলম্বো, গোয়া প্রভৃতি স্থানে যাইবে। অরবিন্দ ও তাহার সহযাত্রীর জন্য কলম্বোর দুইখানি টিকিট জাহাজ কোম্পানী হইতে না কিনিয়া সকল স্থানের টিকিট যাহারা বিক্রয়ের ব্যবসায় করে, তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম। অরবিন্দ ও সহযাত্রী যাইবেন পণ্ডিচেরী, কিন্তু পুলিশ যদি খোঁজ করে তবে কলম্বোতে তাঁহাদের খোঁজ করিবে, এদিকে উঁহারা পথে নামিয়া পড়িবেন।

টিকিট ব্যবসায়ী যাত্রীদের নাম ও ঠিকানা চাহিল। সত্য নাম ও ঠিকানা হওয়া চাই। সঞ্জীবনী পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা খুঁজিয়া ভুটানের সীমান্ত স্থানের এক চা বাগানের কর্মচারীর এবং ঐরূপ নাগাভূমির সীমান্তের এক কর্মচারীর নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল।

যদি পুলিশ খোঁজ করে তবে ঐ সীমান্তে হাঁটিয়া পোঁছাইতে চারি-পাঁচদিন সময় লাগিবে। ততদিনে ফরাসী জাহাজ আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়িবে। অর্থাৎ—কোন বিদেশী জাহাজ অন্য কোন দেশে যাইয়া যদি তথাকার যাত্রী বহন করে, তবে সেই জাহাজ সেই দেশের উপকূল হইতে তিন মাইল সমুদ্রে যদি অগ্রসর হয়, তবে ঐ জাহাজের যাত্রীগণ যে দেশের জাহাজ, সাময়িকভাবে সেই দেশের আইনের অধীন হইবে। সুতরাং ব্রিটিশ পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না এই আন্তর্জাতিক আইনে।

চন্দননগর হইতে তাঁহাদিগকে নৌকায় আনিয়া জাহাজে উঠাইয়া দেওয়া হইল, তাঁহাদের হস্তে কলম্বোর টিকিট দেওয়া হইল। জাহাজে তাঁহাদের জন্য দুই জনের উপযোগী কেবিন ভাড়া করা হইয়াছিল, যাহাতে অপর যাত্রীগণ তাঁহাদের দেখিতে না পায়। সেই উদ্দেশ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলা হইল,—উহারা স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্র যাত্রা করিতেছে এবং দুর্বল বলিয়া দুইবেলা আহার করিবার ঘরে যাইতে পারিবে না। তাহাদের আহার্য কেবিনে দিতে হইবে।

এদিকে নলিনী গুপ্ত এবং অপর একজনকে ইংরাজী পোষাক কিনিয়া এবং সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কিনিয়া পূর্বেই ট্রেনে পণ্ডিচেরী পাঠান হইল।

তথাকার বিখ্যাত কবি ভারতীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলাম, শ্রী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাইতেছেন, তাঁহার জন্য একটি বাসা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলে বাধিত হইব। তাঁহাকে জানিতাম না, তবে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে রাজদ্রোহ মামলায় তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছে। সেজন্য তাঁহার উপর বিশ্বাস হইল। এদিকে তিনি অরবিন্দের আগমন গোপন না রাখিয়া ব্যাণ্ডবাদ্য সহ মিছিল করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ৪ঠা এপ্রিল (১৯১০) পণ্ডিচেরীর জাহাজ ঘাটায় গেলেন।

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ প্রায় চল্লিশ বৎসর বাস করিয়াছেন, ইহার মধ্যে মাত্র একটি পত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহাও পৌঁছাইবার প্রথম অবস্থায়। এই পত্র পেন্‌সিলে লেখা, তাহাতে লেখা ছিল—"আমরা পাঁচজন, হাতে আছে আট আনা পয়সা।"

নানাস্থান ঘুরিয়া আমি কয়েক শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা ব্যাংক ড্রাফট্ কিনিয়া ব্যাংকের দ্বারা রেজিষ্ট্রি করিয়া প্রেরক হিসাবে ব্যাংকের নামে অরবিন্দকে পাঠাইয়া দিতাম। পূর্ববঙ্গের জমিদার প্রদত্ত টাকা কয়েকবার পাঠাইয়াছি। তাঁহার মারাঠী বন্ধুর টাকা পাঠাইয়াছি। তিনি আমাকে একটা ওকালতনামা দিয়াছিলেন আলিপুর জেল হইতে। তদ্বারা তাঁহার মানিকতলার বাগান বিক্রয় করিয়া তাঁহার অংশের মূল্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছি।

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে দীর্ঘকাল যোগ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। মানবজাতির উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর কল্পনা করিয়া সাধনা করিতেছিলেন। তিনি কেবল ভারতবর্ষকেই মুক্ত করিতে চাহেন নাই, একই সঙ্গে এশিয়ার মানুষের মুক্তি ও নবজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আমাদের আন্দোলন কেবল অর্থনৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক নহে—আমাদের আন্দোলন মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির আন্দোলন। [প্রবর্ত্তক : আশ্বিন : ১৩৭৯ সাল]

প্রথম পর্ব শেষ। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

তার আগে তখনকার দিনের বৈপ্লবিক সংস্থাগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে তোমাকে কিছু বলবো মল্লিকা। তাতে বুঝতে তোমার সুবিধা হবে।

শুরুতে একটিই মাত্র দল ছিল আমাদের বাংলাদেশে। নাম তার অনুশীলন সমিতি। এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অরবিন্দ পর্বেরও অনেক আগে ১৯০২ সালে—কলকাতায়।

সমিতির বিশিষ্ট সদস্য প্রশ্নেয় জীবনতারা হালদার তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'১৯০২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন, বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩০৮ সাল, সোমবার ইং ২৪শে মার্চ, ১৯০২ খৃঃ, কলিকাতায় প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১নং (অধুনা ২৪ নং) মদন মিত্র লেনে ইহার ব্যায়ামক্ষেত্র এবং তাহারই সন্নিকটে এক ছোট বাড়িতে উহার কার্যালয় ছিল।

পরে ১৯০৫ সালে ঐ অফিস (Oxford Mission-এর উত্তরে) ৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। সংক্ষেপে সকলে উহাকে 'Forty-Nine' বলিত। সভ্যদের কেন্দ্রে মিলিত হইবার ইহাই ছিল সহজ সংকেত।'

[অনুশীলন সমিতির ইতিহাস : জীবনতারা হালদার : পৃ-৪]

উল্লেখযোগ্য, এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসু। সভাপতি ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, যিনি পি. মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন সবার কাছে।

পি. মিত্র! পরবর্তীকালে এই মানুষটি সম্বন্ধে দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে কি উক্তি করেছেন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'মিত্র মহাশয় *সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি ইংরেজিতে উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তথাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া নামার্জন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে চেঁচাইয়া দেশ বিখ্যাত 'নেতা' হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়া বিশেষভাবে ঘৃণা করিতেন এবং কখনও আবেদন-নিবেদনকারীদের (কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের) রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথম অবস্থায় বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্যের সহিত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।' [ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম : পৃঃ—২১-২২]

তখনও পর্যন্ত এই অনুশীলন সমিতি ছিল একটি প্রকাশ্য দল। প্রধান লক্ষ্য—শরীর চর্চা, চরিত্র গঠন ও সমাজ সেবা। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন ঠাকুর, বিপিন পাল, সখারাম দেউস্কর, সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রমুখ অনেকেই ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক।

ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো এবং এমনি আরো অনেকেই। সবশেষে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ।

এই অনুশীলন সমিতি থেকেই একদিন জন্ম নিল যুগান্তর পার্টি। কারণটা—নীতিগত। সভাপতি পি. মিত্রের অভিমত : আগে শরীর ও চরিত্র গঠন, তারপর অন্যকথা। কিন্তু তরুণ দল আর দেরি করতে রাজী নয়।

তাঁরা তখনই ঝাঁপ দেবার জন্য ব্যস্ত। তাঁদের বক্তব্য: স্বাধীনতা অর্জনই হল মূল কথা। চাই প্রচার। চাই প্রস্তুতি। অহেতুক কালহরণ করে আর লাভ নেই।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়:

'পি. মিত্র মহাশয়ের মত ছিল যে, লাঠি ও ফুটবল খেলা, বক্সিং ও কুস্তি করা বাঙালী যুবকদের অবশ্য কর্তব্য এবং ইহা আমরাও জানিতাম, কিন্তু তাহা লইয়াই কেন যে আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

[ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম: পৃঃ—২২]

দেখতে দেখতে একটি দল পরিণত হল দুটি দলে। বিশেষ করে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, পত্রিকার নামানুসারে তাদের বলা হতো যুগান্তর পার্টি। বাকি সবাই—অনুশীলন।

অবশ্য যুগান্তর কোন একক দল নয়। বিভিন্ন স্থানের কতগুলি বিভিন্ন গ্রুপ, যেমন—উত্তরবঙ্গের দল, বরিশাল দল, মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দল—এমনি অনেকগুলো গ্রুপের সমন্বয়কে বলা হতো যুগান্তর পার্টি।

এ প্রসঙ্গে অনুশীলন সমিতির বক্তব্য কি দেখা যাক:

'...প্রথমে একটা বড় দল ছিল—'অনুশীলন সমিতি।' এরই ভিতর থেকে যুগান্তরের উদ্ভব। কিন্তু যুগান্তরের বিস্তৃতি হয়েছে অন্যান্য ঝাঁক বা উপদলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। যুগান্তর নাম নিয়ে দল চলে ১৯২০ সালেরও পর। এই নামের প্রতি সশ্রদ্ধ অন্তরে নতি জানিয়েছেন বহু তেজোদ্দীপ্ত সুধী, ত্যাগী, তাপস, বীর। 'যুগান্তর' নামটারই কেমন যেন একটা মন মাতানো শক্তি ছিল। 'যুগান্তর' কাগজ থেকেই দলের নাম ঐ হয়েছিল।'

(অনুশীলন সমিতির ইতিহাস: জীবনতারা হালদার: পৃ—৩০)

অনুশীলন নামটি নেওয়া হয়েছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসম্ভার থেকে। আর যুগান্তর! আসল লোকের মুখ থেকেই সে কাহিনী শোনা যাক:

"যুগান্তর নাম আমারই মনোনীত। এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়।...শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব—ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। যুগান্তর দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।

(দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম: ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: পৃ—২২)

শুধু অনুশীলন বা যুগান্তর নয়। এর বাইরেও বেশ কতকগুলো বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল তখনকার সময়ে। তাদের মধ্যে আত্মোন্নতি সমিতি, চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর পাবনা সম্মিলনী, ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তি সংঘ (পরবর্তীকালে বি. ভি), বান্ধব সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি এবং পরবর্তীকালে ঢাকার শ্রীসংঘ ও মাস্টারদা সূর্য সেনের দল ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে সব চাইতে প্রাচীন দল—অনুশীলন সমিতি। ১৯০২ সালে এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। অথচ কি আশ্চর্য দেখো, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সে দলের নেতৃত্ব এবং কর্মতৎপরতা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল পূর্ব বাংলায় ঢাকা শহরে।

প্রধানত এর মূলে ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত লাঠি খেলোয়াড় পুলিন দাস। এতদিন অনুশীলন সমিতি ছিল একটি প্রকাশ্য সংস্থা। শরীর চর্চা, চরিত্র গঠন ও সমাজ সেবাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। দেখতে দেখতেই সেই প্রকাশ্য সংস্থা রূপ নিল বৈপ্লবিক একটি গুপ্ত সমিতিতে। নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব পুলিন দাসের।

এ প্রসঙ্গে সমিতির অন্যতম নেতা স্বগীয় নলিনীকিশোর গুহের লেখনী থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

"১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকা গমন করেন। তথায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন এবং পুলিনবিহারী দাসের উপর উহার পরিচালনার ভার দেন। সেই উপলক্ষ্যে এক বৈঠকে পি. মিত্র বলেন, কেবল স্বদেশী ও বয়কটে ইংরেজ দেশ ছাড়বে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কিসে যাইবে? মিত্র মহাশয় দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসিকোষ মুক্ত হয়েছে, আর পেছলে চলবে না।"

পুলিনবাবুর উপর পূর্ববাংলার সমিতি-সংগঠনের ভার প্রদত্ত হইল। কলিকাতার ভার রহিল সতীশবাবুর উপর। বলা বাহুল্য, পি. মিত্র সর্বাধিনায়ক।

এই সময় পি. মিত্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। তাহা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না হউক, উভয়ের অনুরাগীদের দ্বারা ঘটিতেছিল।

প্রকৃত পক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্ত আড্ডায় অস্ত্র সংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস, মজঃফরপুর অভিযান—বারীনবাবুর নেতৃত্বেই হইয়াছিল, সতীশবাবু বা মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক উহাতে ছিল না এবং দুইটি দল যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।

পরবর্তীকালে কলিকাতার মূল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা

যায় না। পি. মিত্রের মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ সংস্থা হিসাবে উহা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু এই মূল সমিতির শাখা হিসাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলিতে ঢাকার এই অনুশীলন সমিতিকেই সাধারণত বুঝাইত। এই অনুশীলনই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলিকাতায় এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।''

[বাংলায় বিপ্লববাদ : নলিনীকিশোর গুহ]

এই হল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের ইতিহাস। তবে একজনের কথা উল্লেখ না করলে এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মল্লিকা। তিনি হলেন কবিগুরুর আত্মীয়া সরলা দেবী। প্রকৃত পক্ষে স্বামীজীর আদর্শে তিনিই প্রথম বীজ রোপণ করেছিলেন বাঙলায় এই উর্বরা ভূমিতে। অগ্নিযুগের আদি পর্বে তাঁর অবদান কোনরকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে বহু আলোচিত 'মার্কসবাদই শেষ কথা নয়' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু ঘোষের 'বিপ্লব ও বিপ্লবী' গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'বিপ্লবী বাঙলার পটভূমি গড়ে তোলা ও পরে সেই পথে বাঙালী যুব-শক্তিকে চালনা করার দায়িত্ব যে দু'জন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন বীরাঙ্গনা সরলা দেবী ও ভগিনী নিবেদিতা।

অনেকেরই হয়তো জানা আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে রবীন্দ্রনাথ যে সুর সংযোগ করেছিলেন, তার প্রথম অংশটি তাঁর নিজস্ব, কিন্তু শেষের অংশটির সুর সরলা দেবীর দেওয়া। গোখেলের সভাপতিত্বে বেনারসে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল, সেখানে সরলা দেবী ঐ সুরে নিজে এ গান গেয়েছিলেন।

এবারে সরলা দেবীর কর্মজীবনে প্রবেশের কাহিনী। সোলাপুরে তাঁর মেজো মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একবার বেড়াতে গিয়ে তিনি সেখানকার মারাঠী ক্লাবের দুর্গাপূজার 'দশেরা' উৎসব দেখে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশের মত শুধু বাঈ নাচ, গান ও মদ্যপান নয়—খালি লাঠি, তলোয়ার খেলা ও নানাবিধ ব্যায়ামের প্রদর্শনী, আর বীরত্বমূলক বক্তৃতার ধারা।

দ্বিতীয় ঘটনা—পুণা শহরে পেশোয়াদের একটি বীরত্ব স্তম্ভের সন্দর্শন। এ থেকেই 'বীরাষ্টমী' উৎসবের কল্পনা এল তাঁর মনে।

এ কল্পনারই বাস্তব রূপায়ণে 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে সরলা দেবীর লেখনী প্রথমে বাঙালীকে মৃত্যুচর্চায় আহ্বান জানাল। তিনি লিখলেন :

'মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখো, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না।

তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলা-ধুলোর আমোদ-প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, বিজ্ঞানে-সজ্ঞানে, প্লেগে-জনসেবায়, আগুনে লোক উদ্ধারে, জলেতে আত্ম-প্রাণপণে পর-প্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়; পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গ এভারেস্টের শৃঙ্গে। সঙ্গে করে নিয়ে যাও সুস্থ সবল শরীর। মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি সেইটি। সেজন্য চাই ভারতের অন্যান্য জাতির মত বাঙালীরও নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা।"

কিন্তু শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালেই হবে না। বাঙালীর মন থেকে ভীরুতাও যে অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পাঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে। কিন্তু কি করে!

বেশী ভাবতে হল না। ভারতীতে সরলা দেবীর নতুন প্রবন্ধ বেরুল—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল।' আগুনভরা লেখা। সরলা দেবীর ভাষায়:

'ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম,—রেলে, স্টীমারে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত, ক্ষুব্ধ, মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে, সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে।

তাঁরা পাঠালেনও—তাঁদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরুতে থাকল। পাঠক মণ্ডলীর মনে লুকানো আগুন ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করল। বয়স্করাও পিছিয়ে রইলেন না।

আমি তাদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম,—তনুমন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখী বেঁধে দিতুম—তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা Badge. আমার রাখী বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু মনে মনে সঙ্কল্প রাখলেই উদ্‌যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটানো বারণ ছিল।

বছর কয়েক বাদে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোয় রাখী বন্ধনই দেশময় ছড়াল; যার নেতৃত্ব দিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এগিয়ে এসেছিলেন।"

এরপর হল 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'। সরলা দেবীরই পরামর্শে ভবানীপুরস্থ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্যের স্মরণে বাঙালী ছেলেদের একত্র হয়ে শুধু কুস্তি, লাঠিখেলা,

তলোয়ার খেলা, বক্সিং ইত্যাদির ব্যবস্থা। দেখে সবাই খুশি হলেন। এর নতুনত্বে চমৎকৃত হয়ে তৎকালীন 'বঙ্গবাসী' লিখলেন :

"মরি মরি—কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তৃমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়, শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আহ্বান, বঙ্গ যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্র ধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গ-ললনার হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন!"

এরপর 'উদয়াদিত্য উৎসব'। রাজপুত বীরবালক বাদলের মত বাঙালী ঘরের ছেলে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য যে মোগলের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছেন, তার স্মৃতিও যে বাঙালী যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকার। উদয়াদিত্যের কোন প্রতিকৃতি না থাকায় সভায় ঐ বীরের আত্মার প্রতিরূপ একখানি তরবারী রেখে তাতেই পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হল। এই নূতনত্ব বাঙালী যুবকদের মন কেড়ে নিল।

সরলা দেবী তখন আছেন ২৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। ওখানে একটা ব্যায়ামের ক্লাস খুললেন তিনি। তলোয়ার ইত্যাদি খেলা শেখাবার জন্য প্রফেসর মার্তাজা নামে একজন ওস্তাদকেও রাখা হল। ক্লাবের সব খরচ, মার্তাজার মাইনে, বক্সিংএর দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি, ছোট লাঠি প্রভৃতির সব খরচই তিনি যোগাতেন আর নিজে ছেলেদের হাজিরা লিখতেন।

ক্রমে ক্রমে এ ক্লাবের খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এরকম ক্লাব খুলে গেল। সরলা দেবীর ভাষায়—'পুলিন দাসও এলেন ঢাকা থেকে অনুশীলন সমিতির সর্দার হয়ে।' এ সমস্ত ক্লাবই, এমনকি অনুশীলন সমিতিও ও'র কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ছাড়াও আর্থিক বা জিনিসপত্রের ব্যাপারেও সাহায্য পেতো।

ফিরিঙ্গির মার খেয়ে তাঁরই ক্লাবের বাঙালী ছেলেরা একদিন মাঠ থেকে পালিয়ে এলে তিনি তাদের এই কাপুরুষতার জন্য প্রচুর ধিক্কার দিয়েছিলেন। ফলে এরপর তার ছেলেরা বিলিতি ঘুষির পাল্টা দেশী কিলের কল্যাণে মাঠ থেকে মাথা উঁচু করেই ফিরেছে, বরং ফিরিঙ্গিরাই পালিয়েছে।

সরলা দেবী লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গাপূজার অষ্টমীর আর একটি নাম 'বীরাষ্টমী' এবং সেদিন বীরাষ্টমীব্রত পালন করা ও ব্রতকথা শোনাবার বিধান।

এ নামটি তাঁর খুবই মনে ধরল। তিনি ভাবলেন যে, বহুকাল ধরে বাঙালী সংস্কারে যা রয়েছে, কিন্তু বাঙালীর ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তারই পুনরুদ্ধার অনেক সহজ হবে এবং দেশের তৎকালীন অবস্থায় তা একান্ত

কর্তব্যও বটে। ভীরু বাঙালী মায়েদের হাত দিয়েই ছেলের রাখীবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজ মুখে 'বীরোভব' বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধুলো ও কাজকর্মের প্রবৃত্তি দেওয়াতে হবে।

সেই থেকেই আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতার প্রায় সব ক্লাবই এতে যোগ দিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হল, কেউ পেল মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা, কেউ ছোরা, কেউ লাঠি, এবং প্রত্যেকেই একটি করে বীরাষ্টমী পদক—তার এক পিঠে লেখা 'বীরোভব' আর এক পিঠে 'দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ'।

বীরাষ্টমী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে তরবারীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

এ ভাবেই বীরাষ্টমী উৎসব সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ল। বছরে বছরে এদিনে মায়ের হাত থেকে রাখী নিয়ে ছেলেরা যথার্থ শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল। আর এখানেই হল বিপ্লবী বাঙলার গোড়া-পত্তন। ভয় জয় করার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠল বাঙলার যুবকগণ।

বাঙলার সেই উর্বর জমিতেই প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের দূত হয়ে এলেন যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) ও বারীন ঘোষ এবং শেষটায় শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন ভগিনী নিবেদিতা। বাঙলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলি চারদিকে ডালপালা প্রসারিত করে শুরু করে দিল কাজ।

…পরাধীন জাতির ক্লীবত্ব ঘোচাতে গিয়ে তিনি যে একদিন 'বিলিতি ঘুষি'র বদলে 'দেশী কিলের' আবাহনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে নেতাজীর 'ব্রিটিশকো ইণ্ডিয়াসে মার ভাগা দেও' যে তারই সফল পরিণতি' তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরলা দেবীর এ অবদান সত্যি অবিস্মরণীয়।'

মল্লিকা, এ হল বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার কথা, যখন চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখাও বুঝি বারণ ছিল মেয়েদের পক্ষে। সেই অনগ্রসর যুগে তোমারই বয়েসী এই কুমারী কন্যাটি বিধিনিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ভেঙে কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা ভাবতে পার একবার!

অবশ্য বিয়ে তিনি করেছিলেন আরো পরে—বত্রিশ বছর বয়েসে, কিন্তু সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাই এ কাহিনী এখানেই শেষ করে চলো আবার আমরা ফিরে যাই প্রাণ দেয়া-নেয়ার সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ে।

প্রথম পর্বের কথা আগেই তোমাকে শুনিয়েছি। এবার শোন দ্বিতীয় পর্বের কথা।

'বঙ্গভঙ্গ সেটেলড্ ফ্যাক্ট (settled fact) একদিন আন্‌সেটেলড্ (un settled) হয়েছিল—সে এই বাঙলা দেশে। সেদিনই বাইরে থেকে কেউ ভার বইতে আসে নি। আন্দোলন পরিচালনার পরামর্শ দিতে বাইরে থেকে কর্তা আমদানী করতে হয় নি ; বাঙলার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন বাঙলার নেতাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।'

মরমী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলোর মধ্যে অতিশয়োক্তি বলতে কিছু নেই মল্লিকা। বাঙালী সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছিল সেদিন।

একদিকে বড়লাট লর্ড কার্জনের সদম্ভ উক্তি 'বঙ্গভঙ্গ settled fact, একে রোধ করার সাধ্য কারোরই নেই'। অন্যদিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পণ 'বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই আমরা মানব না। এই settled fact কে unsettled আমরা করবই।'

প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের চাপে শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিতে হল ইংরেজ সরকারকে। না মেনে উপায়ও ছিল না। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই-সত্যেন, চারু-বীরেন প্রমুখ মরণজয়ী বাঙালী তরুণের দল সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য আর বাঙলা দেশ এক নয়। বাঙালীর মানসিকতা আলাদা ধাতুতে গড়া। আদর্শের জন্য মরতে বা মারতে কোনটাতেই তারা পিছপা নয়। এ ক্ষেত্রে নতি স্বীকার না করে উপায় কি ?

শুধু সেদিন বলে নয়, পরবর্তীকালেও কি 'দিল্লীশ্বর', কি মহাত্মা গান্ধী কারোরই শিরঃপীড়ার অন্ত ছিল না চিরকালের অবাধ্য এই বাঙালী তরুণদের নিয়ে। এমন কি গান্ধীজীর অহিংসনীতির বন্যায় সারা দেশ যখন ভেসে গিয়েছিল, তখনও বিনয়-বাদল-দীনেশ বা সূর্য সেনের দল বারবার মাথা তুলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালী আজও মরে যায় নি। সর্বোপরি নেতাজী। সে ইতিহাস তো সবারই জানা।

তাই তো বাঙালী তরুণদের প্রসঙ্গে দেশবন্ধু সব সময়ে বলতেন, 'ওরা হল 'ফ্লাওয়ার্স অফ বেঙ্গল'। আমি ওঁদের ভালবাসি, ওঁদের আত্মত্যাগের কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে যায়।'

আর সেই বাঙালী তরুণদের কি বিপরীত চেহারাই না দেখা গেল এই সত্তর দশকে। কে কত দিল্লীর প্রিয়পাত্র হতে পারে তাই নিয়ে কি প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা। কি ছোট, কি বড়, প্রায় প্রতিটি তরুণ নেতার কণ্ঠে শোনা যেত একই কথা—'দিল্লী যা বলবে, তাই আমরা মাথা পেতে নেব।'

ক্ষুদিরামের দল কিন্তু কোনকালেও এমন বাধ্য ভাল ছেলে ছিলেন না মল্লিকা। তাঁদের আর কিছু না থাক, শক্ত মেরুদণ্ড ছিল। নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি বা মর্যাদাবোধেরও অভাব ছিল না। তাই দিল্লীর কাছে কোনদিনও তাঁদের নতি স্বীকার করতে হয় নি, বরং দিল্লীই তাঁদের ভয় এবং সমীহ করে

এসেছে বরাবর।

আজ সেই শক্ত মেরুদণ্ডের অভাব ঘটেছে বলেই তো ভিক্ষাবৃত্তি আর আবেদন নিবেদনই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালীর কাছে। অপ্রিয় হলেও আজ আর এ সত্যকে কোন রকমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদ করা হল ১৯১১ সালে। ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি। সেদিন লর্ড কার্জন সর্বশক্তি নিয়োগ করেও যা পারেন নি, ক্ষমতার লোভে আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই অসম্ভবকেই আবার সম্ভব করে তুলেছিলেন ১৯৪৭ সালে। ফলে আবার সেই বঙ্গভঙ্গ, যার মাশুল দিতে গিয়ে স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ছিন্নমূল হয়ে।

কে জানে, হয়তো অবাধ্য বাঙালীকে শায়েস্তা করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। নইলে পাঞ্জাবের বেলায় সুষ্ঠু সমাধান হলেও বাঙালী উদ্বাস্তুদের বেলায় তা হল না কেন। এর জবাবদিহি চাইবার মত শক্ত মেরুদণ্ড আজ বাঙলা দেশে কোথায়! দিল্লী অসন্তুষ্ট হবে যে!

দুই বাংলা আবার এক হল ১৯১১ সালে।

সেই সঙ্গে এক নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন ইংরেজ সরকার। এতকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। কিন্তু কলকাতা আর নিরাপদ নয়। অবাধ্য বাঙালী ছেলেরা আঘাতের পর আঘাত হেনে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন বারবার। সুতরাং, কলকাতা থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে চল এবার দিল্লীতে।

দিল্লী ভারতবর্ষের মাঝখানে অবস্থিত। বাঙলা দেশ—তার দূরত্বও অনেক বেশী। সেদিক থেকে দিল্লীই সবচাইতে নিরাপদ।

খবর শুনে রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন দুঃসাহসী এক বাঙালী তরুণ। এর জবাব আমি দেব। একেবারে প্রথম দিনেই দেব। বুঝিয়ে দেব যে, দিল্লীও আর তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

অক্ষরে অক্ষরে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন দুঃসাহসী সেই বাঙালী তরুণ। বুঝিয়ে দিলেন যে, বিপ্লবীর প্রতিশ্রুতি, আর একালের জননেতাদের প্রতিশ্রুতি এক নয়।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল।

উৎসবমুখর দিল্লী মহানগরীর সেদিন অন্য চেহারা। পথঘাট লোকারণ্য। যেদিকে তাকান যায় শুধু মানুষ আর মানুষ।

ঐতিহাসিক দিল্লী দরবার। তারই শোভাযাত্রা চলেছে দিল্লী মহানগরীর

রাজপথ দিয়ে।

এতদিন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। এবার থেকে দিল্লী। শোভাযাত্রা শেষে বড়লাট বাহাদুর তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

শোভাযাত্রার পুরোভাগে হাতির পিঠে চেপে সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। পেছনে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী, দেশীয় রাজা মহারাজা ও মোসাহেবের দল।

পথের দুধারের বাড়িগুলোতে অসম্ভব ভীড়। ছাদে, বারান্দায়, এখানে-ওখানে, কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের তিনতলা বাড়িটাতেও সেই একই দৃশ্য। পুরুষদের স্থান তিনতলা ও একতলায়। দোতলাটা রাখা হয়েছে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য।

কুইন্স গার্ডেন হয়ে শোভাযাত্রা তখন চাঁদনী চক পর্যন্ত এসে গেছে। ঐ যে দূরে এক বিপুলদন্ডী রাজহস্তীর পিঠে দেখা যাচ্ছে সস্ত্রীক বড়লাটকে। তাঁদের মাথার উপর ছত্র ধরে আছে করদরাজ্য থেকে আগত এক জংগী জওয়ান, মহাবীর সিং।

হঠাৎ কোথা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী এসে আশ্রয় নিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-এর সেই দোতলার বারান্দায়। সে কি তার নয়ন ভোলান রূপ! এমন রূপ সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

—তোমার নাম কি বহিন! মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জনৈক গুজরাটি মহিলা।

—মেরা নাম! হাসলেন তরুণীটি, মেরা নাম লীলাবতী।

শোভাযাত্রা এসে গিয়েছে। দোতলার ঠিক নিচেই হাতির পিঠে উপবিষ্ট সস্ত্রীক বড়লাট।

হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজ—বুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!

কি হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল কুন্ডলীকৃত কালো ধোঁয়ার অন্তরালে। তবে এটুকু বোঝা গেল যে, কলকাতার মত দিল্লীও আর নিরাপদ নয়।

নিচে তখন চরম বিশৃংখলা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। বিশৃংখলা আরও শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে মিছিলের সুসজ্জিত হাতিগুলি। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সে কি তাদের উন্মত্ত ছোটাছুটি। তাদের পায়ের চাপে কত লোক যে জখম হল, তার বোধহয় কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল এক বীভৎস দৃশ্য। মাহুতটি মারা পড়েছে। বড়লাটের অবস্থাও অত্যন্ত আশংকাজনক। বোমার একটা টুকরো

তাঁর পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের উপরে উঠে গিয়ে মস্ত বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে সেই ক্ষতস্থান থেকে। তাছাড়া এখানে ওখানে অসংখ্য আঘাত। কি হবে বলা শক্ত।

ছুটে এলেন বিশিষ্ট রাজপুরুষ কর্নেল ম্যাক্সওয়েল। তারপর ধরাধরি করে সোজা হাসপাতালে। ফলে, মোগল বাদশাহের অনুকরণে সিংহাসনে আরোহণ করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তাঁর হয়ে সে কাজ সম্পন্ন করলেন অন্য একজন রাজপুরুষ।

আশ্চর্য, এই হট্টগোলের মধ্যে সেই রূপসী লীলাবতী যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন কেউ তা টের পেল না। খেয়ালই করল না কেউ।

তবে কি লীলাবতীই বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন দোতলা থেকে। নাকি অন্য কেউ! অনেক তদন্ত। অনেক গবেষণা। তবু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়লেন শাসক সম্প্রদায়। এতবড় সাহস! শেষে কিনা সম্রাটের সর্বোত্তম প্রতিনিধি বড়লাটের গায়ে হাত দেওয়া! এ যে চিন্তাই করা যায় না!

এ ব্যাপারে সাহেবদেরও বুঝি ছাপিয়ে গেল মোসাহেবের দল। হুজুর শুধু সম্রাটের প্রতিনিধিই নন, ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর গায়ে যে হাত দিতে পারে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলানো উচিত।

সবাইকে টেক্কা দিলেন সরকারের পয়লা নম্বর খয়ের খাঁ দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হেড ক্লার্ক রাসবিহারী বসু।

দেরাদুনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সে কি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা প্রদর্শন! ধিক সেই পাষণ্ড আততায়ীকে, যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে এমন ঘৃণ্য পন্থায় আক্রমণ করেছে। একজন রাজভক্ত প্রজা হিসেবে আমার দাবী—অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করে চরম শাস্তি দেওয়া হোক।

বলতে বলতে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেললেন রাসবিহারী। তারপরই মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

শাসক সম্প্রদায় আত্মহারা। রাসবিহারীর সত্যিই তুলনা নেই। বেশ বোঝা যায় যে, আঘাতটা ওঁর খুবই লেগেছে। লাগবেই তো। এমন রাজভক্ত প্রজা ক'জন আছে ভারতবর্ষে। প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদাই ওঁর দহরম মহরম। সবাই ওঁর নামে অজ্ঞান। এমন কি শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যমণি স্বয়ং মিলিটারী সেক্রেটারী পর্যন্ত ওঁর ভক্ত। নিজে তিনি বাংলা শেখেন ওঁর কাছে।

শুধু কি তাই! কি করে বাংলার বিপ্লবীদের দমন করা যায়, সে সম্বন্ধেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা হলেন এই রাসবিহারী। কতদিন তিনি এই নিয়ে

কত পরামর্শ করেছেন রাসবিহারীর সঙ্গে। কত গল্প। এহেন রাসবিহারী যে বড়লাটের উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণে খুবই মর্মাহত হবেন তাতে আর বিচিত্র কি।

ঘুম নেই ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান কর্মকর্তা স্যার চার্লস ক্লিভল্যান্ড এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত বাঙালী গোয়েন্দা সুশীল ঘোষের চোখে। যে করে হোক, আততায়ীকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। নইলে মুখ দেখানোও যে ভার হবে সরকার বাহাদুরের পক্ষে।

আশ্চর্য, সেখানেও রাসবিহারী। বস্তুতঃ রাসবিহারী যে সরকারের কত বড় মোসাহেব ছিলেন, অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর লেখনী থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'বোমার আঘাতে আহত হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দেরাদুনে চিকিৎসাধীনে ছিলেন, তখন এই বোমা নিক্ষেপের তদন্তের ভার নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ (Central Intelligence Bureau)। তখন তার কর্তা ছিলেন স্যার চার্লস ক্লিভল্যান্ড। তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন বাঙালী গোয়েন্দা সুশীল ঘোষ। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তিনিও দেরাদুন গিয়েছিলেন।

সুশীল ঘোষ তাঁর (রাসবিহারীর) সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আলাপে তাঁকে খুব বিশ্বাসী রাজভক্ত এবং ব্রিটিশ রাজত্বের কল্যাণকামী মনে করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুশীল ঘোষ বলেন, এই বোমা বাংলা দেশ থেকে এসেছে, বাঙালীরা এর ভেতরে আছে। সন্দেহ হয়, চন্দননগর এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। আপনি চলুন বাংলাদেশে, আমাদের সাহায্য করবেন। রাসবিহারীবাবু রাজী হলেন। গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে বনবিভাগ (Forest Department) রাসবিহারী বাবুকে প্রথমে ছয়মাস এবং প্রয়োজনমত যতদিন ইচ্ছা ছুটি মঞ্জুর করে। তিনি সুশীল ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় এলেন।' [বিপ্লবীর জীবন দর্শন : প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী : পৃ-২৩০]

সুশীল ঘোষের এই অনুমান কিন্তু মিথ্যে নয় মল্লিকা। বিধ্বংসী এই বোমাটি সত্যিই চন্দননগরে তৈরী। এর নির্মাতা প্রবর্তক সংঘগুরু বিপ্লবী নায়ক মতিলাল রায়ের সহকর্মী মণীন্দ্র নায়েক। বিপ্লবের প্রয়োজনে সেদিন অনেক বোমাই তৈরী করতে হয়েছিল চন্দননগরের এই মণীন্দ্র নায়েককে।

কিন্তু বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন কে? কি তার নাম? সেই রূপসী তরুণী লীলাবতীই বা কোথায় গেল? এ মহাযজ্ঞের প্রধান হোতাই বা কে?

কোন জবাব নেই। প্রশ্ন যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল বহুদিন পর্যন্ত।

১৯১৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী বিরাট টাকার অঙ্ক ঘোষণা করা হল

পুরস্কার হিসেবে। আততায়ীকে তোমরা ধরিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার।

কোথায় আততায়ী, কোথায় বা পুরস্কার। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ কোন সূত্র খুঁজে পেল না আততায়ী সম্বন্ধে।

উল্টে ১৭ই মে তারিখে আবার বোমা নিক্ষিপ্ত হল লাহোরের লরেন্স গার্ডেন্স-এ অবস্থিত পুলিশ ক্লাবে। লক্ষ্য ছিল—শ্রীহট্টের প্রাক্তন এস. ডি. ও, বর্তমানে পাঞ্জাবের সহকারী কমিশনার মিঃ গর্ডন। এই নিয়ে দুবার। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার দরুণ এবারও গর্ডনের পরিবর্তে প্রাণ দিতে হল ক্লাবের একজন চাপরাশিকে।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ দিশেহারা। এই সেদিন দিল্লীতে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, আবার কিনা সেই বোমা নিক্ষেপ। নাঃ। যে করে হোক, এ রহস্য ভেদ করতেই হবে।

রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলল অতি আকস্মিকভাবে—কলকাতার রাজাবাজারে। তারিখটা ছিল ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর।

অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবী অমৃত হাজরার খোঁজে সেদিন ১৯৬/১ আপার সার্কুলার রোডের একটা গোপন আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির। কোথায় অমৃত হাজরা? ধর ওকে।

ফল হল মারাত্মক। দেখা গেল, অমৃত হাজরার এই গোপন আস্তানাটা আসলে একটা বোমা তৈরির কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সহসা কি দেখে চমকে উঠল পুলিশবাহিনী। বোমার খোলগুলি কি দিল্লীতে নিক্ষিপ্ত সেই বোমাটির মত নয়?

ধরা পড়লেন অমৃত হাজরা। ধরা সম্ভব হল না চন্দননগরের সেই মণীন্দ্র নায়েককে। এবারও তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হলেন ভাগ্যের জোরে। এ প্রসঙ্গে আমার সম্পাদিত 'অগ্নিযুগ' সংকলন গ্রন্থে তাঁর লিখিত নিবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

'লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লী চাঁদনী চকে চন্দননগরে আমার দ্বারা প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর আমি কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে অমৃতলাল হাজরার সাহায্যে আরও উন্নত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়মিত যাইয়া অমৃতলাল হাজরাকে সাহায্য করিতাম। তিনি নিজেই লোহার খোল ঢালাই করিতেন এবং তাহার মধ্যে মালমসলা দিয়া আমি তাঁহাকে বোমা তৈয়ারীর বিষয়ে সাহায্য করিতাম।

'১৯১৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের সন্ধ্যায় সেখানে যাইতে যাইতে কলিকাতায় তাঁহার বাসার নিকটবর্তী আমহার্স্ট স্ট্রীটে পৌঁছিয়া ভিতর হইতে নির্দেশ পাইলাম যে, আজ সেখানে না যাইয়া আমাকে চন্দননগরে চলিয়া যাইতে

হইবে। আমি তাহাই করিলাম।

'পরদিন সকালেই সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, অমৃত হাজরার বাসায় খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং সেখান হইতে বোমা তৈয়ারীর মালমসলা পাওয়া গিয়াছে। অমৃতলালকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।' [অগ্নিযুগ : পৃ—৪১-৪২]

ওদিকে লালবাজারে সেদিন ব্যস্ততার সীমা নেই। ব্যস্ততার কারণ, বোমার আড্ডায় পাওয়া একটি সাঙ্কেতিক লিপি। আসামীকে হাজার জেরা করেও এ সম্বন্ধে কোন সদুত্তর মেলেনি। কি-লেখা রয়েছে হিজিবিজি আঁকা এই চিহ্নগুলোর মধ্যে?

অনেক চেষ্টা করে অবশেষে মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হলেন পুলিশের ডি. আই. জি. মিঃ ডেনহাম। লেখা রয়েছে অপরিচিত একটি নাম। 'দিল্লীর সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ।'

ধরা হল দিল্লীর আমীরচাঁদকে। সেখানে পাওয়া গেল আরো একটি নাম—'দীননাথ তলোয়ার'।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল দীননাথ তলোয়ারকে। এবার কাজ হল। পুলিশের চাপে সবকিছু ফাঁস করে দিলেন দীননাথ তলোয়ার। ফলে এতদিন বাদে রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলে গেল পুরোপুরিভাবে।

জানা গেল—সেদিনের সেই রূপসী তরুণী লীলাবতী আদপেই কোন তরুণী নন, তিনি বাংলা দেশেরই এক দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস। লাহোরের লরেন্স গার্ডেনস-এর পুলিশ ক্লাবে বোমা নিক্ষেপ করাটাও তাঁরই কীর্তি। তখন তার ছদ্মনাম ছিল—'বিষিন দাস।'

বসন্ত বিশ্বাস, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী প্রমুখ সবাইকে ধরা হল একে একে। বসন্ত বিশ্বাস নদীয়া জেলার পরাগাছা গাঁয়ের অধিবাসী। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল কৃষ্ণনগরে।

আর এই মহাকাণ্ডের প্রধান হোতা কে?

তিনিও বাঙালী। নাম তাঁর রাসবিহারী বসু। চন্দননগরের রাসবিহারী বসু। সরকারের একান্ত রাজভক্ত প্রজা রাসবিহারী বসু। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

খবর শুনে চেনা পরিচিত প্রতিটি লোক স্তম্ভিত। একি অদ্ভুত কথা। রাসবিহারী তো পুলিশের স্পাই। নইলে এত মাখামাখি কেন তার বড় বড় সাহেব সুবোদের সঙ্গে?

হ্যাঁ, এই ধারণাই সবাই সেদিন পোষণ করতেন রাসবিহারী সম্বন্ধে। তাই লেখা রয়েছে তখনকার দিনের পুলিশ রিপোর্টে:

'...It is the general belief there amongst the Bengali com-

munity that Rash Behari was a police spy and used to supply information to the C. I. D. officers.' [The Weekly Report of the Intelligence Branch, Bengal dated July 20, 1914. Quoted by Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukerjae.]

বিস্ময় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জেরও সেদিন কম ছিল না মজিকা। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর 'My Indian years. 1910-1916' গ্রন্থে কি মজার উক্তি করেছেন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'...When driving in a car from the station to my bunglow. I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others, all of whom we are very demonstrative their salaams.

It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me.'

অর্থাৎ—দেরাদুন স্টেশন থেকে গাড়ি করে বাংলোতে যাবার পথে একটা বাড়ির দরজায় আমি জনৈক ভারতীয়কে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে সেলাম জানাচ্ছিল। পরে জেনেছিলাম যে ঐ ব্যক্তিই নাকি আমার প্রতি বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে প্রধান নায়ক।

তবে সবচাইতে বেশী বিস্মিত হয়েছিল বোধহয় শ্বেতাঙ্গ সমাজ। শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত রাসবিহারী কিনা আসলে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী। এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত! ঠিক আছে, ধরো এবার রাসবিহারীকে।

কোথায় রাসবিহারী। তন্ন তন্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল; তবু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না রাসবিহারীর।

শুরু হল চোর-পুলিশ খেলা। এ ঘরে পুলিশ, ও ঘরে রাসবিহারী। রাস্তার এপাশে বাদী, ওপাশে আসামী। রেলের একই কামরায় এক আসনে পুলিশের সর্বময় কর্তা, অন্য আসনে লক্ষ টাকার ফেরারী আসামী রাসবিহারী। যেন দুটি সমান্তরাল রেখা। পাশাপাশি স্থান, তবু যেন কতদূর।

শেষ পর্যন্ত হাটে-বাজারে, সংবাদপত্রে, রেলস্টেশনে—সর্বত্র তাঁর ফটো ছড়িয়ে দেওয়া হল রাশি রাশি। তোমরা একে ধরিয়ে দাও। টাকা তো পাবেই, সেই সঙ্গে বহু-আকাঙ্ক্ষিত খেতাব।

সব বৃথা। এ যুগের সব্যসাচী রাসবিহারীকে ধরা এত সহজ নয়। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে অভ্যস্ত। তাছাড়া চোখের নিমেষে ভোল পরিবর্তন করতেও যাকে বলে একজন সুদক্ষ শিল্পী। এহেন রূপকারকে ইচ্ছা করলেই কি ধরা যায়। তাই এত তৎপরতা সত্ত্বেও আজ

লাহোর, কাল অমৃতসর, পরশু কলকাতা, চন্দননগর ইত্যাদি করে দিব্যি তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাদের চোখের উপর দিয়ে।

বিভিন্ন নামে। বিভিন্ন পরিচয়ে। কখনো ফ্যাটবাবু। কখনো সতীন্দ্র চন্দর। কখনো বা চুচেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশ চন্দর বা অন্য কোন নামে।

সাহারাণপুরে ব্যারিস্টার জে. এম. চ্যাটার্জীর বাড়িতে পাঠানবেশী কাবুলিওয়ালা পরিচয়ে। লাহোরে নিখুঁত পাঞ্জাবী। কাশীতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার—এমনি নানা বেশে, নানা পরিচয়ে। নানা রূপসজ্জায়।

কতবার মুখোমুখি হয়েছেন। কথাবার্তা বলেছেন কতবার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আশ্চর্য, কেউ তাকে ধরতে পারে নি। সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি কারো।

যেমন একবার ঘটেছিল কাশীতে। বাইরে পুলিশ। গোটা বাড়িটাই তারা ঘিরে ফেলেছে চারিদিক থেকে। তারপরই ক্রুদ্ধ হুংকার। কে আছ ভেতরে? দরজা খোল।

বেরিয়ে এল একটি উড়ে ঠাকুর। চোখে মুখে তার সুস্পষ্ট ভীতির ছাপ। বেশ বোঝা যায় যে পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছে। দারুণ ভয়।

—রাসবিহারী ভেতরে আছেন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল উড়ে ঠাকুরটি। হাঁ, বাবু ভেতরেই আছেন। যান আপনারা ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে ঢুকল উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। আশ্চর্য, কেউ নেই। সেই উড়ে ঠাকুরটাও নেই। কখন যে কেটে পড়েছে কেউ তা খেয়াল করে নি।

আর একবার কলকাতায়। শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন পুলিশে পুলিশে একেবারে একাকার। রাসবিহারী এসেছেন। এখানেই কোথাও তিনি রয়েছেন আত্মগোপন করে। একেবারে পাকা খবর।

সত্যিই পাকা খবর। কারণ, শেয়ালদা পোস্ট অফিসের দোতলায় বসে যে প্রৌঢ় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানটি তখন তন্ময় হয়ে বেহালায় সুর তুলেছিলেন তিনি কিন্তু আসলে রাসবিহারী ছাড়া আর কেউ নন।

একই দৃশ্য দেখা গেল জন্মভূমি চন্দননগরে। রাসবিহারী বাড়িতেই রয়েছেন। অভ্রান্ত খবর। এবার আর তার রেহাই নেই পুলিশের হাত থেকে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। পুলিশ অবাক। আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই। তবে কি ময়লার বালতি হাতে নিয়ে একটু আগে যে ঝাড়ুদারটা বেরিয়ে গেল, তিনিই সেই রূপকথার নায়ক রাসবিহারী?

সত্যিই রূপকথার নায়ক। প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য একটি ক্ষেত্রে। গোটা অঞ্চল ঘেরাও। এক্ষুনি এখান থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যাবেন কি করে। চারিদিকেই যে পুলিশ।

সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান। দেখা গেল, জনকয়েক লোক একটা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। কণ্ঠে তাদের চিরপরিচিত ধ্বনি—'রাম নাম সত্ হ্যায়—রাম নাম সত্ হ্যায়।'

ইতিমধ্যে দু-দুবার গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাসবিহারীকে।

একবার কলকাতার বাদুড়বাগান মেসে। ঢাকা থেকে দলীয় সদস্য বারীন চ্যাটার্জীর আনা একটা গুলিভরতি রিভলবার অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কখন যে ট্রিগারে হাত রেখেছেন, টেরও পাননি রাসবিহারী। টের পেলেন গুলির শব্দে। দেখা গেল—বা হাতের তৃতীয় আঙ্গুলটা জখম হয়েছে গুরুতরভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলী। একে গুলির শব্দ, তার উপর আবার আহত। এ অবস্থায় বিপদ ঘটতে কতক্ষণ।

বাদুড়বাগান থেকে ২৯৬/১ আপার সার্কুলার রোডের আস্তানায়। দেখেই তৎপর হয়ে উঠলেন নলিনীকিশোর গুহ প্রমুখ সমিতির সদস্যবৃন্দ। এক্ষুনি যা হোক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। অবিলম্বে।

এ প্রসঙ্গে সমিতির অন্যতম প্রধান নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলীর লেখনী থেকে কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'দুপুরে বেলা আমি ও রাসবিহারীবাবু আমাদের বাদুড়বাগান রো'র বস্তির খোলার ঘরে বসে কথাবার্তা বলছি, তখনই একজন একটা চামড়ার ব্যাগে করে তিনটি রিভলবার দিয়ে গেল। রাসবিহারীবাবু ব্যাগ খুলে রিভলবার বার করে যন্ত্র ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য যেমন ট্রিগার টেনেছেন, অমনি একটা গুলি সশব্দে আমার কাছ দিয়ে হুস করে চলে গেল।

তাকিয়ে দেখি রক্ত। কিন্তু কোথা থেকে এল এই রক্ত, কে আমাদের মধ্যে আহত হয়েছে তা প্রথমে বুঝতে পারলাম না।...যাই হোক, দেখা গেল যে গুলি রাসবিহারীবাবুর হাতের একটা আঙুল ভেদ করে গেছে।

একে আমাদের ঘরটা রাস্তার একেবারে উপরে, তায় সুকিয়া স্ট্রীট থানাও খুব সামনে। গুলির শব্দে লোক আসতে পারে, ঘর খানাতল্লাসী হতে পারে এবং আমরাও গ্রেপ্তার হতে পারি; সুতরাং তক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

রাসবিহারীবাবু আহত হাত নিয়েই চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন,

এবং আমিও ব্যাগের মধ্যে রিভলবার তিনটি পুরে সঙ্গে নিয়ে বার হলাম। দুজনে ভিন্ন ভিন্ন পথে গেলাম। আমি বর্তমান আমহার্স্ট রো'র সুরেন বসু মহাশয়ের নিকট ব্যাগসহ রিভলবারগুলি রেখে আবার রাজাবাজার বস্তির ঘরে চলে গেলাম। রাসবিহারীবাবুও অতি সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে এখানে এলেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পরে তাঁকে তাঁর চন্দননগরে নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। ঢাকায় খবর পাঠিয়ে চাঁদপুরের ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসকে আনিয়ে নিলাম। তিনি রাসবিহারীবাবুকে কয়েকদিন চিকিৎসা করে গেলেন।' [বিপ্লবীর জীবনদর্শন : পৃ—২৩৩-২৩৪]

খবরটা কিন্তু পুলিশের কানে যেতে এতটুকুও দেরী হয় নি মল্লিকা। প্রমাণ গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট। স্পষ্টই সেখানে তাঁর বা হাতের তৃতীয় আঙুল জখম হবার কথা বলা হয়েছে পরিষ্কারভাবে। সেই সঙ্গে এমন আরো অনেক কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে—যা থেকে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা অন্ততঃ স্পষ্ট হয়ে উঠবে তোমার চোখের সামনে।

'Fairly tall ; Stoutst ; Large eyed ; Moustache recently shaved. third finger of one hand stiff and scarred as result of accident ; aged about 30. Dressed sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali.

May probably be wandering about in the guise of a Sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala. Simla, Amritsar, Gurudaspur, Feroz-pore, Jhelum ane Lahore. Bengali Kalibaries and colonies and Hindu Shiwalas & C, should be carefully scrutiinised as well as Sarais and Railway stations.' [Vide File No. 403/14 of the I. B. Records of the Government of Bengal.]

আর একবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাশীর ডাঃ কালীপ্রসন্ন সান্যালের বাড়িতে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। শুধু রাসবিহারী নন, অন্যতম সহকর্মী শচীন সান্যালও সেদিন আহত হয়েছিলেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে সরিয়ে দেয়া হল অন্যত্র। সাবধানের মার নেই। বিস্ফোরণের শব্দে এক্ষুণি যে পুলিশ ছুটে আসবে না তা কে বলতে পারে ?

১৯১৪ সালের ২১শে মে দায়রা জজ মিঃ হ্যারিসনের আদালতে শুরু হল দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী বসন্ত বিশ্বাস, আমীর চাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও আরো সাতজন। অপরাধ—বোমা তৈরি, অস্ত্র আইন ভঙ্গ, বড়লাটের প্রতি বোমা

নিক্ষেপ—এমনি হাজারো অভিযোগ। বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরো গুরুতর। তারা মিঃ গর্ডনকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন লাহোরের পুলিশ লাইনে বোমা নিক্ষেপ করে।

রায় দেওয়া হল ৫ই অক্টোবর। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দ—এই তিনজনকে দেওয়া হল ফাঁসির আদেশ। বয়েস কম, তাই বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

রায় শুনে খুশি হতে পারলেন না শাসক সম্প্রদায়। তাই রায়ের বিরুদ্ধে ২২শে অক্টোবর তাঁরা আপীল করলেন পাঞ্জাবের চীফ কোর্ট আদালতে। হলই বা বয়েস কম, তা বলে বাংলা দেশের ঐ দামাল ছেলেটিকে কোন রকম খাতির করা চলবে না। ওকেও ফাঁসির হুকুম দেওয়া হোক।

পাঞ্জাব চীফ কোর্ট রায় দিলেন ১৯১৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। হ্যাঁ, তাই হবে। ঐ ফাঁসি কাঠেই ঝুলতে হবে দুরন্ত কিশোর বসন্ত বিশ্বাসকে।

রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল। না, কোন রকম দয়া বা অনুকম্পা নয়। ফাঁসিই ওঁর উপযুক্ত শাস্তি।

কাজেও তাই করা হল। ১৯১৫ সালের ১১ই মে চারজনকেই প্রাণ দিতে হল আম্বালা জেলের অভ্যন্তরে।

সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেলেন আরো একজন। তিনি হলেন বালমুকুন্দের সহধর্মিণী রামরাখী দেবী। বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখনী থেকেই তাঁর মর্মস্পর্শী বিবরণ তোমাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

'বালমুকুন্দ কারাগারে বন্দী। তাঁর প্রেম-বিহ্বলা সহধর্মিণী মনে প্রাণে তখন থেকেই স্বামীর সহযাত্রিনী। যথা সময়ে পেলেন তিনি তরুণ স্বামীর ফাঁসির সংবাদ। বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর বল্লভ। স্ত্রী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই ত্যাগ করলেন আহার। মৃত্যুর পানে পথ চলতে হবে। কিন্তু শুধু আহার ত্যাগে ঐ পথের দূরত্ব কমে না। সুতরাং ছেড়ে দিলেন পানীয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুদূত এসে মাথায় তুলে নিল মহিয়সী নারীকে। মুহূর্তে মিলন ঘটে গেল স্বামীর আত্মার সঙ্গে তাঁর আত্মার।'

রামরাখী দেবীর অন্তর্ধান অপূর্ব। তাঁর কথা কেউ জানে নি। তাঁর উদ্দেশ্যে কেউ চোখের জল ফেলে নি, কোন জয়ধ্বজা ওড়ে নি। তবু বলব, তাঁরই মত জায়া-জননী ভগ্নীদের অলক্ষ্য অবদান ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ গড়ে উঠত না। তাঁদের স্মৃতির বেদীমূলে তাই ছড়িয়ে থাকবে জাতির অনুচ্চারিত প্রণাম। বিশ্ব কবির ছন্দে এখানেও বলা চলে :

'শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।'

বসন্ত বিশ্বাস ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেন ১৯১৫ সালের ১১ই মে।

এবার তোমাকে শোনাব যথাক্রমে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুশীল লাহিড়ীর কথা। তবে আমি কিন্তু শেষোক্ত জনের কথাই তোমাকে আগে শোনাব মল্লিকা। কারণ সুশীল লাহিড়ীর প্রাণদানের ইতিহাস কোন আলাদা কাহিনী নয়। আসলে তিনিও রাসবিহারীর এই অধ্যায়ে জড়িত ছিলেন ওতপ্রোতভাবে।

রাসবিহারী পলাতক। তাবলে তিনি কিন্তু চুপ করে বসেছিলেন না। মাথায় তখন তাঁর এক অভাবনীয় পরিকল্পনা।

ইয়োরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরেজ এখন তার নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। তার বেশীর ভাগ সৈন্যই বাইরে চলে গেছে যুদ্ধের প্রয়োজনে। এই তো সুযোগ। এই সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কিন্তু এ কাজে বিপ্লবী তরুণ দলই যথেষ্ট নয়। সাহসে, শৌর্যে, বীর্যে ও ত্যাগে বিপ্লবীদের তুলনা নেই। সত্যিকারের সৈনিকের যা কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন, সবই তাঁদের আছে। নেই শুধু উপযুক্ত অস্ত্র,—যা রয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে। তাই তাদেরও দলে টানতে হবে।

অবশ্য কাজটা সহজ নয়। যুগ যুগ ধরে বিদেশীর দাসত্ব করাটা তাদের এমনই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, স্বাধীনতার কথা তারা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে সেই অসম্ভবকেই এবার সম্ভব করে তুলতে হবে। তখন নিশ্চয়ই তারা সহযোগিতা করবে।

কেন করবে না! এদেশ কি তাদের নয়! স্বাধীনতা কি তাদেরও কাম্য নয়! তাদের সেইভাবে গড়ে নিতে হবে। গড়ার দায়িত্ব নেবে বিপ্লবী তরুণবৃন্দ।

সবাইকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিদেশে যে সব বিপ্লবী রয়েছেন, তাদেরও ফিরে এসে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে হবে। কাউকে এ সময়ে দূরে থাকলে চলবে না।

ডাক শুনে ছুটে এলেন ভারতের এখানে ওখানে ছড়ান বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। এলেন শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত, বিষেণ সিং, ভগৎ সিং, হরনাম সিং, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও কাপ্লে, বিভূতি হালদার, প্রিয়নাথ, বিশ্বনাথ পাঁড়ে প্রমুখ দুঃসাহসী তরুণবৃন্দ।

এলেন দিল্লা সিং, মঙ্গল পাণ্ডে, নলিনী মুখার্জী, নরেন ব্যানার্জী, আউধবিহারী, ভাই পরমানন্দ, অনুকূল চক্রবর্তী, হির্দেরাম প্রমুখ এমনি আরও অনেকেই।

আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন গদর পার্টির প্রাণ সম্পদে ভরপুর শিখ যুবক কর্তার সিং। সঙ্গে নিয়ে এলেন গদর পার্টির চার হাজার তরুণ শিখ।

আরও বিশ হাজার এল বলে। তারও ব্যবস্থা করে এসেছেন তিনি। আর এলেন পিংলে। দুরন্ত দুঃসাহসী মারাঠী যুবক পিংলে।

দেখে আশায় আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে রাসবিহারীর। অদ্ভুত ছেলে কর্তার সিং আর পিংলে। ওদের চিনতে সময় লাগে না। নিজের দীপ্তিতে নিজেরাই যেন ও'রা দীপ্যমান।

দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সবাই চলে গেলেন তাদের নিজ নিজ এলাকায়। এবার সেনাবাহিনীর সংগে যোগাযোগ।

এলাহাবাদে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ভার নিলেন দামোদর স্বরূপ। বিভূতি হালদার আর প্রিয়নাথ নিলেন বেনারস ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব। রামনগর সিক্রোলের ভার নিলেন মোট তিনজন। বিশ্বনাথ পাঁড়ে, মংগল পান্ডে আর দিল্লা সিং। জব্বলপুরের জন্য নলিনী মুখার্জী একাই যথেষ্ট।

জলন্ধরে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব নিলেন হির্দেরাম। ওখানকার ডোগরা রেজিমেন্টকে চাইই। হরিচরণ হারার আর পিয়ারা সিং গেলেন কোহাটের দিকে। আর সন্ত গোলাব সিং আর হরনাম সিং গেলেন বান্নু। ওখানকার ৩৫তম রেজিমেন্টের সহযোগিতা দরকার।

মূলা সিং গেলেন গাঁয়ের দিকে। ইংগিত পেলেই তিনি গাঁয়ের কৃষকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন লাহোর ও অমৃতসরের উপর। দিল্লীর সেনাবাহিনীর দায়িত্বে রইলেন সন্ত বাসাখা সিং।

বাংলার জন্য ভাবনা নেই। ওখানে বাঘা যতীন একাই একশো। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় বসে তাঁর সংগে আলাপ আলোচনাও হয়ে গেছে এই নিয়ে। ইংগিত পেলেই তাঁর নির্দেশমত ফোর্ট উইলিয়ামের সেনাধ্যক্ষ মনসা সিং ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে।

দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে। রাসবিহারী সেনা বিদ্রোহের ব্যবস্থা করবেন। বাঘা যতীনের লক্ষ্য থাকবে প্রধানত জার্মানী থেকে গোপনে আগত অস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলোর দিকে।

'ইন্দো-বার্লিন কমিটির মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। ম্যাভারিক, এস. হেনরী, অ্যানিলার্সেন ইত্যাদি জাহাজগুলি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পড়ল বলে।

সব চাইতে গুরু দায়িত্ব নিলেন মারাঠী যুবক পিংলে আর আমেরিকা থেকে আগত কর্তার সিং। তাঁরা একই সংগে আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিন্ডি, মীরাট ইত্যাদি সেনানিবাসে কাজ চালাবেন ঘুরে ঘুরে।

হেড কোয়ার্টার্স হবে লাহোরে। সেখানের দায়িত্বে থাকবেন স্বয়ং রাসবিহারী। ওদিকে পুলিশের কড়া নির্দেশ, কোন অবাঞ্ছিত লোককে লাহোরে বাড়ি ভাড়া দেওয়া চলবে না। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন সহকর্মী

রামশরণ দাসের সহধর্মিণী।

'আমি বোসবাবুর সংগে থাকব তাঁর স্ত্রীর পরিচয়ে। উনি দেবতা। ও'র সংগে থাকব তাতে ভয় কিসের!'

যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে রইলেন বিনায়ক রাও কাপুলে। তিনিই প্রতিটি কেন্দ্রের খবর যথাযথভাবে রিপোর্ট করবেন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারীর কাছে।

বিনায়ক রাও কাপলে। নামটা মনে রেখো মল্লিকা। কারণ, সুশীল লাহিড়ীর কাহিনীর মূলে রয়েছেন এই বিনায়ক রাও কাপুলে। সে কাহিনীতে আমি আসছি আরও পরে।

ওদিকে প্রস্তাব শুনে অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল প্রতিটি সেনানিবাস থেকে। আমরা প্রস্তুত। অস্ত্রের জন্য ভাবনা নেই। সব অস্ত্র আমাদের হাতে। সব আমাদের হবে।

সাঁওতাল বাহিনীও প্রস্তুত। এ দেশ আমাদের। আমরাই এ দেশের মালিক। বিদেশী শাসন আমরা মানব না।

প্রস্তুত বাংলাদেশের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। সর্বত্র সাজ সাজ রব। খবর চলে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। তৈরি হও। আর সময় নেই।

জেলাগুলোতেও তৎপরতার অন্ত নেই। কোন জেলায় কতগুলো বন্দুক আছে তার সঠিক হিসেব চাই। কোন থানায় কতগুলো রাইফেল রয়েছে, তারও নির্ভুল রিপোর্ট চাই। যে করে হোক, ওগুলো হাত করতেই হবে।

ময়মনসিং ও রাজশাহীর স্বরূলের জংগলে তরুণ বিপ্লবীদের রণকৌশল ট্রেনিং দেবার কাজ শুরু হয়েছে। একই ভাবে ট্রেনিং-এর কাজ চলছে পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পুর সেণ্টারে। তার জন্য আরও বন্দুক, আরও রাইফেল প্রয়োজন।

অনুকূল মুখার্জী ছুটে গেলেন ঢাকায় অবস্থিত শিখ বাহিনীর কাছে। সংগে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টের শিখ সেনানায়কের চিঠি। তোমরা হাত মেলাবে না আমাদের সংগে?

আলবৎ! 'হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলিল দিক।'

কিন্তু শুধু এখান থেকে আঘাত হানলেই চলবে না। একই সংগে বাইরে থেকেও আঘাত হানা প্রয়োজন।

সংগে সংগে সাড়া দিল ব্রহ্ম, মালয় ও সিংগাপুরে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনী। এতদিন পরের জন্য লড়াই করেছি। এবার লড়াই করব দেশের জন্য। আজাদীর জন্য।

বার্লিনে অবস্থানকারী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীদেরও ব্যস্ততার অন্ত নেই। লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুরস্ক ও

কাবুল হয়ে এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহাযজ্ঞে কাউকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এবার ফিরে চল আপন ঘরে।

বিদ্রোহের দিন ধার্য হল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

ঐদিনই এক সংগে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর। তারপর মুষ্টিমেয় ঐ ব্রিটিশ বাহিনীকে সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে সুউচ্চে তুলে ধরবে ভারতের নিজস্ব জাতীয় পতাকা।

বিরাট সংগঠন। পেশোয়ার থেকে শুরু করে সিংগাপুর পর্যন্ত বিরাট পটভূমিকা। বিরাট সংগ্রাম প্রস্তুতি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

প্রতিটি সৈন্যের জন্য নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রস্তুত। প্রস্তুত স্বাধীন ভারতের নিজস্ব পতাকা বাহিনী। এমন কি যুদ্ধ ঘোষণার খসড়া পর্যন্ত প্রস্তুত। এখন শুধু ঝাঁপ দেবার অপেক্ষামাত্র।

আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন রাসবিহারী। আর দেরি নেই। লগ্ন আসন্ন। পিংলে এবং কর্তার সিং-এরও সেই একই অবস্থা। বেসামরিক লোক হয়েও সামরিক বেশে সজ্জিত হয়ে প্রতিটি সেনানিবাসে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নিঃশংক চিত্তে। প্রস্তুত হও ভাই সব। সময় নিকট হয়েছে এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

সহসা কৃপাল সিং ও নবাব খান নামে দুই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক গোপনে শলা-পরামর্শ শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। সব কথা সরকার বাহাদুরের কাছে ফাঁস করে দিলে কেমন হয়! নিশ্চয় অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। সেই সংগে খেতাব।

সেনাবাহিনীর চোখে মুখে নিবিড় সংশয়। অফিসার মহলে কিসের যেন একটা চাপা চঞ্চলতা। সবার চোখে মুখে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। মনে হয়, কিছু একটা ঘটেছে। তবে কি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দলের মধ্যে?

ত্রস্তে খবর চলে গেল রাসবিহারীর কাছে। পরিস্থিতি সন্দেহজনক, নির্দেশ চাই।

সংগে সংগে রাসবিহারী জানালেন তাঁর নতুন নির্দেশ। এত চেষ্টা, এত আয়োজন ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। বরং তারিখ এগিয়ে দাও। ২১শের পরিবর্তে বিদ্রোহ ঘোষণার দিন ধার্য হোক ১৯শে ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু সব বৃথা। তার আগেই ইংরেজবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় সেনাদলের ওপর। বাধা দেবার মত কোন অবকাশই তারা পেল না। ফলে সবাইকে বন্দী হতে হল একে একে।

আর একদল ভারী কামান স্থাপন করল অস্ত্রাগারের দরজায়। খবরদার!

কেউ এগুতে চেষ্টা করবে না এদিকে। তাহলে সবাইকে উড়িয়ে দেওয়া হবে কামান দেগে।

বাধাও পেতে হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন ফিরোজপুরে সেনানিবাসে। কিছুতেই তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয় ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে। ফলে প্রায় পঞ্চাশজনকে প্রাণ হারাতে হল মেসিনগানের গুলিতে।

বিপ্লবী তরুণ দলও বাধা দেবার মত কোন সুযোগ পেলেন না। একই দিনে, একই সংগে লাহোরের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘরে পুলিশ হানা দিল পরবর্তীকালে জালিয়ানওয়ালাবাগের অন্যতম নায়ক মাইকেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে।

কেবলমাত্র চারটি বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তেরোজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে। কর্তার সিং প্রমুখ কেউ বাদ গেলেন না। সেই সংগে কলকাতা থেকে আনা বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেল প্রচুর। আর পাওয়া গেল অসংখ্য বিদ্রোহ পতাকা, বৈপ্লবিক পুস্তক-পুস্তিকা ও বিভিন্ন যুদ্ধ সামগ্রী।

ধরা গেল না রাসবিহারী আর পিংলেকে। বিপদের সুস্পষ্ট আভাস পেয়ে ততক্ষণে রাসবিহারী পিংলেকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন কাশীর পথে।

এ প্রসংগে মাইকেল ও' ডায়ার পরবর্তীকালে তাঁর 'India as I know it' গ্রন্থে কি বলেছেন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'On the morning of the 19th February, we had information from our spies that Rash Behari and Pingle had moved their head-quarters to Lahore, that suspecting the leakage of their plans they had decided to antidate the rising to the night of the 19th and had sent messages and emissaries to various selected centres, including several cantonments, to act accordingly. We had then to act.

Thirteen of the most dangerous revolutionaries were captured with their paraphernalia of conspiracy—arms, bombs, bombmaking materials, revolutionary literature and four rebel flags.

Unfortunately Rash Behari and Pingle were not among those who were captured.'

এদিকে কলকাতায় তখন দারুণ উত্তেজনা। পাঞ্জাব মেল কি এসে গিয়েছে? না এলেই বুঝতে হবে যে, গণ বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সংগে সংগেই স্থানীয় বিপ্লবীরা আক্রমণ করবেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। তাই নির্দেশ

দওয়া আছে তাদের ওপর। দুর্গের সেনানায়ক মনসা সিংকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেকথা।

কিন্তু একি! পাঞ্জাব মেল তো যথাসময়েই এসে গেল দেখছি। তবে কি কোন কারণে বিদ্রোহ শুরু হয় নি। নাকি তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে?

একই জিজ্ঞাসা তখন ব্রহ্ম ও মালয়ে অবস্থিত সেনাবাহিনীর মনে। কই, কোন গ্রীন সিগন্যাল তো এল না! কি ব্যাপার! তবে কি পিছিয়ে গেল সব কিছু?

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল একমাত্র সিঙ্গাপুরে। পূর্ব-পরিকল্পনামত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঊষালগ্নেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওখানকার ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর। কার সাধ্য তাদের গতিরোধ করে।

ঝড়ের মত উড়ে গেল ব্রিটিশ বাহিনী। সিঙ্গাপুর স্বাধীন হল। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সেখানে উড়তে লাগল স্বাধীন ভারতের নিজস্ব পতাকা। সেই সঙ্গে সমস্ত জার্মান যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হল কারাগার থেকে।

একে একে কেটে গেল সাতদিন। কিন্তু কই, আর কোন নির্দেশ তো এল না ভারত থেকে! কি ব্যাপার! তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে! নিশ্চয়ই তাই। নইলে এমন তো হবার কথা নয়। বাধ্য হয়েই আবার তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হল ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। সিঙ্গাপুর আবার পরাধীন হল।

এ প্রসঙ্গে লেঃ জেনারেল Sir George Macmunn তাঁর 'Turmoil & Tragedy in India' গ্রন্থে কি বলেছেন আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি:

'The mutineers at first at sixes and sevens, now broke up into three parties, one to overpower the men guarding German interment-camp and release the prisoners, another to attack Colonel's house, and a third to prevent any assistance arriving down the road from Singapore. Further, several small parties made off, apparently to murder stray Europeans.' [p.—105-113]

প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তখন সিঙ্গাপুরে। এ সম্বন্ধে তাঁর কি বক্তব্য শোনা যাক।

'ফিফথ লাইট ইনফ্যানট্রি—পাঞ্জাবী ও পাঠান দ্বারা গঠিত। ঘটনার দিন সকালে কুচকাওয়াজে সিপাহীদের আসিতে দেরি হইল। সুবেদার মেজর ডান্ডি খাঁ মোটেই আসিলেন না।

ডান্ডি খাঁর অফিসে ডাক পড়িলে তিনি উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট দুইজন

অফিসারকে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিলেন না। ইহাতে অফিসারদ্বয় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একজন বলিয়া বসিলেন—'শুয়ার কী বাচ্চা, কে'ও তুম প্যারেডমে নেহি আয়া ?'

ডাণ্ডি খাঁ রিভলবার বাহির করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ঐ দুইজনকে হত্যা করিয়া বাহিরে আসিয়া ফলইন-এর হুকুম দিলেন। তখনই অস্ত্রাগার দখল করিয়া অস্ত্রাদি বণ্টন করিয়া দিবার পর কেল্লার সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারকেই হত্যা করা হইল।

এদিকে প্রায় আড়াইশ সিপাহী রাস্তায় বাহির হইয়া বাছিয়া বাছিয়া লালমুখ দেখিয়া হত্যা করিতে লাগিল। কিন্তু জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিল না।' [সে যুগের আগ্নেয়পথ : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী : পৃঃ—৮৩]

প্রাণের ভয়ে বাদবাকি শ্বেতাঙ্গের দল ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলেন জাহাজের অভ্যন্তরে। তারপরই আর্তকণ্ঠে চারদিকে সাহায্যের আবেদন পাঠাতে লাগলেন রেডিওযোগে—বিদ্রোহীরা কেল্লা দখল করেছে। আমরা বিপন্ন। প্লীজ হেল্প।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং রাশিয়া ছিল ব্রিটিশের পক্ষে। বার্তা পেয়ে প্রথমেই ছুটে এল একটি রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজ। কিন্তু তারপর ? শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই সে কাহিনী আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

'বিদ্রোহের তৃতীয় দিন সকালের দিকে একটি রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া পৌঁছিবার পর শহরে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ-এর বিরতি হয়। ঐ তিনদিনই বন্দরের জাহাজ হইতে এস-ও-এস যাইতে থাকে। রাশিয়ান জাহাজটি নিকটে থাকায় সকালের দিকেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

ধীরে সুস্থে রুশ যুদ্ধ জাহাজের সৈন্যগণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লার দিকে অগ্রসর হইয়া উহার ঢালু জায়গা দিয়া উঠিতে লাগিল—যেন কেল্লায় ঢুকিলেই উহা দখল হইয়া যাইবে।

বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় সেই সৈন্যগণকে উঠিতে দিয়া মাঝপথ বরাবর প্রচণ্ড বেগে গুলি চালাইতে থাকে। এইভাবে শিলাবৃষ্টির মত গুলি চলিবার পর রুশগণের প্রায় প্রত্যেকেই হতাহত হইয়াছিল, ইহাই জনরব।

কেল্লা বিদ্রোহীদের হাতে আরও দুইদিন থাকিবার পর পঞ্চমদিনে একটি জাপানী ক্রুজার আসিয়া বহুদূর হইতে কেল্লার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ করে।

প্রথম প্রথম বিদ্রোহীরাও ২/৪টি কামান দাগিয়াছিল বটে, কিন্তু জাপানী জাহাজটির অবিরাম নির্ভুল গোলা বর্ষণের ফলে কেল্লার সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

ইহার পরই বিদ্রোহীরা সাদা নিশান উড়াইয়া দেয়। জাপানীগণও ব্যান্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া কেল্লায় উঠিল, কিন্তু এবার বিনা আয়াসে কেল্লা দখল করিল—কেল্লায় বহু বিদ্রোহী কামানের গোলায় হতাহত হইবার পর।

ভারতে সৈন্যগণের বিদ্রোহ নিশ্চিত মনে করিয়া সিংগাপুরের সেন্যদের বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পনা মতই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতে কেহ জানিল না এই বিদ্রোহের কথা—এই বীরত্বের কাহিনী।

ভারত হইতে দূরে—বহুদূরে তাহাদের এই জীবনদানের গৌরব ব্যর্থতার গ্লানি লইয়াই মুছিয়া গেল। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা হইতেছে। জানিনা এই হতভাগ্যদের বীরত্বের কাহিনী তাহার এককোণে স্থান পাইবে কিনা।' [সে যুগের আগ্নেয়পথ : পৃঃ—৮৪]

এদিকে কাশীতে এসে একটা দুর্নিবার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন মারাঠী তরুণ পিংলে। এভাবে ব্যর্থতা মেনে নিলে চলবে না। আবার বেরিয়ে পড়তে হবে বিভিন্ন সেনা নিবাসের উদ্দেশ্যে। আবার তাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন করে।

অসীম সাহসে ভর করে একাই তিনি এবার রওনা দিলেন মীরাটের দ্বাদশ-সংখ্যাক রেজিমেণ্ট বাহিনীর উদ্দেশ্যে। সংগে নিলেন দশটি মারাত্মক বোমা, যা গোটা একটা রেজিমেণ্টকে উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। উল্লেখযোগ্য, এর প্রতিটি বোমাই ছিল মেড্ ইন চন্দননগর।

ফাঁদ পাতাই ছিল, তাই বোমা সমেতই পিংলে এবার ধরা পড়ে গেলেন ইংরেজ বাহিনীর হাতে।

২৭শে এপ্রিল শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী সংখ্যা শুরুতে বাষট্টি জন। পরে আশী। তার মধ্যে ষোলজন তখনো পলাতক।

উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও ভুল করলেন না ইংরেজ সরকার। তাই মোট চব্বিশজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। ছাবিবশ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আপীলে কিছুটা হেরফের হল। সেখানে মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল সাতজনের প্রতি। এই সাতজন হলেন—কর্তার সিং, পিংলে, সুরাইন সিং(১), সুরাইন সিং(২), হরনাম সিং, জগৎ সিং আর বখশীষ সিং।

প্রাণ ভিক্ষা চাইতে সবাই অস্বীকার করলেন একবাক্যে। ইংরেজ তাঁদের শত্রু। বিপ্লবী হয়ে শত্রুর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে তাঁদের সম্মানে বাধে। তাই দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন কর্তার সিং—'কেন প্রাণ ভিক্ষা চাইব। আমার যদি একটির বেশী প্রাণ থাকত, তাহলে সবক'টি প্রাণই আমি উৎসর্গ করতাম দেশের জন্য'

এবার শুরু হল দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। আসামী সংখ্যা একশো বারজন। এখানেও উত্তম সিং, ইসার সিং, বীর সিং, রঙ্গ সিং, রুর সিং— এই পাঁচজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

শুরু হল মৃত্যু-মিছিল। এক যায়, আর আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। যেন শেষ নেই এই আসা-যাওয়ার মিছিলের।

এরপর এল তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। এখানেও পাঁচজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। এঁরা হলেন—বলবন্ত সিং, মৌলভী হাফিজ আবদুল্লা, অরুর সিং, হরনাম সিং ও বাবুরাম।

সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈনিকরাও রেহাই পেলেন না। তাঁদেরও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হল সামরিক আদালতের বিচারে। তার মধ্যে কেবলমাত্র ২৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যেই বারোজনকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে।

আর সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরের সেই বিদ্রোহী সেনাদের কি হল। প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখনী থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'কিছুদিন বিচার চলিবার পর শহরের গায়ে পোস্টার পড়িল—কেল্লার দেওয়ালের ধারে কয়েকজনের বিচারের হুকুম শুনান হইবে, জনসাধারণ পরিখার অপর পাড় হইতে উহা দেখিতে পাইবে।

যথাস্থানে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। গিয়া দেখিলাম ৬ জন লোক দাঁড়াইয়া আছে—সম্মুখে বন্দুক তাক করিয়া ২০।২৫ জন গোরা সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমার পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই জলদগম্ভীর স্বরে একজন বলিলেন— 'দাস জাস্টিস ইজ ডান।' সঙ্গে সঙ্গেই একজন হাঁকিলেন—রেডি-ফায়ার!' এক সঙ্গে সবগুলি রাইফেল গর্জিয়া উঠিল।

দুই ভলি গুলি ছোড়া হইল। প্রথম ভলিতেই ছয়জন পড়িয়া গেল। তারপর আসিল ছয়টি স্ট্রেচার ও একজন ডাক্তার। পরীক্ষার পর দেহগুলি লইয়া গেল। আমরা বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলাম।

এই ঘটনার কয়দিন পর আবার পোস্টার পড়িল, ২২ জনের হুকুম শুনান হইবে। বিদ্রোহের দলপতি সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁরও হুকুম এইদিন হইবে পোস্টারে দেখিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই আসিয়া পঁহুছিলাম। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

দেখিলাম, পরিখার অপর পাড়ে প্রায় ১০০ জন গোরা সৈন্য অর্ধচক্রাকারে অর্ধেক দাঁড়াইয়া আর অর্ধেক হাঁটু ভাঙা অবস্থায় বসিয়া আছে। উহারই সম্মুখে ২২টি খুঁটি এবং তাহার পশ্চাতে প্রাচীর। এক পার্শ্বে উচ্চপদস্থ

অফিসারগণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ইহার পরই অপরাধীগণ আসিল। পরনে সাদা পায়জামা ও গায়ে কুর্তা, হাতে উর্দী (ইউনিফর্ম)। শুনিলাম, ইহারা সকলেই এন-সি-ও এবং ভি-সি-ও, অর্থাৎ—সুবেদার, মেজর সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার শ্রেণীর।

দুই পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য। প্রত্যেককে এক একটি খুঁটির সম্মুখে দাঁড় করান হইল। প্রায় মধ্যস্থানে দেখিলাম বিশালকায়, গৌরবর্ণ এবং বৃহৎ গুম্ফ-বিশিষ্ট পুরুষসিংহ।

অপরাধীগণ দাঁড়াইতেই অত্যন্ত কর্কশ গলায় হুকুম হইল 'শ্বান' (অ্যাটেনশন)। গোরা সৈন্যগণ অপরাধীগণের দিকে বন্দুক তাক করল। অপরাধীগণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

হুকুম পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমে মালয় ভাষায়, পরে উর্দু ও ইংরাজী ভাষার পাঠ হইল। প্রত্যেক ভাষায় পাঠের পর ইংরেজীতে 'দোস জাস্টিস ইজ ডান' বাক্য পড়া হইল।

যতক্ষণ পাঠ চলিল, অপরাধীগণ কেবলই উপরের দিকে তাকাইতে থাকিল। যেন কিছুতেই বন্দুকের নলের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না। কেবল ডাণ্ডি খাঁ নির্বিকার চিত্তে সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হুকুম পাঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম হইল—'রেডি-ফায়ার।' ১০০টি রাইফেল একসঙ্গে গর্জিয়া উঠিল—দুইবার। অর্থাৎ—দুই ভলি বন্দুক দাগা হইল।

সকলেই পড়িয়া গেল। কেবল ডাণ্ডি খাঁ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তখনও টলিতে থাকিলেন, যেন কিছুতেই পড়িতে চাহিতেছেন না।

আবার হুকুম হইল—'ফায়ার'। এবারও দুই ভলি গুলি চলিল। ডাণ্ডি খাঁ অবশ্য প্রথম ভলিতেই পড়িয়া গেলেন। ইহার পর স্ট্রেচার আসিল, ডাক্তার আসিল। পরীক্ষা করিয়া যে ২।১ জনের তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাহাদের কানের উপর পিস্তল রাখিয়া দাগা হইল।

ডাণ্ডি খাঁ আমারই মত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মীগণের জীবনদান হয়তো বৃথা যায় নাই। কেবল ভারতে কেহই জানিল না তাঁহাদের মহান আত্মদানের কথা। ইহার পর আরও কয়েকবার এইভাবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়াছে, কিন্তু আর যাই নাই। যাইবার প্রবৃত্তিও আর ছিল না। [সে যুগের আগ্নেয় পথ : পৃ—৮৫-৮৬]

আশাভঙ্গের বেদনায় ততদিনে রাসবিহারী চলে এসেছেন বাংলাদেশে। সবাই ধরা পড়েছেন একে একে। কি হবে আর ওখানে থেকে। দেখা যাক এখানে এসে নতুন করে কিছু করা যায় কিনা।

শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছা অন্যরকম। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাসবিহারীর জন্যে। আজ হোক, বা কাল হোক, ধরা তাঁকে পড়তেই হবে। কি লাভ শুধু শুধু এখানে থেকে ধরা দিয়ে! তার চাইতে সে দূরে চলে যাক। এই হতভাগ্য দেশের জন্য এখনও তাঁর অনেক কিছু করার আছে। দূরে থেকে সেই প্রচেষ্টাই সে চালিয়ে যাক।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত তাই মেনে নিলেন রাসবিহারী। তাই হোক। দূরেই আমি চলে যাব। কিন্তু একটা কথা ভাই। সংসারে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একদিন আমিও হয়তো হারিয়ে যাব তোমাদের মন থেকে। তবু যদি কোন অলস প্রহরে কেউ কোনদিন প্রশ্ন করে যে, 'রাসবিহারী কে ছিল' তাহলে তোমরা কি উত্তর দেবে?

—বলবো,—'তিনি আমাদের নেতা ছিলেন।'

—'না-না-না। কক্ষনো না। নেতৃত্বের অভিমান আমার কোনদিনও ছিল না, আজও নেই থাকবেও না কোনদিন। আমাদের সবার একটাই মাত্র পরিচয়—আমরা বিপ্লবী। জন্ম থেকেই আমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তাই কেউ প্রশ্ন করলে বলবে যে, আমি একজন যোদ্ধা ছিলাম। 'I was fighter.'

এবার পাশপোর্ট সংগ্রহ। এখানেও রাসবিহারী এক ও অদ্বিতীয়। মাথার দাম লক্ষ টাকা, তবু তিনি অসীম সাহসে ভর করে ঢুকে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ অবস্থিত পাশপোর্ট অফিসে। আমি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও একান্ত সচিব রাজা পি. এন. ঠাকুর। টেগোর শিগগীরই জাপান যাচ্ছেন। আমাকে আগে ভাগে গিয়ে যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হবে। অবিলম্বে পাশপোর্ট চাই।

এতটুকুও আপত্তি করলেন না পাশপোর্ট অফিসারটি। খবরটা সত্য। সংবাদপত্রেই তার বিবরণ দেখেছেন তিনি। সুতরাং আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। হাজার হোক টেগোর। পজিশনটা দেখতে হবে তো।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাশপোর্ট নিয়ে দিব্যি বেরিয়ে এলেন রাসবিহারী। তারপর সোজা ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের গোপন আস্তানায়। কাজ চুকে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

১২ই মে, ১৯১৫ সাল।

রাজা পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে জাপানী জাহাজ 'সানুকী মারু'র ডেকে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত নিজের জন্মভূমিকে দেখে নিলেন রাসবিহারী। দু চোখে তাঁর অশ্রুর বন্যা। এই দেশ, এই মাটি তাঁর কত প্রিয়। কত দিবারাত্রির স্বপ্ন জড়ানো এই বাংলা দেশ। আজ সেই একান্ত প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে। মন সায় দেয় না, দেহ সাড়া জাগায় না, তবু যেতেই যে হবে।

ধরা পড়তে পড়তে কোন রকমে বেঁচে গেলেন।দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার হংকং বন্দরে। এখান থেকে আবার নতুন করে পাশ পোর্ট গ্রহণ করতে হবে রাসবিহারীকে।

—নাম কি? জানতে চাইলেন শ্বেতাঙ্গ পাশপোর্ট অফিসারটি।

—পি. এন. ঠাকুর।

—পুরো নাম বলুন।

অন্যমনস্কভাবে ভুল করে ফেললেন রাসবিহারী। কলকাতা থেকে ইস্যু করা পাশপোর্টে নাম ছিল—প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর। এবার বললেন—প্রিয়নাথ ঠাকুর।

সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা খেয়ালই করলেন না পাশপোর্ট অফিসারটি। প্রিয়নাথ ঠাকুর নামেই তিনি নতুন পাশপোর্ট ইস্যু করে দিলেন রাসবিহারীকে। আমি তার প্রতিলিপি তুলে দিচ্ছি।

Permit No. 158

The bearer Preo Nath Tagore, description as below, has permission to proceed from Hong Kong to Kobe, Japan by S. S. Sanuki Maru, leaveing on 31st May 1915.

Description

Age—29 Years.
Village and District—Calcutta.
Height—5 feet 6 inches.
Caste—Brahmin, Hindu.
Occupation—Student.
Nationality—Indian.

Hong Kong (Sd) P. Bragil
31. 5. 1915. Captain
For Superintendent of Police.

মহা বিপ্লবী চলে গেলেন। ভারত তাঁর দেশ। ভারতের স্বাধীনতাই একমাত্র স্বপ্ন। পরবর্তী জীবনেও এই জ্বলন্ত সত্যকে তিনি ভুলে যান নি কোনদিনও। ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজ যে তাঁরই বুকের রক্তে গড়া।

ভুলতে পারেন নি একান্ত প্রিয় সহকর্মীদেরও। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের লেখনী থেকেই কিছুটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর আমরা বসিয়া আছি। মা গঙ্গা কুলে কুলে করিয়া বহিয়া যাইতেছে। দু' চারখানি নৌকা দেখা যাইতেছে। মন্দিরে

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হইয়াছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি পিংলেকে বলিলাম, 'তুমি যে কাজে যাইতেছ, তাতে কত বিপদ তা জান বোধহয়। একটু এধার-ওধার হইলেই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। এটা মনে ভাবিয়াছ কি?'

পিংলে একগাল হাসিয়া বলিল, 'মরা-বাঁচা আমি কিছুই জানি না। যখন আদেশ দেবেন, তখন তা করবই। তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় তো করব।'

বীরের মতই সে উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অনেককে হারাইয়াছি, আবার পিংলেকেও হারাইব কি!

পিংলে তারপরের রাত্রে মীরাট গেল। পিংলের সঙ্গে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ। এখনও তাঁর হাসিভরা মুখখানি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। পিংলে মানুষ নয়। সে ছিল দেবতা। তাঁর মত দশ হাজার লোক থাকিলে ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হইবে।

...আজও যখন আমীর চাঁদ, আবেদবিহারী, বসন্ত কুমার, বালমুকুন্দ, পিংলে, কর্তার সিং, ময়ূর সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং ইত্যাদির কথা মনে পড়ে, তখন নয়ন ধারায় বুক ভাসিয়া যায়!

এর কারণ কি! ওঁরা তো কেউ আমার আত্মীয় নয়। তবু আজও কেন ওদের জন্য কাঁদি। ওরা যে আমার আত্মীয়ের চেয়েও আপন লোক। ওঁরা যে আমার প্রাণের ভাই। তাই তো এখন আমি ওদের জন্য কাঁদি। ওঁদের কথা মনে হলে বুকটা যেন ফেটে যাবার মত হয়।

বিপ্লবীদের মধ্যে একটা গাঢ় ভালবাসা আছে, যা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। নিজেদের বাপ মা, ভাই-বন্ধুর চেয়েও তাঁরা পরস্পরকে বেশী ভালবাসে। এই ভালবাসা না থাকিলে কেহ কখনও বিপ্লবপন্থী হইতে পারে না এবং বিপ্লবমূলক কাজও করিতে পারে না।'

এবার আমি সুশীল লাহিড়ীর কথায় আসছি মল্লিকা।

একাধিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কথা তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। তা বলে সেখানেই কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি। তখনো একটার পর একটা মামলা চলছে তো চলছেই। এমনি করে আরও যে কত চলবে কে জানে।

এবার শুরু হল বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা। এ মামলায় কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল শচীন সান্যাল, দামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জী, প্রতাপ সিং, লক্ষ্মীনারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মিত্র, কালীপদ, জিতেন সান্যাল প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দকে।

অপরপক্ষও চুপচাপ বসে নেই। হোক স্বদেশবাসী, তা বলে দেশদ্রোহীর

কোন মার্জনা নেই। তাই শুরু হয়েছে রাজসাক্ষীদের নিধন করার পালা।

এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখেই লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল হোসিয়ারপুর জেলার চন্দন সিংকে। বিচারে দুজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে ফাঁসি মঞ্চে।

৪ঠা জুন মুখ থুবড়ে পড়তে হল অমৃতসর জেলার সর্দার বাহাদুর আচার সিংকে। এখানেও দুজনকে ঝুলতে হল ফাঁসির দড়িতে। ১২ই জুন একজন সামরিক বাহিনীর নেতাকে প্রাণ দিতে হল অব্যর্থ গুলিতে। ৩রা আগস্ট কাপুর সিং নামে আরও একজন সাক্ষীকে।

গ্রেপ্তার সমানেই চলছে। কেউ বড় একটা বাইরে নেই। রোজই কেউ না কেউ ধরা পড়ছেন পুলিশের হাতে। মনে হয়, কারোরই রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না এই গ্রেপ্তারের হাত থেকে।

বাইরে অবস্থিত তরুণবৃন্দ অবাক। আশ্চর্য, সব কিছু পুলিশের নখ-দর্পণে। এমন কি, যে খবর দলের অতি বিশ্বস্ত দু-তিনজন ছাড়া আর কারোরই জানবার কথা নয়, পুলিশ দেখছি সে-সব কথাও জানে বেশ ভাল করেই।

কি করে এটা সম্ভব! নিশ্চয়ই দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে ভালমানুষ সেজে। কে সেই লোক! কে সেই ঘৃণিত দেশদ্রোহী?

পাপ কোনদিনও চাপা থাকে না, তাই মুখ থেকে মুখোশ খুলে গেল বাংলা দেশের পলাতক বিপ্লবী নারায়ণচন্দ্র দে'র গ্রেপ্তারের ব্যাপারে। ফলে সব কিছুই অনাবৃত হয়ে গেল বিপ্লবী সহকর্মীদের কাছে। এবার আর তাদের চিনতে ভুল হল না আসল মানুষটি কে।

বিনায়ক রাও কাপলে। রাসবিহারীর সংযোগ রক্ষাকারী সহকর্মী সেই বিনায়করাও কাপলে! তিনিই এক এক করে সবাইকে তুলে দিচ্ছেন পুলিশের কাছে। উদ্দেশ্য—নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখা। পুলিশ যেন কোনদিনও জানতে না পারে তার অতীত ইতিহাসের কথা।

গর্জে উঠলেন সুশীল লাহিড়ী প্রমুখ বিপ্লবী সহকর্মীর দল। দেশদ্রোহীর ক্ষমা নেই। কাপলেকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে নিজের জীবন দিয়ে। বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখনো মরে যাই নি।

কিন্তু কোথায় বিনায়করাও কাপলে! বিপদ দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পলাতক। বিপ্লবী শপথ যে কি বস্তু সে তো তার অজানা নয়।

হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সুশীল লাহিড়ী। যাবে কোথায়! একদিন না একদিন তোমাকে আমি খুঁজে বার করবই। সেদিন তোমার রেহাই নেই আমার হাত থেকে।

ক্রমাগত খুঁজে খুঁজে অবশেষে একদিন রাত্রে কাপলের সন্ধান পাওয়া গেল লক্ষ্ণৌ শহরে। আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের হাতের মাউজার

পিস্তল গর্জে উঠল দিকবিদিক কাঁপিয়ে। ব্যস, খেলা শেষ।

বিচারে সুশীলকে দেওয়া হল—প্রাণদণ্ড। কোন দুঃখ নেই। ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, এ তো জানা কথাই। তবু মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে দেশদ্রোহীর খেলা শেষ করতে পেরেছেন তাতেই তাঁর আনন্দ।

আর কৃপাল সিং। রাসবিহারীর এত বড় প্রচেষ্টা যিনি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, সেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিংএর কি হল। না, তাকেও রেহাই দেওয়া হয় নি। নিজের কৃতকর্মের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাদে।

রাসবিহারী পর্বের উপর আমি এখানেই ইতি টানছি মল্লিকা। কিন্তু অবিশ্বাস্য এই কর্মকাহিনীর অপর অংশীদার বাঘা যতীন তখন কোথায়। ধৈর্য ধরো। তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনীই তোমাকে আমি শোনাব পরবর্তী অধ্যায়ে।

এবার বাঘা যতীন।

সেই সঙ্গে চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ পালের কাহিনী, যাঁরা সেদিন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন মাউজার পিস্তল দিয়ে।

কিন্তু মাউজার পিস্তল জিনিসটা কি? বিপ্লবীদের হাতে এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রগুলো এলই বা কি করে?

এর পেছনে একটি ইতিহাস আছে মল্লিকা। আমি সংক্ষেপে বলছি তোমাকে।

৩রা আগস্ট, ১৯১৪ সাল। শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

প্রতিটি রণাঙ্গনে জার্মানীর জয়জয়কার। ক্রমাগত মার খেয়ে খেয়ে ব্রিটিশ তখন দিশেহারা।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলগুলি তখন রীতিমত তৎপর। যে কোন পরাধীন জাতির কাছে এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ। ব্রিটিশের শক্ত ফাঁস থেকে মুক্তি পেতে হলে এ সুযোগ হেলায় হারালে চলবে না।

ব্যস্ততার সীমা নেই বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের। দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে দুজনে দুই ফ্রন্টে কাজ শুরু করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

ঠিক হল, রাসবিহারী উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেনা বিদ্রোহ ঘটাবেন, আর একই সঙ্গে বাঘা যতীন পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানবেন বিপ্লবী সতীর্থদের নিয়ে।

ওদিকে জার্মান সরকারের সংগে বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা চুক্তির কথা চলছে। সে প্রচেষ্টা সার্থক হলে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কোন ভাবনা নেই। জাহাজ বোঝাই বহু অস্ত্রই তখন পাওয়া যাবে জার্মান সরকারের কাছ থেকে।

কিন্তু সে তো গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ কাজ চালানোর মত কিছু অস্ত্রশস্ত্র যে না হলেই নয়। কোথায় পাওয়া যাবে এই প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার ?

উপায় বাতলে দিলেন ঢাকার হেম ঘোষের পার্টির (পরবর্তীকালে বি. ভি.) কলকাতা কেন্দ্রের কর্মনায়ক শ্রীশ পাল। প্রতিটি বিপ্লবী দলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি খুলে বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা।

হাবু ভাই (শ্রীশ মিত্র) কলকাতার বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর মালবাবু। তাঁর খবর—শিগগীরই রডা কোম্পানীর জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসছে বিলেত থেকে। কাস্টমস্ অফিস থেকে সেগুলো বরাবরের মতই রডা কোম্পানীতে পাঠানো হবে গরুর গাড়িতে। তার মধ্যে পঞ্চাশটি মারাত্মক মাউজার পিস্তল থাকবে তিব্বতের দালাই লামার জন্য। সেই সংগে অসংখ্য বুলেট।

মাউজার পিস্তলের গুণাগুণ সবারই জানা। দরকার হলে রাইফেলের মতও এগুলো ব্যবহার করা যায়। পাল্লাও বহুদূর পর্যন্ত। প্রায় এক মাইলেরও বেশী। কাস্টমস্ অফিস থেকে যাবার পথে যে করে হোক, ঐ মাউজার পিস্তলগুলো আমাদের হাত করতে হবে।

সবাই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এক বাক্যে। অতি অবাস্তব পরিকল্পনা। প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের মত জনাকীর্ণ স্থানে এমন দুঃসাহসিক কাজ কল্পনাই করা যায় না।

তবু হাল ছাড়লেন না হেম ঘোষের পার্টির দুর্ধর্ষ বিপ্লবী শ্রীশ পাল এবং বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি সমিতি। কাজটা শক্ত সন্দেহ নেই, তবু দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে।

দূর থেকে সমর্থন জানালেন বাঘা যতীন, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ সিকদার প্রমুখ বিপ্লবী নায়কবৃন্দ। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে শ্রীশ পালের জুড়ি নেই। চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমরা সব সময়েই আছি তোমাদের পেছনে।

২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল।

পরপর সাতখানি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাস্টমস অফিসের সামনে। মাল বোঝাই করে কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িগুলো যাত্রা শুরু করবে রডা

কোম্পানীর দিকে।

পরিকল্পনামত প্রথম ছয়টি গাড়িতে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে দিলেন মালবাবু হাবু ভাই, আর শেষোক্ত গাড়িটিতে তুলে দিলেন পঞ্চাশ হাজার বুলেটসহ সেই মারাত্মক মাউজার পিস্তলগুলো, যার গাড়োয়ান ছিলেন হেম ঘোষেরই পার্টির একজন ছদ্মবেশী সদস্য হরিদাস দত্ত।

যথাসময়ে সাতটি গাড়ি রওনা দিল রডা কোম্পানীর দিকে। পথ সামান্যই। ডালহৌসী স্কোয়ারের এ মাথা থেকে ও মাথা মাত্র।

পথচারী সেজে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন দুর্ধর্ষ নায়ক শ্রীশ পাল এবং হেম ঘোষের পার্টির আর একজন সদস্য খগেন দাস। পকেটে গুলিভর্তি রিভলবার। দরকার হলে যুঝতে হবে, তবু ঐ মাউজার পিস্তলগুলো হাতছাড়া করা চলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছয়টি গাড়ি পেঁছে গেল রডা কোম্পানীর দরজায়। তারপরই শুরু হল মাল খালাসের কাজ। কিন্তু সপ্তম গাড়িটি তখন কোথায়?

প্ল্যানমত সপ্তম বা শেষ গাড়িটি ততক্ষণে মিশন রো-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট-বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট অতিক্রম করে পেঁছে গেছে মলঙ্গা লেনে।

পরবর্তী দায়িত্ব আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম নেতা অনুকূল চক্রবর্তীর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দলীয় সদস্য কালিদাসবাবুর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে বাক্সগুলো পাচার করে দিলেন অন্যতম সদস্য জেলেপাড়ার ভুজঙ্গ ধরের বাড়িতে। ব্যস, নিশ্চিন্ত।

কিন্তু হাবু ভাই! তিনি যে রডা কোম্পানীর মালবাবু। এদিকে কেল্লা ফতে হলেও তিনি তাঁর দায়িত্ব এড়াবেন কি করে?

অনেক ভেবে চিন্তে সেদিনই হাবু ভাইকে নিয়ে দার্জিলিং মেলে চেপে বসলেন শ্রীশ পাল। হিংস্র হায়েনার মুখ থেকে বাঁচাতে হলে ওঁকে অবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার। দলীয় সদস্য ডাঃ সুরেন বর্ধন বাস করেন রংপুর জেলার নাগেশ্বরীতে। আপাতত ওঁকে ওখানেই বরং রেখে আসা যাক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

হাবু ভাইকে নাগেশ্বরীতে পেঁছে দিয়ে পরদিনই আবার ফিরে এলেন শ্রীশ পাল। যদিও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল দুটি মাত্র দল—হেম ঘোষের পার্টি এবং আত্মোন্নতি সমিতি—তবু উদ্দেশ্য সবারই এক। তাই সবগুলো দলকেই অস্ত্রশস্ত্রগুলো ভাগ করে দেওয়া দরকার।

ছদ্মবেশী গাড়োয়ান হরিদাস দত্তর ভাষায়:

'কার্য সমাধা হবার পর ব্রিটিশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবীরাও তেমনি আনন্দে ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি

যত্নে ও সঙ্গোপনে মাউজার পিস্তলগুলি বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। তখন কিন্তু কোন দলাদলি থাকল না। কে অনুশীলন; কে যুগান্তর, কে-কোন ছোট-বড় দলের লোক, তা কারো ভাববার অবসর ছিল না।...অস্ত্রের প্রয়োজন। সেই অস্ত্র এসেছে। এখন ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র সফল হোক। আসুক জাহাজ বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র, আসুক ভাণ্ডার বোঝাই অর্থ।'

[রডা কোম্পানীর অস্ত্র হরণের তাৎপর্য : 'অগ্নিযুগ' সংকলন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত : পৃ—৪৬]

অগ্নিযুগের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ব্যাপী ইতিহাসে রডা কোম্পানী সেই মারাত্মক মাউজার পিস্তলগুলো যে বিভিন্ন সময়ে মোট কতবার ঝলসে উঠেছিল কে তার খবর রাখে ?

তদন্তের ফলে কিছুই জানতে বাকি রইল না পুলিশ কর্তৃপক্ষের। এ প্রসঙ্গে দুর্ধর্ষ পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট লিখিত রিপোর্টে কি বক্তব্য রয়েছে দেখা যাক !

'Our enquiries showed that members of Hem Ghosh's party had amalgamated in Calcutta with the remnants of the old Attonnati Samiti'.

[Tegart's printed note on the Revolutionary Movement in Rangpur, dated March 1, 1915.]

অর্থাৎ—আমাদের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের পার্টি প্রাচীন আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে কলকাতায় এসে মিলিত হয়েছে।

রডা অস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন চার্লস টেগার্ট :

'The gang responsible for this theft is connected with Hem Ghosh's party in Dacca.'

[Note of Mr. Tegart to Mr. Colson, Sept I, 1914. 9. B. Records of the Govt. of W. Bengal, F. N. 1030/ 1914.]

অর্থাৎ—যাঁরা এই অপহরণের কার্যটি করেছেন, তাঁরা ঢাকার হেম ঘোষের পার্টির লোক।

অবশ্য এর জন্য মূল্যও দিতে হয়েছিল কিছুটা। গাড়োয়ান-বেশী হরিদাস দত্ত, অনুকূল মুখার্জী, কালিদাস বসু, গিরিন ব্যানার্জী, নরেন ব্যানার্জী, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, আশুতোষ রায়, ডাঃ সুরেন বর্ধন প্রমুখ সবাইকেই গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিল একে একে।

'রডা আর্মস কন্সপিরেসি' নামে একটা মামলাও খাড়া করা হয়েছিল মহা সমারোহে। কিন্তু একমাত্র চিহ্নিত আসামী মালবাবু পলাতক, তাই খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি সরকারপক্ষে। শেষ পর্যন্ত হরিদাস দত্তকে সাজা দেওয়া হয়েছিল চার বছরের কারাদণ্ড। কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জীর দু বছর। সন্দেহের অবকাশে বাদবাকি সবাই মুক্ত।

মূল নায়ক শ্রীশ পাল ধরা পড়ছিলেন ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে। প্রমাণের অভাবে তাঁকে করা হয়েছিল স্টেট প্রিজনার। রাখা হয়েছিল হাজারীবাগ জেলে।

হারিয়ে গেলেন শুধু একজন। তিনি হলেন মালবাবু হাবুভাই। অধিকতর সতর্কতা হিসেবে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আসামের রাভা এলাকায়। সেখান থেকে কোথায় যে একদিন তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, পরবর্তীকালে হাজার অনুসন্ধান করেও তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

ওদিকে রাসবিহারীর মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা—সেনা বিদ্রোহ। যুদ্ধের প্রয়োজনে বেশীর ভাগ ব্রিটিশ সৈন্য তখন বাইরে। এই সুবর্ণ সুযোগকে কোন রকমেই হাতছাড়া করা চলবে না।

এদিকে সর্বদলীয় নেতা বাঘা যতীনও চুপ করে বসে নেই। আঘাত হানতে হবে। চরম আঘাত এবার হানতে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। উত্তর ভারতে রাসবিহারীর সেনা বিদ্রোহের চেষ্টা পরিকল্পনামতই এগিয়ে চলেছে। ওখান থেকে সিগন্যাল পেলেই—ব্যস।

সর্বক্ষণ পাশে রয়েছেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল প্রমুখ মাদারীপুর গ্রুপের বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। শিষ্যদের প্রতি তাঁদের দলনেতা পূর্ণ দাসের আদেশ—'যতীনদার (বাঘা যতীন) নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমাদের উপর রইল। দরকার হলে প্রাণ দেবে, তবু তাঁর নিরাপত্তা যেন কোনমতেই বিঘ্নিত না হয়।

একবাক্যে সে আদেশ মাথা পেতে নিয়েছেন বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমরা যতীনদার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেবো না। কথা দিলাম।

১৯১৫ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস।

বাঘা যতীন তখন মোটামুটি প্রস্তুত। রডা কোম্পানীর সেই মাউজার পিস্তল হাতে এসে গেছে। এখন চাই কিছু টাকা। বিপ্লবের প্রয়োজনে অবিলম্বে কিছু টাকা না হলেই নয়। কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা?

ঠিক হল—লুঠ করতে হবে। সাধারণ মানুষের টাকা নয়, সরকারী টাকা। ইংরেজ পুঁজিবাদী পরিচালিত বিখ্যাত বার্ড কোম্পানীর টাকা।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ সাল।

সর্বাধিনায়ক বাঘা যতীনের নির্দেশে চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, রাধাচরণ প্রামাণিক প্রমুখ তরুণবৃন্দ সেদিন প্রস্তুত। আর প্রস্তুত বাঘা যতীনের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য প্রিয়পাত্র নরেন ভট্টাচার্য।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল গার্ডেনরিচ অঞ্চলে। প্রকাশ্য দিবালোকে টাকা বোঝাই ট্যাক্সিটা সেদিন আক্রান্ত হল পথের মাঝে।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই শক্ত করে ড্রাইভারের হাত-মুখ বেঁধে রাধাচরণ প্রামাণিক ট্যাক্সিটা চালিয়ে দিলেন কলকাতা অভিমুখে। কিন্তু না, দল বেঁধে সবার একসঙ্গে ফেরাটা ঠিক হবে না, তাই ট্যাক্সি ছেড়ে নরেন ভট্টাচার্য পা বাড়ালেন অন্য পথে।

মল্লিকা, কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।' সেদিন কিন্তু তাই হল। যেতে যেতে নরেন ভট্টাচার্য পড়বি তো পড় একেবারে ডাকসাইটে পুলিশ ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জীর মুখোমুখি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার।

রাধাচরণ প্রামাণিকও রেহাই পেলেন না। যথাসময়ে ওঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল থানাতে। প্রধান সাক্ষী সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার! আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই আমার হাত-মুখ বেঁধে ট্যাক্সিটা চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

খবর শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন বাঘা যতীন। রাসবিহারী জানিয়েছেন—বিদ্রোহের দিন ধার্য হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারী। মাঝে আর আটদিন মাত্র বাকি। এ সময়ে নরেন ভট্টাচার্যের মত অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ছেলেকে পাশে না পেলেই চলবে না। যে ভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, ওকে চাই-ই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব। নরেন যে পুলিশের হাতে বন্দী।

ঠিক হল, লালবাজার থেকে আলিপুর জেলে পাঠানোর পথে পুলিশ বাহিনীকে কাবু করে নরেনকে উদ্ধার করা হবে। কিন্তু সব বৃথা। জানা গেল, নরেনকে ইতিমধ্যেই আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লালবাজার থেকে।

এখন উপায়! ভাবনায় পড়ে গেলেন বাঘা যতীন। কি করে নরেনকে বাইরে আনা যায়! ওকে যে চাই-ই। ওঁর মত প্রতিভাদীপ্ত ছেলেকে এ সময়ে জেলে পচতে দিলে চলবে না।

—একবার জামিনের চেষ্টা করলে হয় না! প্রস্তাব রাখলেন সহকর্মী ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী।

—এ কেসে জামিন দেবে কেন! তবু দেখা যাক একবার চেষ্টা করে।

এদিকে তখন হন্যে হয়ে উঠেছে পুলিশ বাহিনী। বেশ বোঝা যায় যে, গার্ডেনরিচ-বেলেঘাটা ইত্যাদি স্থানে টাকা লুঠ করার ব্যাপারে বাঘা যতীনের হাত রয়েছে। সুতরাং ধরো এবার বাঘা যতীনকে।

কিছুই অজানা নেই বাঘা যতীনের, তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি নিজে গিয়ে দেখা করলেন পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর সঙ্গে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। পরামর্শ দিন। বলুন, কি করে আমি ফিরে পেতে পারি নরেন ভট্টাচার্যকে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে বাঘা যতীনকে চিনতে বাকি ছিল না পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর। তাই তিনি এক অভিনব পরামর্শ দিলেন বাঘা যতীনকে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে স্বীকারোক্তি করে সব দোষ নিজের কাঁধে নিতে বলুন। ব্যস, বাকি সবার জামিন পেতে কোন অসুবিধা হবে না। অন্ততঃ আমি কোন আপত্তি করব না।

খবর চলে গেল জেলে আবদ্ধ মাদারীপুরের মর্দবীর পূর্ণদাসের কাছে। চিত্তপ্রিয়, নরেন, মনোরঞ্জন, রাধাচরণ—সবাই আপনার মন্ত্রশিষ্য। এক্ষেত্রে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনিই নির্দেশ দিন।

যথাসময়ে নির্দেশ এল পূর্ণ দাসের কাছ থেকে। তোমাকে স্বীকারোক্তি করতে হবে রাধাচরণ। সব দোষ নিজের ঘাড়ে টেনে নেবে। জানি, এর জন্য তোমাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। কারণ, বিপ্লবীজীবনে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার চাইতে আদর্শহীনতা আর কিছুই নেই। তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। আমার আদেশ।

রাধাচরণ অনিশ্চিত, বিহ্বল। মন সায় দেয় না। দেহ সাড়া জাগায় না। কিন্তু উপায় কি। দলনেতার আদেশ যে তাঁকে মানতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই করলেন রাধাচরণ। সব কথাই তিনি স্বীকার করলেন পুলিশের কাছে। হ্যাঁ, সব দোষ আমার। আমিই লুঠ করেছি বার্ড কোম্পানীর টাকা। নরেন নির্দোষ। ওঁকে আমি চিনিনে। ওঁর নামও আমি শুনিনি কোনদিন।

ব্যস, জামিন পেতে আর কোন অসুবিধা হল না নরেন ভট্টাচার্যের। পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুও কোনরকম আপত্তি জানালেন না তাঁর পক্ষ থেকে।

লোক চিনতে ভুল করেননি বাঘা যতীন। সেদিনের সেই নরেন ভট্টাচার্যই হলেন পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি এম. এন. রায় নামে সর্বত্র পরিচিত।

আর রাধাচরণ। নরেনকে বাঁচানোর জন্য সেদিন যাকে চরম মূল্য দিতে

হয়েছিল, সেই রাধাচরণ প্রামাণিকের কি হল।

না, ইতিহাসে কোথাও তার নাম নেই। অবশ্য রাধাচরণকে এ অপবাদ আর বেশীদিন সহ্য করতে হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন জেলের অভ্যন্তরে।

এল ২১শে ফেব্রুয়ারী।

সহকর্মীদের নিয়ে বাঘা যতীন সেদিন প্রস্তুত। আজ বিদ্রোহ ঘোষণার দিন। কিন্তু কই, কোন গ্রীণ সিগন্যাল তো এল না লাহোর থেকে।

ক্রমে ক্রমে সব কথাই কানে এল বাঘা যতীনের। কৃপাল সিংয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সেনা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন পুলিশের হাতে। তবে রাসবিহারী নিরাপদ।

হতাশায় এতটুকুও ভেঙে পড়লেন না বাঘা যতীন। জীবনে সার্থকতা ফেলে কেউ ব্যর্থতা চায় না। তবু তা পেতে হয়। তবু তা মেনে নিতে হয়। তাহলে দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিমান করে লাভ কি! আবার কাজে লাগতে হবে। আবার অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে। বসে থাকবার মত অবকাশ কোথায়!

ওদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তখন অত্যন্ত তৎপর। নাটের গুরু রাসবিহারী এবং বাঘা যতীনকে চাইই। কিন্তু কোথায় শাসকদের ত্রাস সৃষ্টিকারী এই দুটি ভয়ংকর মানুষ! কিছুতেই যে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ওদের।

বাঘা যতীন তখন ৭৩ নং পাথুরিয়াঘাটার গুপ্ত আস্তানায়। সঙ্গে রয়েছেন সেই চার বিশ্বস্ত অনুচর। চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন আর জ্যোতিষ পাল। উল্লেখযোগ্য, বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ফণীভূষণ রায় বলে একটি ভুয়ো নামে।

তারিখটা ছিল ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

হঠাৎ সেদিন কার মুখে কি শুনে পুলিশের গুপ্তচর নীরোদ হালদার সেখানে গিয়ে হাজির। চোখে মুখে তার গভীর বিস্ময়। কি আশ্চর্য! যতীনবাবু এখানে!

স্যুট্! একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হল বাঘা যতীনের মুখ থেকে।

নিমেষে চিত্তপ্রিয়ের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল দিকবিদিক কাঁপিয়ে। এত বড় সাহস লোকটার। না, কিছুতেই ওকে জীবন্ত ফিরে যেতে দেওয়া হবে না এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল নীরোদ হালদার। মুখে তার কাতর প্রার্থনা—'আমাকে মারবেন না যতীনবাবু।'

উদার বিপ্লবী বাঘা যতীন মানবতার খাতিরে আর আঘাত করতে চাইলেন

না আহত নীরোদ হালদারকে। বললেন—ওটাকে ছেড়ে দাও। তবে আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। চল সবাই এবার অন্য কোন আস্তানায়।

মল্লিকা, এই উদারতা প্রদর্শনের জন্য সেদিন কিন্তু কম মাশুল দিতে হয়নি বাঘা যতীনকে। যাকে তিনি প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই নীরোদ হালদারই মৃত্যুর পূর্বে পুলিশকে জানিয়ে গেল—এসব কিছুর মূলে রয়েছে বাঘা যতীন।

নিশ্চয়ই তুমি একটু অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ—এ তো জানা কথাই। তাহলে শত্রুকে সেদিন বাঘা যতীন ক্ষমা করতে গিয়েছিলেন কিসের যুক্তিতে ?

উত্তর পাবে বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী এম. এন. রায় (নরেন ভট্টাচার্য) এর কথার মধ্যে। এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন তার কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'পরবর্তীকালে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, কোন শক্তি দিয়ে তিনি আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সেই অদৃশ্য শক্তি—তাঁর ব্যক্তিত্ব। তখন থেকে আমি সমকালীন বহু অসাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যসুখ পেয়েছি। এঁরা সকলেই স্বনামখ্যাত মানুষ, আর যতীনদা ছিলেন যথার্থই ভাল মানুষ। তাঁর চেয়ে ভাল মানুষ আজ অবধি পেলাম না।

...যতীনদা ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী পুরুষ, যাঁর জুড়ি মেলা ভার এবং এই আদর্শের জন্যই তিনি প্রশংসার যোগ্য।...তিনি কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নন, তাঁকে সর্বকালীন বলা যায়। তাঁর মূল্যবোধ ছিল মানবিক, তাই তা স্থান ও কালোত্তীর্ণ। তিনি যেরূপ সাহসী এবং অনমনীয় ছিলেন, ঠিক ততটুকুই ছিলেন দয়ার্দ্র ও সত্যান্বেষী। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জনার মধ্যে নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির প্রকাশ ছিল না, তাঁর অনমনীয়তা তাঁকে অসহিষ্ণু করে তোলেনি।'

[ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া : এম. এন. রায় : ২৭-১-৪৯]

মল্লিকা, যতীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত মল্লবীর ছিলেন, স্বহস্তে বাঘ মেরে 'বাঘা যতীন' হয়েছিলেন, এসব কাহিনী তুমিও জানো। তা বলে দেখতে তিনি কিন্তু মোটেই অসাধারণ কিছু ছিলেন না। এম. এন. রায়ের ভাষায় :

'দৃশ্যতঃ শারীরিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের মত মনে হলেও তিনি দক্ষ মল্লবীর ছিলেন। তাঁর দৈহিকশক্তির কাহিনী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর শরীরগত গঠন থেকে এর আভাসমাত্রও পাওয়া যেত না। তাঁর আচার-ব্যবহারে আত্মম্ভরিতার প্রকাশ ছিল না এতটুকুও। যতীনদার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু থাকত না, যা থেকে বোঝা যেত যে, ভাবীকালে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য বিপুল অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁর বিস্তৃত সংগঠন আছে।...যতীনদা নিজেকে 'কর্মযোগী' বলে মনে করতেন

এবং কর্মযোগের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরতেন।' [অনুবাদিকা—
বকুল প্রতিমা কানুনগো : 'অগ্নিযুগ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

বাঘা যতীন! বাঘা যতীন! বাঘা যতীন!

ঘুম নেই পুলিশ কর্তৃপক্ষের চোখে। সবার উপরে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জী, যিনি একদা গ্রেপ্তার করেছিলেন নরেন ভট্টাচার্যকে। এবার তার টার্গেট বাঘা যতীন। কোনরকমে একবার বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করতে পারলে চাকরী জীবনে উন্নতি আর ঠেকায় কে?

দেখে শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বাঘা যতীন। জ্বালিয়ে মারল এই হতচ্ছাড়া লোকটা। কিছুতেই ওর জ্বালায় শান্তিতে থাকবার উপায় নেই। ঠিক আছে, দেখা যাক কত শক্তি ধরে এই সুরেশ মুখার্জী। আমার প্রতিজ্ঞা, আজকের মধ্যে আমি ওর রক্ত দেখতে চাই, নইলে আমি জলস্পর্শ করব না।

গুলিভরা মাউজার পিস্তল নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন প্রমুখ সঙ্গীগণ। সুরেশ মুখার্জীর রক্ত চাই। আজই চাই। যতীনদার আদেশ।

সন্ধান পেতে দেরি হল না। শিগ্‌গীরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। স্বয়ং বড়লাট আসবেন ভাষণ দিতে। লোকটা এখন তাই নিয়ে ব্যস্ত। তবে আহারের প্রয়োজনে রোজই সে হেদুয়ার মোড় দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। তাকে পাল্লার মধ্যে পাবার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

অগত্যা তাই করা হল। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হল চিত্তপ্রিয়কে। চিত্তপ্রিয় বহুদিন ধরেই পলাতক। পুলিশ তাঁকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তাঁকে দেখতে পেলে সুরেশ মুখার্জী যে গ্রেপ্তারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠবে, সে তো বলাই বাহুল্য।

তারিখটা ছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী। গুপ্তচর নীরোদ হালদারের মৃত্যুর ঠিক চারদিন পরের কথা।

যেতে যেতে সহসা সেদিন কি দেখে থমকে দাঁড়ালেন সুরেশ মুখার্জী। আরে! হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে কে এই ছেলেটা! পলাতক চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী না? শিগ্‌গীর ধর ওকে।

আর ধরতে হল না চিত্তপ্রিয়কে। তার আগেই সুরেশ মুখার্জীকে ধূলিশয্যা নিতে হল চিত্তপ্রিয়র অব্যর্থ গুলিতে। দেহরক্ষী বনবিহারী মুখার্জী ততক্ষণে ভোঁ দৌড়।

চিত্তপ্রিয় কিন্তু এখানেই থামলেন না। তাড়াতাড়ি তিনি হাতের রুমালটা ভিজিয়ে নিলেন সুরেশ মুখার্জীর তাজা রক্তে। যতীনদা ওর রক্ত দেখতে
রক্ত—৯

চেয়েছেন। তাঁকে দেখাতে হবে যে, তাঁর আদেশ পালনে আমরা ব্যর্থ হই নি।

তখনো আশায় আশায় দিন গুণছেন বাঘা যতীন। জার্মান সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তির কথা হয়েছিল বিপ্লবের প্রয়োজনে। তার কি হল। সে সম্বন্ধে এখনো কেন কোন খবর আসছে না বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছ থেকে ?

মার্চ মাসেই জার্মানী থেকে ফিরে এলেন শ্রীরামপুরের বিপ্লবী জিতেন লাহিড়ী। খবর শুভ। 'ইন্দো-জার্মান' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জার্মানী সর্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

কিভাবে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে হবে সে সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ভারতীয় বিপ্লবীকে অবিলম্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাটাভিয়াতে গিয়ে ওখানকার জার্মান কনসাল থিয়োডর হেন ফেরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনিই যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে।

দলপতি বাঘা যতীনের নির্দেশে এপ্রিল মাসেই নরেন ভট্টাচার্য 'সি. মার্টিন' ছদ্ম পরিচয়ে রওনা দিলেন বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য—জার্মান কনসাল হেন ফেরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক করা।

যথাসময়ে নরেন ভট্টাচার্য খবর পাঠালেন বাটাভিয়া থেকে। ঠিক হয়েছে—নির্দিষ্ট সময়েই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'ম্যাভারিক' জাহাজ এসে নোঙর ফেলবে করাচী বন্দরের কাছাকাছি স্থানে।

কিন্তু করাচী বন্দর যে অনেক দূর। প্রশ্ন তুললেন বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়; ওখান থেকে বাংলাদেশে অস্ত্রশস্ত্র বয়ে আনতে গেলে সমস্যা দেখা দেবে না কি ?

খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই আবার খবর চলে গেল বাটাভিয়াতে। করাচী বন্দর নয়, কাছাকাছি কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা কর। অবিলম্বে।

জবাব এল—ঠিক আছে, তাই হবে।

দলনেতা বাঘা যতীনের নির্দেশে ইতিমধ্যে বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী একটি ভুয়ো অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা গড়ে তুলেছেন 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' নামে। বাটাভিয়া থেকে জার্মান কনসাল প্রেরিত টাকাও সেখানে আসতে শুরু করেছে কিস্তিতে কিস্তিতে।

জুন মাসে নরেন ফিরে এলেন বাটাভিয়া থেকে। সবাই প্রস্তুত হও। ম্যাভারিক জাহাজ এসে গেল বলে। ঠিক হয়েছে—পূর্ববঙ্গের হাতিয়া

সন্দীপ, পশ্চিমবঙ্গে রায়মঙ্গল আর উড়িষ্যার বালেশ্বর—এই তিনটি অঞ্চলে অস্ত্র খালাস করা হবে জাহাজ থেকে।

সর্বত্র সাজ সাজ রব উঠল খবর শুনে। দলনেতার নির্দেশে নরেন ঘোষ চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তী চলে গেলেন হাতিয়া সন্দীপে। তাঁদের কাজ হবে—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের সাহায্যে ওখানকার জেলাগুলো দখল করা।

একই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করবেন বিপিন গাঙ্গুলী ও নরেন ভট্টাচার্য। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী অস্ত্র খালাস করবেন রায়মঙ্গল সেণ্টারে।

আর উড়িষ্যার বালেশ্বরে থাকবেন স্বয়ং বাঘা যতীন। বরাবরের মত সঙ্গে থাকবেন চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ পাল।

কিন্তু বিদ্রোহের খবর পেয়ে ভিন্ন প্রদেশ থেকে যদি পুলিশ বা মিলিটারী ছুটে আসে?

না; সে সুযোগ তাদের দেওয়া হবে না। তার আগেই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে বিদ্যুৎগতিতে।

ঠিক হল—ভোলানাথ চ্যাটার্জী বেঙ্গল-নাগপুর রেললাইন ধ্বংস করবেন চক্রধরপুর গিয়ে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথ উড়িয়ে দেবেন সতীশ চক্রবর্তী। বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ লাইন ধ্বংস করবেন স্বয়ং বাঘা যতীন।

ঠিক একই বক্তব্য রয়েছে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'সিডিশন কমিটি'-র রিপোর্টে :

'They considered that they were numerically strong enough to deal with troops in Bengal, but they feared reinforcements from outside. With this idea in view they decided to hold up the three main railways into Bengal by blowing up the principal bridges.

Jatindra was to deal with the Madras railway from Balasore. Bholanath Chatterjee was sent to Chakradharpur to take charge of the Bengal-Nagpur railway, while bridge on the East Indian Railway.

Naren Choudhury and Phanindra Chakraborty were to go to Hatia where a force was to collect, first to obtain control of the Eastern Bengal district, and then to march on to Calcutta.

The Calcutta party, under Naren Bhattacharjee and

Bipin Ganguly, were first to take possession of all the arms and amunations around Calcutta; then to take Fort William, and afterwards to sack the town of Calcutta.'

[S. C. Report : p.83]

সবাই প্রস্তুত। সবার দৃষ্টি তখন বঙ্গোপসাগরের দিকে। ঐ বুঝি মাস্তুল দেখা যায় ম্যাভারিক জাহাজের। জানা গেছে—মোট ত্রিশ হাজার রাইফেল রয়েছে ঐ ম্যাভারিক জাহাজে। তাছাড়া প্রতিটি রাইফেলের জন্য চারশো করে বুলেট। একবার ওগুলো হাতে এসে গেলে আর ভাবনা কি।

৩রা জুলাই ব্যাংকক থেকে আগত উকিল কুমুদ মুখার্জীর মুখ থেকে জানা গেল এক নতুন খবর। জার্মান কনসাল হেন ফেরিক নাকি ম্যাভারিক ছাড়াও একটি বোটে করে পাঁচ হাজার রাইফেল ও এক লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছেন রায়মঙ্গলে।

দিন কয়েক বাদেই ব্যাংকক ফিরে গিয়ে একটি ভয়ংকর খবর পাঠালেন এই কুমুদ মুখার্জী। ম্যাভারিক জাহাজ নাকি জাভার কাছে ধরা পড়ে গেছে শত্রু পক্ষের হাতে।

১৫ই আগস্ট নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) আবার পাড়ি দিলেন বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে। জার্মান কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার।

নরেন ভট্টাচার্যের পরে ভূপতি মজুমদার। দলনেতা বাঘা যতীনের নির্দেশ, অবিলম্বে বাটাভিয়া গিয়ে সব কিছু জেনে এস বিস্তৃতভাবে।

জানা আর হল না। তার আগেই ভূপতি মজুমদার গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন সিঙ্গাপুরের জাহাজ ঘাটে। তাঁর নিজের ভাষায়: 'ষড়যন্ত্রের কথা ব্রিটিশ সরকার সবই জেনেছিল এবং জাল বিছিয়ে রেখেছিল। আমরা গিয়ে সেই জালে ধরা পড়েছি মাত্র।'

২২শে জুলাই ম্যাভারিক ধরা পড়ল শত্রুপক্ষের হাতে।

কিন্তু সত্যই কি কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল ঐ ম্যাভারিক জাহাজে?

না, ছিল না। আসলে গোটা ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগের অভাবে।

কথা ছিল—'অ্যানি লারসেন' নামে ছোট একটি জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে, এবং শানপেড্রো বন্দর থেকে বাটাভিয়া যাবার পথে একটি বিশেষ স্থানে ম্যাভারিক সেসব অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেবে অ্যানি লারসেন থেকে।

দুর্ভাগ্য, অ্যানি লারসেন নির্দিষ্ট সময়ে সেই বিশেষ স্থানে উপস্থিত হতে পারেনি। তার ফলে ক্রমাগত অপেক্ষা করে করে ম্যাভারিক শুধু হাতেই ফিরে

যায় বাটাভিয়াতে।

অ্যানি লারসেন এসেছিল আরো পরে। তখন ম্যাভারিক বাটাভিয়ার পথে। শেষ পর্যন্ত অ্যানি লারসেন অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

কিন্তু ম্যাভারিক জাহাজের কথা সেদিন কি করে জানা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশের পক্ষে? তবে কি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দলের মধ্যে? কে সেই লোক?

কারো কারো অভিমত, এর জন্য দায়ী হলেন ব্যাংককের সেই উকিল কুমুদ মুখার্জী। তিনিই পুলিশের কাছে সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে। অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা নলিনী কিশোর গুহের ভাষায়:

'এই কুমুদনাথই ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে জাহাজ সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। এই জুলাই মাসেই (কুমুদ ৩রা জুলাই যাদুবাবুদের সঙ্গে দেখা করেন) গভর্নমেন্ট জার্মান অস্ত্র গ্রহণের উদ্যমের বিষয়ে সব জানতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন।' [বাংলায় বিপ্লববাদ : পৃঃ—১৫১]

অপর দিকে এ কাহিনীর অন্যতম নায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর ধারণা অন্যরকম। তাঁর বক্তব্য:

'আমেরিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিল। স্বাধীনতাকামী পরদেশীদের পরস্পরে ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তারা কোনক্রমে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে। তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ফরাসী ও রুশের মুখাপেক্ষী ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী তাদের তখন দাবিয়ে রেখেছিল। তারা ফরাসী বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগকে খবরটা পেঁছে দেয়। ফরাসীরা সেই খবর বিলেতের গুপ্তচর বিভাগকে জানায়। এরা তো বন্ধু এবং একই পাপের পাপী! সাম্রাজ্যবাদী!' [বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : পৃ-৩৮৮-৩৯৯।]

ম্যাভারিকই অবশ্য শেষ নয়। এর পরেও 'হেনরী এস' ইত্যাদি জাহাজ-যোগে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল শত্রুপক্ষের তৎপরতার ফলে।

হেনরী এস জাহাজে একমাত্র মাউজার পিস্তলের সংখ্যাই ছিল পাঁচ হাজার। ধরা পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রই তাকে নামিয়ে দিতে হয়েছিল ম্যানিলা বন্দরে।

এ ব্যাপারে রাসবিহারীর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনিও ১২৯টি পিস্তল ও ২০৮৩০ বুলেট পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন সাংহাই থেকে, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত সে সব অস্ত্রশস্ত্রও ধরা পড়ে যায় ব্রিটিশের হাতে। এ সম্বন্ধে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে কি বক্তব্য রয়েছে দেখা যাক।

'There is reason to believe that this or a similar plot was hatched in consultation with Rash Behari Basu, who was then Nielsen's house, for pistols which Rash Behari wished to send to India were obtained by a Chinaman from the Mai Tah dispensary, 108, Chao Tung Road (Shanghai) which was one of Nielsen's addresses recorded in the note book.' [S. C. Report]

অর্থাৎ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করেই যে উক্ত পিস্তল পাঠানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। রাসবিহারী তখন নিলসেন-এর গৃহেই বাস করতেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে যেসব পিস্তল ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা গৃহীত হয়েছিল একজন চীনাম্যানের মাধ্যমে। জায়গাটা হল—মাই টা ডিস্পেন্সারী। ঠিকানা—১০৮ নং চাও টুঙ রোড, সাংহাই। নিলসেন-এর কয়েকটি ঠিকানার মধ্যে এই ঠিকানাটিও অবনী মুখাজীর নোটবুকে লেখা ছিল।

ম্যাভারিক জাভা উপকূলে ধরা পড়েছিল সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি। ততদিন ম্যাভারিক আবার ফিরে চলেছে মার্কিন মুলুকের দিকে।

কারণ, জাহাজের নাবিকদের বেশীর ভাগই ছিল ভারতীয়। জার্মান কনসাল হেন ফেরিক তাঁদের শত্রুপক্ষ ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তাই তাঁর ইচ্ছা—অ্যানি লারসনের মত ম্যাভারিকও মার্কিন দখলে চলে যাক, তবু ব্রিটিশের হাতে কিছুতেই নয়।

মল্লিকা, এবার কিন্তু একজন নতুন যাত্রী দেখা গেল এই ম্যাভারিক জাহাজে। কে এই নতুন যাত্রী।

না, নরেন ভট্টাচার্য বা সি. মার্টিন নন। এবার তিনি হরিসিং। এম. এন. রায় বা মানবেন্দ্র নাথ রায় তিনি হয়েছিলেন আরো পরে—মার্কিন দেশে গিয়ে।

এদিকে তখন জোর পুলিশী তৎপরতা শুরু হয়েছে কলকাতায়।

প্রথমেই তাদের চোখ পড়েছে ভুয়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হ্যারি অ্যান্ড সন্স-এর দিকে। ওদের নামে বারবার এত ড্রাফট্ আসছে কেন বাটাভিয়া থেকে? কি সাপ্লাই করে ওরা বাটাভিয়াতে?

হিসেব করে দেখা গেছে, এ পর্যন্ত মোট তেত্রিশ হাজার টাকা ওরা পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সম্প্রতি আরো দশ হাজার টাকা এসেছে বাটাভিয়া থেকে।

উঁহু, টাকাটা এখন ওদের হাতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আগে অনুসন্ধান করে দেখা যাক যে, কি ব্যাপার। তারপর অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে।

৭ই আগস্ট পুলিশ হানা দিল হ্যারি অ্যান্ড সন্স ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। গ্রেপ্তার করা হল প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজনকে।

'On the 7th August the police, on information received searched the premises of 'Harry & Sons' and effected some arrests.' [S. C. Report : p-83]

তল্লাসির ফলে পাওয়া গেল কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র। আর পাওয়া গেল বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত একটি মারাত্মক চিঠি। সেই সঙ্গে আরো জানা গেল যে, হ্যারি অ্যান্ড সন্স-এর কার্যাবলী শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর আরো একটি শাখা অফিস রয়েছে বালেশ্বরে। নাম তার 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম।'

চলো এবার বালেশ্বরে। দেখা যাক কি ব্যাপার। ব্যাপার কিন্তু সত্যিই গুরুতর। সরকারী রিপোর্টের ভাষায় :

'On the 4th September the 'Universal Emporium at Balasore a branch of 'Harry & Sons' was searched as also a revolutionary retreat at Kaptipada 60 miles distant where a map of Sunderbans was found together with a cutting from Penang area about tha Maverick.'

[Sedition Committee Report : p-83]

অর্থাৎ—৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম সার্চ করা হয়। এটা হ্যারি অ্যান্ড সন্স-এরই একটি শাখা। এ ছাড়া শহর থেকে বিশ মাইল দূরে বিপ্লবীদের আস্তানা বলে পরিচিত কাপ্তিপদাতে তল্লাসি চালানো হয়। ওখানে সুন্দরবন অঞ্চলের মানচিত্র এবং পেনাং-এর একটি সংবাদপত্রের কাটিং পাওয়া যায়, যার মধ্যে ম্যাভারিক জাহাজ সম্পর্কে খবর ছিল।

সন্দেহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল। নিশ্চয়ই বিপ্লবীরা কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে। যে করে হোক, তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। এ সুযোগ কোন রকমেই হাতছাড়া করা চলবে না।

প্রথমেই ঢোল সহযোগে প্রচার করা হল একটি লোভনীয় খবর। এ অঞ্চলে কয়েকজন ভদ্রবেশী ডাকাত এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার।

মনে মনে হাসলেন গেরুয়াবসনধারী সাধুবেশী বাঘা যতীন। পাশে সর্বক্ষণের ছায়াসংগী চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জন। তিনজনই তখন বাস করছেন মহলডিহা আস্তানায়।

নীরেন ও জ্যোতিষ পাল রয়েছেন অন্য আস্তানা—তালডিহাতে। তারা নাকি ব্যবসা করতে এসেছেন এ অঞ্চলে। তাই বলা হয়েছিল ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের।

পুলিশী তৎপরতা সম্বন্ধে কিছুই অজানা ছিল না বাঘা যতীনের। কেন যে হাতির পিঠে চেপে কলকাতার চার্লস টেগার্ট, বালেশ্বর উপকূল ব্যাটারী বাহিনীর কমাণ্ডার রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি প্রমুখ সবাই এ জংগলে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তা সবই তিনি জানতে পেরেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে। স্পষ্টই বুঝে নিয়েছিলেন যে, সংগ্রাম আসন্ন।

অবশ্য ইচ্ছা করলে সামনের এই জংগলের মধ্য দিয়ে অনায়াসেই অন্যত্র সরে যাওয়া যায়। কিন্তু না, তা হয় না। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 'ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র' আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতির সামনে একটা আদর্শ রেখে না গেলে হয়তো এই সাময়িক ব্যর্থতা বিপ্লবীদের মনে প্রচণ্ড হতাশার সৃষ্টি করবে। তাই আত্মগোপন নয়, চাই সংগ্রাম। মুখোমুখি সংগ্রাম।

নীরেন ও জ্যোতিষ পাল তখন তালডিহাতে। তাই ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর রাত্রেই বাঘা যতীন রওনা দিলেন তাঁদের সংগে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে। এখন আর আলাদা নয়। সবার এখন একসংগে থাকা দরকার।

এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই টেগার্ট এসে হানা দিলেন বাঘা যতীনের মহলডিহার আস্তানায়। কিন্তু কোথায় তখন বাঘা যতীন। তার আগেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন নীরেন ও জ্যোতিষ পালের উদ্দেশ্যে।

গভীর রাত্রে আবার নিজের আস্তানা মহলডিহাতে ফিরে এলেন বাঘা যতীন। সংগে চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, জ্যোতিষ পাল প্রমুখ সবাই। সবারই চোখেমুখে দৃঢ় সংকল্পের রেখা। আমরা আত্মসমর্পণ চাই না, লড়াই চাই।

৮ই সেপ্টেম্বর।

সারাদিন কেটে গেল গভীর জংগলে। রাত্রে সারাক্ষণ পায়ে হেঁটে ভোরবেলা বালেশ্বরের উপকণ্ঠে। তারপরই দেখা দিল আসল বিপদ। এক সংগে পাঁচ জনকে দেখেই সহজ সরল গ্রামবাসীরা রব তুলল—ডাকাত! ডাকাত! এই সেই স্বদেশী ডাকাত।

—তোমরা ভুল করছ ভাইসব। বোঝাতে চেষ্টা করলেন ওরা পাঁচজন, আমরা ডাকাত নই। তোমাদের মতই সাধারণ লোক। পথ ছেড়ে দাও।

কেউ কান দিল না তাদের কথায়। সরকারের কথা কি কখনো মিথ্যে হতে পারে। সুতরাং, ডাকাত না হয়েই এঁরা যায় না।

ততক্ষণে রাজ মোহান্তি নামে জনৈক গ্রামবাসী শক্ত করে চেপে ধরেছে চিত্তপ্রিয়কে। ব্যাস, আর তাকে পায় কে! পুরস্কারের টাকাটা হাতে এসে গেল বলে।

বাধ্য হয়েই তখন মাউজার পিস্তল চালাতে হল চিত্তপ্রিয়কে। ফলে যা হবার তাই হল। এ জীবনে আর পুরস্কার নিতে হল না রাজ মোহান্তিকে।

কিছুতেই কিছু হল না। যেখানে পাঁচজন, সেখানেই জনতার ভীড়। ঐ যে সেই ভদ্রবেশী ডাকাতের দল। শিগগীর সাহেবদের খবর দাও।

শেষ পর্যন্ত সাঁতার কেটে বুড়িবালাম নদীর ওপারে গিয়ে চাষ খণ্ডের একটা শুকনো ডোবার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ওঁরা পাঁচজন। ক্ষুধা ও অনিদ্রায় সবাই তখন রীতিমত অবসন্ন। সুতরাং, আর নয়। যা হবার এখানেই হয়ে যাক।

তাছাড়া জায়গাটা যুদ্ধের পক্ষে খুবই উপযোগী। সামনে উঁচু ঢিবির মত বাঁধ। মনে হয়, প্রকৃতি যেন আগে থেকেই চমৎকার একটি পরিখা খুঁড়ে রেখেছে তাঁদের জন্য।

ততক্ষণে চার্লস টেগার্ট, কমাণ্ডার রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি প্রমুখ সবাই এসে হাজির হয়েছেন ঘটনাস্থলে। সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ও সামরিক বাহিনী।

পরিখার আড়ালে ওরা পাঁচজন তখন প্রস্তুত। হাতে সেই মাউজার পিস্তল। ঐ যে ওরা বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে পরিখার দিকে। আর একটু আসুক। আর একটু। হ্যাঁ, এবার পাল্লার মধ্যে এসে গেছে। ফায়ার।

একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটা মাউজার পিস্তল গর্জে উঠল দিক-বিদিক কাঁপিয়ে। তারপর সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। কোথায় গেল পুলিশ, আর কোথায় রইল সেনাবাহিনী। গুলি খেয়ে সবাই তখন ভোঁ দৌড়।

ভগ্নব্যূহ পুনর্গঠন করে আবার এগুতে চেষ্টা করলেন শ্বেতাঙ্গ সমরবিদগণ। কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। এমনি করে বহুক্ষণ। তবু কোনদিক থেকে এতটুকু সুবিধা করতে পারলেন না শাসক সম্প্রদায়।

অগত্যা নতুন এক কৌশল অবলম্বন করলেন শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণ। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ওদের পিছনের দিকে চলে যাও। না, পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর পোশাকে নয়, কৃষকের ছদ্মবেশে। তারপর দুদিক থেকে আক্রমণ

চালাও।

এদিকে ও'রা পাঁচজন তখন নিশ্চিন্ত। লক্ষ্য তাঁদের পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে। কিন্তু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশবাহিনী যে চোরের মত পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবে, একথা বুঝি তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হল না। চিত্তপ্রিয় তখন রীতিমত বেপরোয়া। দৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে নিবদ্ধ। আসুক পুলিশ। আসুক মিলিটারী। হাতে যতক্ষণ মাউজার পিস্তল রয়েছে, ততক্ষণ ভাবনা কি।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার। সহসা পিছন দিক থেকে ছুটে আসা একটা বুলেটের আঘাতে চিত্তপ্রিয় লুটিয়ে পড়লেন বাঘা যতীনের কোলের ওপর।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাঁর প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাঘা যতীন।

এই সেই চিত্তপ্রিয়, যিনি একদিন তাঁর একান্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য নীরোদ হালদার এবং সুরেশ মুখাজীকে শাস্তি দিয়েছিলেন নিজের হাতে। কত অসহায়ভাবেই না এখন তিনি লুটিয়ে রয়েছেন তাঁর কোলের মধ্যে। বিশ্বাসই যেন হয় না।

চোখের পলকে আর এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল পেছন থেকে। এবার লুটিয়ে পড়লেন স্বয়ং বাঘা যতীন। একটা গুলি তাঁর তলপেট ভেদ করে চলে গেছে।

অন্যটা লেগেছে বাঁ হাতে। তারপর জ্যোতিষ পাল। তাঁকেও এবার ধূলিশয্যা নিতে হল গুরুতরভাবে আহত হয়ে।

চিত্তপ্রিয় নিহত। বাঘা যতীন এবং জ্যোতিষ পাল দুজনেই গুরুতর আহত। বাকি রইলেন মনোরঞ্জন এবং নীরেন, যাঁরা ছিলেন একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

পরের কাহিনী নীরেনের ভাই প্রখ্যাত বিপ্লবী-সাহিত্যিক অমলেন্দু দাশগুপ্তের লেখনী থেকেই আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'যতীন মুখাজী কহিলেন, 'গুলি বন্ধ কর, সাদা রুমাল ওড়াও।'

জীবনে এই প্রথম নীরেন্দ্র তাহার নেতার আদেশ অমান্য করিল। বলিল—'না, মরার আগে পিস্তল বন্ধ করব না।'

মনোরঞ্জন সায় দিয়া বলিল—'না, তা হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি গুলি থাকবে, ততক্ষণ লড়ব।'

উপর দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ভূলুণ্ঠিত সিংহ বলিলেন—'I order, stop firing. আমি তোমাদের মরতে দিতে পারি না। গুলি বন্ধ কর।'

নেতার হুকুম। সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মৃত্যু হইতে তিনি তাহাদিগকে

বর্ণিত করিলেন। সাদা চাদর ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে এবং প্রান্তরে পঞ্চবীরের সম্মুখ যুদ্ধ শেষ হইল।

হাসপাতালে যতীন মুখার্জী বলিয়াছিলেন—'সমস্ত কিছুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।'

টেগার্ট সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আর কিছু বলবেন?'

যতীন মুখার্জী তখন বললেন—'Yes, tell the people of Bengal that Chittapriya Ray and I sacrifice our lives in vindicating the honour of Bengal.'

ইহাই বাংলার বীরের শেষ কথা।

টেগার্ট সাহেব কথাটা মনে রাখিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, 'আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি। I have great respect for Jatin Mukerjee. He is the only Bengali who fought from the trench.'

এ গেল ইংরেজ চরিত্রের মহৎ দিক। কিন্তু আর একটি দিকও আছে। বালেশ্বরের ঐ চাষখণ্ড নামক প্রান্তরে ছোট্ট একটি স্মৃতিস্তম্ভ তুলিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহাতে নাকি এই কথা খোদিত করিয়াছেন: 'Here lies notorious Chittapriya.'

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ছত্রপতি শিবাজীকে 'তস্কর' বলিয়াছিলেন। চিত্তপ্রিয় তাহাদের কাছে Notorious (কুখ্যাত) হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।' [মাদারীপুরের তিন বন্ধু: অমলেন্দু দাশগুপ্ত: আনন্দবাজার, ৯-৯-১৯৪৭।]

সাদা রুমাল দেখেই সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলেন টেগার্ট প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ। সঙ্গে সঙ্গে আহত দুজনকে তারা পাঠিয়ে দিলেন বালেশ্বর হাসপাতালে।

জ্যোতিষ পাল সম্বন্ধে আশঙ্কার তেমন কোন কারণ নেই। হয়তো এ যাত্রা বেঁচে গেলেও বা যেতে পারেন। কিন্তু বাঘা যতীনের অবস্থা সত্যিই গুরুতর। কখন কি হয় বলা মুস্কিল।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল।

তখনো রাতের অন্ধকার ভাল করে কাটেনি। সবে মাত্র ফর্সা হয়ে উঠেছে পূব আকাশটা।

ধীরে ধীরে এক সময়ে চোখ মেলে তাকালেন বাঘা যতীন। বললেন—একটু জল।

তাড়াতাড়ি মুখের সামনে জল তুলে ধরলেন চার্লস টেগার্ট।

বারেকের জন্য পরিপূর্ণভাবে তাকালেন বাঘা যতীন। তারপর কি ভেবে বললেন—না, থাক।

আর কোন কথা নয়। কোন উত্তরও নয়। সব কথা, সব উত্তরই বুঝি হারিয়ে গেল মৌন রাতের অন্ধকারে।*

স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করে বিপ্লবী বীর চলে গেলেন। কিন্তু নীরেন! মনোরঞ্জন! জ্যোতিষ পাল! তাঁদের কি হল?

১লা অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইবুনালে শুরু হল বিচার।

আসামী মোট তিনজন। বিচারকের সংখ্যাও তিনজন। মিঃ ম্যাকফারসন, সাবজজ দয়ানিধি পাত্র এবং কটকের উকিল রায় বাহাদুর নিমাই মিত্র। অভিযোগ—নরহত্যা এবং মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে আসামীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা।

খবর শুনে বহুদূরে অবস্থিত আত্মীয় পরিজনের তখন কি দুঃসহ অবস্থা। 'আজও মনে আছে, পূজার ছুটির কিছুদিন আগেকার এক সন্ধ্যার ব্যাপার। মাদারীপুরে বিকালের দিকে খবরের কাগজ আসিত। একখানা 'বেঙ্গলী' (বাংলা) পত্রিকা লইয়া বৈঠকখানার কর্তারা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। মিনিট কয়েক পর অন্দরেও খবর গেল। সমগ্র দেশে শোকের এবং দুঃখের একটা কালো ছায়া নামিয়া আসে। সেদিনকার পত্রিকায় বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যু, যতীন মুখার্জীর আহত হওয়া এবং নীরেন, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষের গ্রেপ্তারের খবর ছিল।

...সিদ্ধান্ত হইল যে, নীরেন্দ্রের এক কাকা (মাদারীপুরের উকিল অন্নদাচরণ দাশগুপ্ত), মনোরঞ্জনের অগ্রজ প্রফুল্ল সেন (মাদারীপুরের শিক্ষক) একজন চাকরসহ বালেশ্বরে যাইবেন মোকদ্দমার তদ্বির ও ব্যবস্থা করিতে।

কিছুদিন পরে তাঁহারা বালেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মোকদ্দমার রায় তখনও বাহির হয় নাই। খবর পাওয়া গেল যে, বালেশ্বরে তাঁহারা অনেক চেষ্টায়ও থাকিবার স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভয়ে কেহ বাড়ি ভাড়া দিতে রাজী হয় নাই।

শেষে গোয়ালঘরের মত একটা স্থানে এই তিনজন একটু থাকিবার স্থান পায়। খাদ্যাদি সম্বন্ধেও একই অভিজ্ঞতা। ভয়ে সমগ্র বালেশ্বর সন্ত্রস্ত ছিল। বাঙালী যুবকদের আত্মীয়দের আশ্রয় দেওয়া এবং সাহায্য করার সাহস

---

* সেদিন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে—বাঘা যতীন ১০ই সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেছিলেন হাসপাতালে। প্রতি বছর বালাশোর কমিটিও বাঘা যতীন দিবস পালন করে থাকেন এই একই তারিখে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসে বলা হয়েছে—৯ই সেপ্টেম্বর ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হয়েছিলেন পুলিশের গুলিতে।

কাহারও ছিল না।'　　　　[আনন্দবাজার : ৯-৯-১৯৪৭]

নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ পালকে সেদিন কি অবস্থায় দেখে এসেছিলেন তাঁরা! অমলেন্দু দাশগুপ্তের লেখনী থেকেই তার বিবরণ কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি :

'কোন ডর ভয়, ভাবনা আছে মুখ দেখে কে মনে করবে। হাসি মুখে লেগেই আছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা মা সকলে কেমন আছেন! বললেন—ভাবছেন কেন! এতে মন খারাপ করার মত কি আছে! এমন তো হতে পারত যে, চিত্ত ও যতীনদার মত আমরাও গুলিতে মরে যেতে পারতাম।'

শেষ পর্যন্ত তাঁহারা থাকেন নাই। নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের অনুরোধেই চলিয়া আসিয়াছিলেন।'

রায় দেওয়া হল ১৯১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। উপেন ঘোষ, রজনীকান্ত পাল এবং কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার নিশীথ সেন আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও মনোরঞ্জন এবং নীরেনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। জ্যোতিষ পালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কারণ মামলায় প্রমাণিত হল যে, জ্যোতিষ নিজে কোন গুলি নিক্ষেপ করেন নি। তাঁর ভূমিকা ছিল—যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাউজার পিস্তলগুলি লোড্ করে দেওয়া।

'পূজার মধ্যেই টেলিগ্রাম আসিল যে, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আমাদের বাড়ির মণ্ডপের মাতৃ প্রতিমার মুখচ্ছবি দেখি নাই। কিন্তু পুকুরের দুই পাড়ের দু বাড়িতে সকলের মুখে শোকের ছায়া নামিল। পরিবারের দুইটি প্রাণ বলি দিয়া সেবারকার মাতৃপূজা আমাদে উদযাপন করিতে হইল।'　　[আনন্দবাজার : অমলেন্দু দাশগুপ্ত : ৯-৯-১৯৪৭]

২২শে নভেম্বর, ১৯১৫ সাল। ভোর পাঁচটা।

বধ্য মঞ্চের দিকে যেতে যেতে সে কি উল্লাস সেদিন নীরেন ও মনোরঞ্জনের।

চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন—তিনজনই মাদারীপুরের ছেলে। তাছাড়া মনোরঞ্জন ও নীরেন আত্মীয়ও বটে। তাই কে আগে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করবে তাই নিয়ে শুরুতেই দেখা গেল তাঁদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা।

মনোরঞ্জনের দাবী : আমি আগে রাঙাদা।

নীরেন তা মানতে রাজী নয়। তাঁর বক্তব্য : তা হয় না নোয়া। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ। এ সম্মান আমাকে দিতে হবে।

থেকেই জল খান। যারাই দেখেন, বিস্মিত হন।

পরের দিন সকালে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিং বাংলোয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডঃ সফিউদ্দিন কিচলু ও ডঃ সত্যপালকে আমন্ত্রণ করে পাঠান। তাঁদের কমিশনারের বাড়ির ভিতর গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর তাঁদের বেঁধে দুটো মোটরের মধ্যে ফেলে একটি শিকারীর দলের ছদ্মবেশে ব্রিটিশ প্রহরা দিয়ে কাংড়া জেলার ধরমশালায় সরিয়ে দেওয়া হয়।

নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ শহরে পেঁছুলে এক বিরাট জনতা 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে হল বাজারে জমা হয়। শহর প্রাচীরের ওপাশে খোলা জায়গা; আর ওই খোলা জায়গা ও সিভিল লাইনস্‌এর মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে দিল্লী থেকে লাহোর অভিমুখে প্রধান রেলপথ।

দুটি রেল ব্রিজে ও একটি লেভেল ক্রশিংএ অশ্বারোহী প্রহরা মোতায়েন। শহরের তিনটি তোরণদ্বার দিয়ে জনতা গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। অমৃতসরের ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট্ অব পুলিশ বর্ণনা করেছেন—সব জায়গাটা ভরতি হয়ে উপচে গেল।

হান্টার কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে দেখিয়েছে: 'জনতার হাতে ছড়ি, লাঠি কিছু ছিল না।...এটা স্বীকৃত সত্য যে, ওই জনতা শহর থেকে বেরিয়ে ব্রিজের দিকে যেতে যেতে পথে যে সব ইয়োরোপীয়ের দেখা পায় তাদের কারোর প্রতি কোন দৃকপাত করেনি। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার এই জনস্রোতের পাশ দিয়ে যান; তাঁকে কোন লাঞ্ছনা করা হয়নি।'

মাইলস্ আরভিং হলগেট রেলব্রিজ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'জনতা অত্যন্ত গোলমাল করছিল; ক্রোধোন্মত্ত জনতা।' সৈন্যবাহিনী জনতার উপর গুলি চালায়। মাইলস্ আরভিংএর উক্তি অনুযায়ী তাঁর সহকারী কমিশনার বেকেট্ গুলি চালাবার হুকুম দেন। বেকেট্ বলেন, কোন আদেশ দেওয়া হয়নি।'

ক্যাপ্টেন মাসে বলেছেন যে, লেঃ ডিকি নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি রিজার্ভ পার্টি এনেছিলেন এবং তিনি যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন, জনতার প্রতি গুলি চালাবার নির্দেশ দিলেন। জনগণ মৃত ও আহতদের নিয়ে শহরে ফিরে এল। জনতার একটি অংশে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অফিসে ঢুকে পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা করল, কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও সরকারী ভবনে আগুন লাগিয়ে দিল।

১০ই এপ্রিল রাত ১০-৩০টায় লাহোর থেকে আরো সেনা এসে পড়ল। ১১ই এপ্রিল অমৃতসর নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করল। আরভিং পরে এ ব্যাপারটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

বাহ্যত হয়তো 'সরকার' ছিল, কিন্তু ভিতরে আসলে হিন্দু-মুসলমানকী হুকুমৎ চালু হয়ে গিয়েছিল। লাহোর থেকে আদেশ পেয়ে জেনারেল ডায়ার ও তাঁর সঙ্গীরা ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় মোটরে জলন্ধর থেকে রওয়ানা হয়ে তিনঘণ্টায় অমৃতসরে এসে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ডায়ার শহরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। তার প্রধান ফলশ্রুতি হল, ওই ১১ই এপ্রিলই মধ্যরাত্রে আরভিং জেনারেল ডায়ারকে একটি স্বাক্ষরিত আদেশ দিলেন। এই আদেশে বলা হল—কোনরকম জন সমাবেশ, শোভাযাত্রা করতে দেওয়া হবে না। সব জমায়েৎএর ওপরই গুলি চালানো হবে।

১২ই এপ্রিল প্রত্যুষে জেনারেল ডায়ার বিমানে করে শহর পর্যবেক্ষণ করবার ব্যবস্থা করলেন। বেলা ১০টার সময় তিনি হাতের কাছে যে সব সৈন্যকে পেলেন, তাদের ও দুটি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে শহরের ভিতর দিয়ে মার্চ করে চললেন। প্রত্যেক জায়গায় শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হল। জনগণ ধ্বনি দিল—'হিন্দু-মুসলমান কী জয়।'

সন্ধ্যায় জেনারেল সব সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এক ঘোষণা জারি করে জানালেন—'সামরিক আইন অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ওরকম সভা-জমায়েৎ ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।'

১৩ই এপ্রিল সকাল ৯টায় জেনারেল ডায়ার আবার তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহর টহলে বেরোলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা প্রচার করলেন : 'শহরে কিংবা শহরের একাংশে বা বাইরে রাস্তায় কোন শোভাযাত্রা কোনসময় বের হতে দেওয়া হবে না। রাত ৮টার পর কাউকে পথে দেখা গেলে গুলি করা হবে।'

জেনারেল ডায়ার সদলবলে যে সব পথ দিয়ে গেলেন, সে পথে তার অল্প কিছুটা পিছনে একটা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চলল : 'এদিন সন্ধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা হবে ; গুলি চালানো হবে, এরকম ভয় করার কারণ নেই'।

বিকাল চারটার সময় রিহিল জেনারেল ডায়ারকে খবর দিলেন, এর মধ্যেই হাজার মানুষের ওপর এক জনতা এদিন সন্ধ্যায় ঘোষিত সভার জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগে জমা হয়েছেন। একটি সিনেমার ম্যানেজার লিউইস্ ছদ্মবেশে শহর ঘুরে এসে ওই খবরের সত্যতা সমর্থন করে আরো জানালেন, বিপুল সংখ্যক মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে আসছেন।

জেনারেল ডায়ার ও তাঁর অফিসাররা একটা খোলা গাড়িতে জালিয়ানওয়ালাবাগ রওয়ানা হলেন। আগে আগে চলল দুজন অশ্বারোহী পুলিশ, পিছনে দুটি সাঁজোয়া গাড়ি। তার আগে ও পিছনে সৈন্যরা মার্চ করে এগোতে

রক্ত—১০

লাগল। সংকীর্ণ পথ দিয়ে তারা চলল,—শেষ পর্যন্ত বাজারের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সেখান থেকে সাড়ে সাত ফুট চওড়া গলিটা জালিয়ান-ওয়ালাবাগে গিয়ে পৌঁছেছে।

মেসিনগান সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ি সে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জেনারেল ডায়ার সে দুটিকে সেখানেই পথের উপর ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদের দুই সারি করে সেই গলির ভিতর মার্চ করিয়ে নিয়ে চললেন। পথের শেষে এসে জেনারেল দেখলেন, স্কোয়ারটায় প্রচুর ভিড়; মঞ্চের উপর একজন বক্তৃতা করতে করতে হাতের নানা ভঙ্গী করছেন, আর সবাই শুনছেন।

সেই সরু পথটার ঠিক বাইরে একটা উঁচু প্লাটফরমের উপর তাঁর ডান ও বাঁ পাশে সেনাদের জায়গা নিতে আদেশ করলেন জেনারেল। হান্টার কমিটির সামনে জেনারেল ডায়ার এই মর্মে সাক্ষ্য দেন :

হান্টার : জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকে আপনি কি করলেন ?

ডায়ার : আমি গুলি চালালাম।

হান্টার : সঙ্গে সঙ্গে ?

ডায়ার : তৎক্ষণাৎ। ব্যাপারটা আমি ভেবে নিলাম এবং আমার কর্তব্য যে কী, সে সম্বন্ধে মনস্থির করে নিতে আমার ৩০ সেকেন্ডও লাগল না।

হান্টার : আপনার জানা-মত ওই লোকটির বক্তৃতা করা ছাড়া অন্য কোন অপরাধ ঘটেছিল কি ?

ডায়ার : না।

হান্টার : ওখানে পাঁচ হাজার বা আরও বেশী মানুষের ভিড় দেখে আপনার কি এরকম কোন সন্দেহ হয়েছিল যে, ওই লোকদের অনেকেই নিশ্চয়ই আপনার ঘোষণার কথা জানতেন না ?

ডায়ার : বেশ ভালভাবেই ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল···এরকম পরিস্থিতিতে খবর খুব দ্রুত ছড়ায়। তবে ওই সঙ্গে এমনও হতে পারে যে, অনেকেই ছিল, যারা আমার ঘোষণা শোনেনি।

রাসকিন : আপনার সেনাদের আক্রমণ করা হতে পারে, এ রকম কোন ধারণা বা বিবেচনা কি মনে জেগেছিল ?

ডায়ার : না। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর ছিল। আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে, তারা যদি সভা চালিয়ে যায়, আমি সবাইকে মেরে ফেলবো।

নারায়ণ : জনতার মধ্যে—এমনকি একজনের কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে কি আপনার খবর ছিল, না ছিল না ?

ডায়ার : না। তারা লাঠি দিয়েই কাজ হাসিল করতে যাচ্ছিল।

স্যার ভ্যালেনটাইন চিরোল এইভাবে ওই দৃশ্যটির বর্ণনা করেছেন :

"স্বচক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখা না থাকলে কারো পক্ষে সম্ভবত সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা বোঝা সম্ভব হবে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ একটা পতিত জমি। প্রায়ই মেলা, জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। জায়গাটার আয়তন হয় তো ট্রাফালগার স্কোয়ারের মতই হবে।

প্রায় পুরোটাই প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের বাইরের দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির পিছন দিকগুলো উঁচু মাথা তুলে রয়েছে। সে সব বাড়ির সামনে শহরের জনাকীর্ণ পথ।

প্রায় পঞ্চাশটি রাইফেল নিয়ে জেনারেল ডায়ার যে সরু গলি দিয়ে সেখানে ঢুকেছিলেন, আমিও সেই পথে ঢুকলাম। জেনারেল যে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সেখানেও উঠলাম।

ওখান থেকেই কোন রকম হুঁসিয়ারি না দিয়ে তিনি প্রায় একশ গজ রেঞ্জের মধ্যে ঘন ভিড়ের মধ্যে গুলি চালান; মঞ্চে যেখানে বক্তৃতা হচ্ছিল, সেটা ঘিরেই জনতা বেশী ভিড় করেছিল। সে জায়গাটা আরো ভিতর দিকে।

জেনারেল ছয় হাজার লোকের ভিড় বলে অনুমান করেছিলেন। অন্যরা অবশ্য ১০ হাজার বা তারও বেশী মানুষের জমায়েৎ হয়েছিল বলে মনে করেন। সে জনতা কার্যত নিরস্ত্র এবং আত্মরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কিন্তু জেনারেল দশটা মিনিট উপর্যুপরি সেই ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত অসহায় উদ্বেলিত জনতার উপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ করে যান।"

জেনারেল ডায়ারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সার্জেন্ট ডবলু. জে. অ্যান্ডারসন,—যিনি ওই ঘটনার সময় তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, ক'বছর পরে আর্থার স্যুইনসনকে (সূর্যাস্তের আর ছ' মিনিট দেরি—সিক্স মিনিটস্ টু সানসেট্ পুস্তকের লেখক) বলেছিলেন: "গুলি চালনা শুরু হলে জনতা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতে থাকে…তারপরই ছিটকে ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে যখন গুলি থামে, আমি খুব চাপা গোঙানি শুনতে পাই। ডায়ার নির্দিষ্ট জায়গাগুলি দেখিয়ে গুলি চালাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভয় পাইনি। ভয় পাবার মত কিছু দেখিওনি। জনতা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার এরকম কোন ভয় হয়নি। গুলিবর্ষণ শুরু হয় বিকেল ৫টা থেকে ৫-১৫ মিনিটের মধ্যে। জেনারেল ডায়ারের হিসেব হচ্ছে—দশ মিনিটেই তা শেষ হয়ে যায়।"

জেনারেল ডায়ারের আদেশ পেয়ে সেনারা যখন উঠে দাঁড়াল এবং রাইফেল কাঁধে ফেলে মার্চ করে বেরিয়ে গেল, প্রতাপসিং দেখলেন, অক্ষত রয়ে গিয়েছেন তিনি; তিনি খুবই সৌভাগ্যবান, দেওয়ালের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে সেনাদের বন্দুকের নিশানার বাইরে চলে যেতে পেরেছিলেন।

তিনি কংগ্রেসের উপসমিতির কাছে বলেন : সামরিক আইন জারি করে বা জনসভা নিষিদ্ধ করে ১৩ই এপ্রিল কোন ঘোষণা প্রচারিত হতে আমি শুনিনি। ওইদিন ও রকম কোন ঘোষণার খবর আমাদের বাজারেও পৌঁছোয়নি।

আমার ছেলেকে নিয়ে বিকেল প্রায় ৪টার সময় আমি জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছোই। হংসরাজ বক্তৃতা করেন। তিনি ডঃ কিচলুর একটি ছবি বসিয়ে ঘোষণা করেন, ওই ছবিই পৌরহিত্য করবে। গোপীনাথ জনগণের 'ফরিয়াদ' সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করেন।

আমি যা শুনলাম, তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা সরকার বিরোধী। আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, কোন লাঠি দেখিনি—যারা বসেছিল, কিংবা পরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যেও।

আর একজন যাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল, সেই লালা জ্ঞানচাঁদ বলেছেন,—গুলিবর্ষণ শেষ হলে সব বয়সের নিহত ও আহত ধরে প্রায় পাঁচ থেকে ছ'শ' জনকে রাস্তায়, বাগের বাইরে—চারিদিকে পড়ে থাকতে দেখলাম। একজন নীলামদার কুশলসিং হতাহতদের মধ্যে বহু ছোট ছোট শিশুকে দেখেন। তাঁর হিসাব হল, ওখানে ২০০০ এর মত নিহত ও আহত হয়।

মহম্মদ ইসমাইল বলেছেন : জায়গায় জায়গায় মৃতদেহের স্তূপ দশ থেকে বারো ফুট উঁচু হয়েছিল। বিশেষকরে কূপের কাছে ও বক্তৃতা মঞ্চের দিকে মৃতদেহের স্তূপ খুব বড় হয়। তিনি কংগ্রেসের উপ-সমিতির কাছে বলেন, তাঁর মনে হয়, ওখানে চার থেকে পাঁচশ' শিশু হাজির ছিল।

ধানীরাম বলেছেন, হাজারেরও বেশী আহত লোক সারারাত বাগে পড়েছিল। বাগে স্বামীর মৃতদেহের কাছে সারারাত ছিলেন রতনদেবী। তিনি বলেছেন, কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি তিন তিনবার কাছের বাজারে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, কার্ফু রয়েছে এ সময় ; বাইরে বেরোবার সময় নয় এটা।

স্যার হান্টার অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আরভিংকে জিজ্ঞেস করেন : 'জনতার উপর গুলি চালাবার পরিণতি কি ঘটল ?' মাইলস্ আরভিং উত্তর দেন : 'গোটা বিদ্রোহটা ভেঙে পড়ে।'

ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টির এই রকম অভিলাষ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে হান্টার কমিশনের সংখ্যালঘু রিপোর্টে বলা হয়েছে : 'আমাদের কোন সন্দেহই নেই যে, তিনি একটা ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং তার একটা নৈতিক দিকও ছিল ; কিন্তু যা অভিপ্রেত, তার বিপরীতই এটা। আসলে সব নির্দোষ মানুষ, যারা কোনরকম ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত নয়, নিছক একটি সভায় হাজির, তাদের এরকম নির্বিচারে হত্যা দেশের সর্বত্র গভীর

অসন্তোষ ও তীব্র মনোভাব সৃষ্টি করে; ব্যাপারটা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের অত্যন্ত প্রতিকূল এবং এই দাগ তুলতে হলে যথেষ্ট আয়াস করতে হবে ও দীর্ঘ সময় লাগবে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার অব্যবহিত পরেই দেশে রাজনৈতিক পটক্ষেপ দ্রুত বদলে চলল। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল, দেশে নেতৃত্ব মাথা তুলে উঠছে এবং নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য নতুন নতুন রীতি পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হচ্ছে।"

[আনন্দ বাজার: জালিয়ানওয়ালাবাগের ৫০ তম বার্ষিকী সংখ্যা: ৩০ চৈত্র, ১৩৭৫ সাল]

হান্টার কমিটির বক্তব্য শুনে সে কি অট্টহাস্য জেনারেল ডায়ারের। দুর্ভাগ্য, রাস্তাটা সরু বলে মেশিনগান দুটো ভিতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশী খুশি বোধকরি আর কেউ হতো না।

—ঠিক বলেছেন জেনারেল। সমর্থন জানালেন পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ার,—নেটিভদের উচিত শাস্তি হয়েছে।

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন বিলেতের হাউস অফ লর্ডস। বরং উল্টো তারা আরো অভিনন্দন জানালেন জেনারেল ডায়ারকে। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন বিলেতের অভিজাত শ্রেণীর মহিলাগণ। অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তারা শুধু অভিনন্দনই নয়, সেই সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড পুরস্কার দিলেন জেনারেল ডায়ারকে। ঠিক করেছেন জেনারেল ডায়ার। এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত।

মল্লিকা, এই হল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল বিপন্ন ব্রিটিশের সঙ্গে। এই হল তার পুরস্কার।

তবে ফল কিন্তু ভালই হয়েছিল। সেদিন বঙ্গভঙ্গ করে বাঙালীর ঘুম ভাঙিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। এবার গোটা ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙালেন জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত নরঘাতক জেনারেল ডায়ার। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দুটি উদ্ধত ইংরেজ সন্তানের অবদান মোটেই তুচ্ছ নয়।

নির্মম কালপ্রবাহ স্তব্ধ থাকে না। সব একদিন থিতিয়ে এল সময়ের স্রোতে। তা বলে তেরো বছরের কিশোর উধমসিং কিন্তু কোনদিনও ভুলতে পারেনি জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই রক্তাক্ত অধ্যায়কে। তাঁর এক কথা—বড় হয়ে এই জাতীয় অবমাননার বদলা আমি নেবো।

দীর্ঘ একুশ বছর বাদে—১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ তিনি সেই বদলা নিয়েছিলেন খাস ইংল্যান্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে। জেনারেল ডায়ার তখন

পরলোকগত। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের অপর দোসর গভর্নর মাইকেল ও' ডায়ার তখনো জীবিত। তাকেই সেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল উধমসিংএর অব্যর্থ গুলিতে। ১৯৪০ সালের ১লা জুন বীর উধমসিং প্রাণ দিলেন বিলেতের পেণ্টনভেলি জেলের ফাঁসিমঞ্চে।

১৯২০ সাল শেষ হল। এল ১৯২১ সাল।

এদিকে বিপ্লবীরা তখন চুপচাপ। ইতিমধ্যে আর একবারও আগুন ছড়ায়নি তাদের মাউজার পিস্তলগুলি।

কিন্তু কেন। কারণ, গান্ধীজী। ইতিমধ্যে অহিংসা মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটেছে ভারতের রাজনীতিতে। বিপ্লবীদের কাছে তাঁর একান্ত অনুরোধ—'অস্ত্র সংবরণ কর। আমাকে একটা বছর সময় দাও। কথা দিচ্ছি, এই এক বছরের মধ্যেই আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো।'

এ প্রসঙ্গে খোলাখুলিভাবেই তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন নাগপুর কংগ্রেসে :

'Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt non-violent non-co-operation.'

অর্থাৎ—ভারতবাসীর তরবারি নেই। থাকলে তাই আমি ব্যবহার করতে বলতাম। নেই বলেই বলছি, তোমরা অহিংস-অসহযোগের পথ গ্রহণ কর।

রাজী হলেন জেল থেকে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী নায়কবৃন্দ। বেশ, তাই হোক। সব পথই স্বাধীনতার পথ। দেখাই যাক না গান্ধীজীর কথামত একটা বছর অপেক্ষা করে।

নিশ্চয় তুমি একটু অবাক হয়েছ মল্লিকা। ভাবছ, পথ আলাদা, তবু কেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সেদিন রাজী হয়েছিলেন গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে?

উত্তর পাবে বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখনী থেকে। আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের টেকনিক, পটভূমি ও রূপ বদলে গিয়ে অভাবিত জীবন-স্রোতে বহমান সংগ্রাম সূচিত হয়েছে সারা ভারতবর্ষে।

বিপ্লবী নেতারা ধীর-মস্তিষ্কে দেশের নাড়ী স্পর্শ করতে চাইলেন। কিন্তু সশ্রদ্ধায় মহাত্মার অবদান স্বীকার করেও তাঁরা তাঁর মত ও পথ গ্রহণ করতে পারলেন না। হৃদয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় জয় করা যেতে পারে,

এ তো বিপ্লবীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। যীশুখৃস্ট রোমীও সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, গান্ধীজী যীশুকে অতিক্রম করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরদের হৃদয় স্পর্শ করবেন, এ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

অথচ বিপ্লবীরা আসমুদ্র-হিমাচলের এই অপূর্ব জন-জাগরণকে উপেক্ষা করতেও পারেন না। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, একদিক থেকে এই অহিংস আন্দোলন তাঁদের কর্মে সহায়ক হতে পারে। এই অহিংস-বাস পরিধান করে, অহিংস বর্ণ অঙ্গে মেখে ছদ্মরূপে তাঁরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন।

পুলিশকে ধোঁকা দেবার এ এক সহজ উপায়। অহিংস-আন্দোলনকে 'ক্যামোফ্লেজ' করে দল বেঁধে ওতে ঝাঁপিয়ে পড়া তাই মন্দ নয়। বিপ্লবের ক্যাডার তৈরি করার এ এক মহা সুযোগ।

...বিপ্লবী নেতারা অধিকাংশই ক্রমে ঠিক করলেন যে, কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাঁরা গণসংযোগ করবেন। বন্ধুদের বললেন, গুপ্ত সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে দ্রুত তালে চালিয়ে যেতে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপাততঃ কোন সশস্ত্র-অ্যাক্‌শান্ যেন না হয়! দেশব্যাপী বিরাট সংগঠন ঐ কংগ্রেসের মাধ্যমে গড়ে তুলে একদিন সশস্ত্র-বিপ্লবের ডাক তাঁরা দেবেন, ইতিপূর্বে কারো প্ররোচনায়ই কোনবিধ অ্যাক্‌শান্ নয়।

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃ—২২৮-২৩১]

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল; কিন্তু কোথায় স্বাধীনতা, কোথায় বা কি! বরং গান্ধীজী নিজেই তাঁর বহু-ঘোষিত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন চৌরিচৌরার ঘটনার ফলে।

অথচ কতই না সামান্য ছিল ব্যাপারটা। কথা ছিল ১৯২২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে।

ঠিক তার চারদিন আগেকার কথা। তারিখটা ছিল ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী।

সেদিন সত্যাগ্রহীদের একটা মিছিল যাচ্ছিল গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গাঁয়ের পথ ধরে। বাধা দিল পুলিশ। না, মিছিল যেতে দেওয়া হবে না এ পথ দিয়ে। এটা বেআইনী।

কথা কাটাকাটি থেকে বচসা। তারপর সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত থানায় আগুন ধরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতা। ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কয়েকজন পুলিশের হল মৃত্যু।

খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গান্ধীজী। সেই সঙ্গে শুরু করলেন অনশন। তাঁর মতে, এটা জাতির 'জঘন্যতম অধঃপতন' ছাড়া কিছুই নয়।

জেল থেকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিরাট এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কে কোথায় অহিংস থাকতে পারেনি, তার জন্য জাতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে কেন? এটা অযৌক্তিক।

ভ্রূক্ষেপও করলেন না গান্ধীজী। তাঁর মতে—এগুলো সব ডেড্ লেটার। কারণ, বন্দীদের কোন মত প্রকাশের অধিকার নেই।

যুক্তি শুনে সবাই হতভম্ব। এমন কি বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও সেদিন কম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়নি গান্ধীজীর এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে। সামান্য দু-একটি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

'From behind the bars of their prisons. Motilal Nehru and Lala Lajpat Rai sent long letters of remonstrance to the Mahatma, which he dismissed with the tactless comment that as prisoners they were 'civilly dead' and were not entitled to express an opinion...Even Jawharlal Nehru admits that Gandhi's accion brought about a certain demoralization.' [Mahatma Gandhi : Polak Brailsford Lawrence : p—153]

এবার শোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন ভাষ্যকার লুই ফিসারের কথা : 'মিঃ গান্ধীজী একটিমাত্র মুখের কথা বললে সেদিন সারা ভারতে বিদ্রোহ ঘটে যেত, কিন্তু তিনি তা বললেন না। পরিবর্তে, এতদিনের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত ত্যাগ ও দুঃখবরণ অহিংস নীতির বেদীমূলে নিক্ষেপ করা হল।'

দেখে দেখে আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ।

গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তা বলে আমাদের তো বসে থাকলে চলবে না। কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে। এক বছরের জায়গায় তিন বছর সময় দেখা হয়েছে। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার বুঝিয়ে দিতে হবে যে, প্রতিশ্রুতিমত এতদিন চুপচাপ থাকলেও আসলে আমরা কেউ ঘুমিয়ে নেই।

সবার আগে এগিয়ে এলেন গোপীনাথ সাহা। শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রনাথ সাহা রোডের গোপীনাথ সাহা।

তাঁর এক কথা—আলিপুর বোমার মামলায় স্বীকারোক্তি করে নরেন গোঁসাই শ্রীরামপুরকে কলঙ্কিত করেছে। আমি সেই শ্রীরামপুরকে কলঙ্কমুক্ত করব নিজের রক্ত দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত একদিন গিয়ে ধর্ণা দিলেন হ্যারিসন রোডে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে। দেশের কাজ করব বলে স্কুল ছেড়ে চলে এসেছি। এবার কাজ দিন।

যোগাযোগ হল বাংলার বিপ্লবী সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় 'মাস্টারমশাই' অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের সঙ্গে। তারপর একে একে সন্তোষ মিত্র (শহীদ), দেবেন দে, অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে। গোপীনাথ সবার প্রিয়। সবাই ভালবাসেন নিষ্ঠাবান কর্মী গোপীনাথকে।

গোপীনাথের টার্গেট—বিপ্লবী আন্দোলনের পয়লা নম্বর শত্রু পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। বড্ড বাড় বেড়েছে লোকটার। ওকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিতে হবে।

অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও দু-দুবার টার্গেট করা হয়েছিল চার্লস টেগার্টকে। একবার শ্যামবাজার অরফ্যানেজে, অন্যবার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে। আশ্চর্য, প্রতিবারই লোকটা বেঁচে গেছে ভাগ্যের জোরে।

গোপীনাথ তাই অত্যন্ত সতর্ক। ক্রমাগত পিছনে লেগে থেকে ইতিমধ্যেই টেগার্টকে তিনি চিনে নিয়েছেন ভাল করে। ক্ষুদিরামের মত ভুল করলে চলবে না। টেগার্টকেই চাই, আর কাউকে নয়। সব প্রস্তুত। এখন একবার পেলেই হয় পাল্লার মধ্যে।

পাওয়া গেল ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী।

সকালের দিকে প্রায়ই ময়দানের দিকে বেড়াতে যেতেন গোপীনাথ। কোন কোন দিন সঙ্গে থাকতেন অনন্ত সিংহ। কিন্তু সেদিন ছিলেন তিনি একা।

ফেরার পথে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সহসা কি দেখে চোখদুটো জ্বলে উঠল গোপীনাথের।

কে! কে ওখানে দাঁড়িয়ে শো-কেসের জিনিসপত্র লক্ষ্য করছে কৌতূহলভরে। টেগার্ট না! হ্যাঁ, তাই তো। যদিও চারিদিকে প্রচণ্ড কুয়াশা, তবু লোকটা টেগার্ট না হয়েই যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথের পিস্তল আগুন ছড়াল—দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! যদিও দ্বিতীয় গুলিতেই শেষ, তবু পর পর সাতটা গুলি করে তিনি ঝাঁঝরা করে দিলেন টেগার্টের সর্বাঙ্গ। অনেক রক্ত ও ঝরিয়েছে বাংলার মাটিতে। ওর ক্ষমা নেই।

কাজ শেষ করেই গোপীনাথ ছুটতে শুরু করলেন পার্ক স্ট্রীটের দিকে। কিন্তু এ কি! একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে ফলো করে আসছে যে! আবার আগুন ঝলসে উঠল—দ্রাম! ব্যস, স্টিয়ারিংয়ের ওপরেই মাথাটা এলিয়ে পড়ল ট্যাক্সি ড্রাইভারের।

সামনেই একটা গাড়ি। চোখের পলকে সেই গাড়িতে উঠে বসলেন গোপীনাথ। শিগ্‌গীর গাড়িতে স্টার্ট দিন। চলুন ওয়েলেসলী স্ট্রীটের দিকে। কি বললেন। যাবেন না। দ্রাম।

ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। এবার বাধা দিল একটা অফিসের দারোয়ান। উত্তর একটাই। অর্থাৎ—দ্রাম।

সামনেই একটা প্রাইভেট কার। ওটাতেই উঠে পড়া যাক। কিন্তু ওঠা আর হল না। গোপীনাথের সামান্য অসতর্কতার সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাড়ির মালিক মিঃ এ. ডব্লিও. অগ্‌। সেই সঙ্গে জনকয়েক পুলিশ কনেস্টবল।

ধরা পড়লেন গোপীনাথ। সঙ্গে পাওয়া গেল একটা মাউজার পিস্তল একটা রিভলবার ও বেশ কিছু বুলেট।

যথাসময়ে থানায়। গোপীনাথ নির্বিকার। সারা মনে তার একটা কুলপ্লাবী আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। টেগার্ট খতম। অনেক রক্ত সে ঝরিয়েছে বাংলার মাটিতে। এতদিনে তার খেলা শেষ।

কিন্তু একি! সহসা কি দেখে চমকে উঠলেন গোপীনাথ। কে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সেই মুখ। সেই কটা চোখ। সেই ধূর্ত চাউনি। কোথাও এতটুকু অমিল নেই। টেগার্ট! নিশ্চয় টেগার্ট।

হ্যাঁ, টেগার্ট। এত সতর্কতা সত্ত্বেও কুয়াশার জন্য ভুল করেছেন গোপীনাথ। চেহারায় কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও যাকে তিনি টার্গেট করেছেন, তিনি টেগার্ট নন, কিলবার্ণ কোম্পানীর মিঃ আর্নেস্ট ডে, শাসককুলের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের আদালতে শুরু হল বিচার। কাঠগোড়ায় গোপীনাথ। সর্বক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে। যেন কিছুই হয় নি।

কিন্তু উকিল। না, কোন দরকার নেই। গোপীনাথ নিজেই জেরা করবেন সাক্ষীদের।

সবশেষে সাক্ষ্য দিতে এলেন চার্লস টেগার্ট। লম্বা ফিরিস্তি তিনি দাখিল করলেন আদালতের কাছে। গোপীনাথ কোথা থেকে রিভলবার পেয়েছে; কে তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে, বৌবাজারের কোন বিপ্লবী নেতার বাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত—সব নাকি তার নখদর্পণে।

হা হা করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন গোপীনাথ। ব্লাফ! ব্লাফ! ব্লাফ! আসল সত্যটা আমার মুখ থেকেই বরং শুনে নাও। কেউ আমাকে রিভলবার দেয়নি। নির্দেশও দেয়নি কেউ কোনদিন। যা করেছি, নিজের অন্তরের তাগিদেই করেছি। এ ব্যাপারে আমিই আমার দল। আমিই আমার

নেতা। রিভলবারও সংগ্রহ করেছি আমিই। আমার অনেকদিনের সাধ, আমি নিজের হাতে তোমাকে হত্যা করব। দুর্ভাগ্য, তোমাকে মারতে গিয়ে ভুল করে একজন নিরপরাধ লোককে আমি মেরেছি। তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত, মর্মাহত।

একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন গোপীনাথ—হ্যাঁ, নিরপরাধ আর্নেস্ট ডে-র জন্য আমি দুঃখিত। আর দুঃখিত তোমার মত একজন ধূর্ত শয়তানকে মারতে পারিনি বলে। নিজের জন্য আমি বিন্দুমাত্র ভাবিনে। কারণ, আমি জানি যে, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার গোপীনাথের জন্ম দেবে। তারাই আমার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবে।

সাজা দেওয়া হল—প্রাণদণ্ড। গোপীনাথ তেমনি নির্বিকার। মৃত্যুকে থোড়াই পরোয়া করেন তিনি। ও তো তার কাছে একটা খেলা মাত্র।

আদেশ কার্যকারী হল ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ।

সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহচর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ থেকেই সেদিনের বিবরণ তোমাকে কিছুটা পড়ে শোনাচ্ছি :

'বেলা ১০টা-১১টা নাগাদ আমি ফরওয়ার্ড অফিসে যেতাম—সুভাষবাবুও ঐ সময় আসতেন। বেলা ৮টার সময় ফরওয়ার্ড-এর সাইকেল পিয়ন এসে খবর দিলে, সুভাষবাবু অফিসে এসেছেন—আমাকে ডাকছেন।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার অফিসে এসে দেখি, তাঁর অফিসঘরে দেওয়ালে টাঙান একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর গুন গুন করে গান গাইছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও—তারে বহিবারে দাও শকতি।'

সুভাষবাবুকে গান গাইতে আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি, ভারি মজা লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, এসেছি তা জানতে দিলাম না। তিনিও এত তন্ময় হয়ে ছিলেন যে, আমার আসাটা সত্যই জানতে পারেন নি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে যখন আমার দিকে চাইলেন, তখন সে মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সারা মুখে কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয় ঠিক তেমনি। দু'চোখের কোণে জল।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সুভাষবাবুর চোখে জল! এ যে ভাবতেও পারি না। সুভাষবাবু নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। আবেগকম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেল—জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি।'

আর কোন কথা তিনি বললেন না। আমার মনে হতে লাগল আরও কিছু তিনি বলুন—আরো—আরো কিছু। সুভাষবাবুকে এমন বিচলিত, এমন ব্যথাতুর, এমন ক্লান্ত যেন আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখলাম, তিনি স্নান সমাধা করেছেন—পরিধানে শুভ্র খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর—যেন বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান থেকে ফিরছেন।

সুভাষবাবু ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সামনের চেয়ারে বসেছি। সুভাষবাবু ভারী গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'একটা ওয়ার্ডার বাইরে এল, লোকটার সঙ্গে জেলে থাকতে পরিচয় হয়েছিল, জাতে সে আইরিশ। সে কি বললে জানেন?

'He played like a fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn.'

গোপীনাথের কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ হল না মল্লিকা। কারণ, গান্ধীজীর একটি স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত, যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আমি সংক্ষেপে বলছি তোমাকে।

গোপীনাথের ফাঁসি হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে।

সে বছরই মে মাসে দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে।

গোপীনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে গৃহীত হল এক প্রস্তাব। প্রস্তাবে বলা হল, যদিও কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান, তবু গোপীনাথের এই আত্মবলিদান ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।

খবর শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের মধ্যে এসব কেন! ওদের জন্য কেন আমাদের এই মাথাব্যথা!

ফলে পাল্টা প্রস্তাব আনা হল আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে। সেখানে নিহত আর্নেস্ট ডে-র জন্য শোকপ্রস্তাব গৃহীত হল, আর গোপীনাথের জন্য গৃহীত হল নিন্দা প্রস্তাব।

ক্ষুব্ধ হলেন দেশবন্ধু। তাঁর বক্তব্য: গোপীনাথ সব কিছুর ঊর্ধ্বে। প্রশংসা না হোক, মানবিক ধর্ম অনুযায়ী একটু সহানুভূতির কথাও কি তাঁর জন্য বলা যেত না?

উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেসে।

মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে গোটা করাচী কংগ্রেস সেদিন উত্তাল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের নওজোয়ান সভার তো কথাই নেই। তাঁদের অভিযোগ—এ পরিস্থিতির জন্য গান্ধীজীই দায়ী।

কেন তিনি দেশবাসীর দাবী অনুযায়ী বড়লাটের সংগে চুক্তি করার সময় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড রদের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেন নি? কেন তিনি বলেছিলেন—'এ চুক্তি সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হলে এমন কি সহিংস কাজের জন্য যাদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন বলে তিনি আশা করেন।' কোথায় গেল তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি?

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গান্ধীজী নিজে থেকেই এক প্রস্তাব আনলেন ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে। প্রস্তাবে বলা হল—কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান হলেও ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করছে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকে অংশ গ্রহণ করছে।

খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু গোপীনাথের দোষটা তাহলে কোথায়? কেন তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আমেদাবাদ অধিবেশনে?

একই জিজ্ঞাসা সুভাষচন্দ্রের। এ প্রসংগে তিনি তাঁর 'Indian Struggle' গ্রন্থে কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'This resolution was on the same lines as the 'Gopinath Saha resolution' adopted by the Bengal Provincial Conference in 1924, of which the Mahatma had strongly disapproved.'

হয়তো সেদিনের পরিস্থিতিতে এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাই উপসংহার টানতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছেন:

'The circumstances at Karachi was such that the resolution had to be swallowed by people who under ordinary circumstances would not have come within miles of it. So far as the Mahatma was concerned, he had to make his conscience some what elastic.' [Indian Struggle : p—206]

অর্থাৎ—গোপীনাথের বেলায় না হলেও করাচী কংগ্রেসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সেই একই প্রস্তাবের তিক্ত বটিকাটি গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল—যাঁরা আগে কোনদিন এ প্রস্তাবের ধারে কাছে ঘেঁষবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। মহাত্মাজী সেদিন নিজের বিবেককে একটু উদারভাবাপন্ন করে তুলতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী পালা অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর।

ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ার একটা জীর্ণ বাড়িতে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে ঐ বাড়িটা ছিল পলাতক বিপ্লবীদের

একটা গোপন আস্তানা।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হরিনারায়ণ চন্দ, রাখাল দে, অনন্তহরি মিত্র, রাজেন লাহিড়ী, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ অনেকেই তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই দোতলা বাড়িটাতে।

পলাতক জীবন অতি কঠিন, কঠোর। ভাল করে আহারও জোটে না সব দিন। অসুখ-বিসুখ যেন লেগেই রয়েছে। তবু কেউ চুপচাপ বসে নেই। বোমা তৈরীর কাজ সমানেই চলছে দিনে-রাতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হলে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। সেখানে বসে থাকবার মত অবকাশ কোথায়?

বাংলাদেশে তৈরী বোমার চাহিদা তখন সর্বত্র। পাঞ্জাব, দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস, আগ্রা—সবার এক দাবী—'বংগালকা মাল চাই।' 'অ্যায়সান চীজ কোই নেহি মিলে গা।'

ইতিমধ্যে ট্রেনিং নেবার জন্য বাইরে থেকেও এসে গিয়েছেন কেউ কেউ। যেমন—রাজেন লাহিড়ী। বেনারস ইউনিভার্সিটির এম. এস.-সি. ক্লাসের কৃতী ছাত্র রাজেন লাহিড়ী এসেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে। উদ্দেশ্য, হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করা।

কিন্তু টাকা! এতগুলো লোকের থাকা খাওয়া, তদুপরি বোমার মালমশলা কিনতে হলে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা?

নিজের বসতবাটি বিক্রি করে এগারো হাজার টাকা এনে দিলেন ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী। প্রফুল্ল বসু দিলেন বাড়ির যাবতীয় অলংকার। স্বাধীনতার চাইতে বাড়ি বা অলংকার বড় নয়। চালাও এবার কাজ। কোন রকমেই থেমে গেলে চলবে না।

তবু কোন স্থায়ী সুরাহা হল না। আরো চাই। অনেক, অনেক চাই। কি করা যায় এই পরিপ্রেক্ষিতে?

ঠিক হল—সরকারী টাকা লুঠ করতে হবে। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। কাজেও তাই করা হল। সেদিন নবদ্বীপ পোস্ট অফিস থেকে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসে প্রেরিত বেশ কিছু টাকা লুঠ হয়ে গেল ঘোড়ার গাড়ি থেকে।

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। স্বদেশী ডাকাত। নইলে প্রকাশ্য দিবালোকে শিমুলতলার মত জায়গায় এমন কাজ করার মত বুকের পাটা আর কার আছে?

এলো পুলিশ। এলো সেপাই শান্ত্রী। তদন্তও কিছু কম হল না। গাড়োয়ান এবং একে ওকে জেরা করে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করা হল একজনকে। তিনি হলেন অনন্তহরি মিত্র।

কিন্তু কোথায় অনন্তহরি মিত্র। সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। তারিখটা ছিল ১৯২৫ সালের ৬ই নভেম্বর।

শোভাবাজার-চীৎপুর রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে পরিচিত টিকটিকি নলিনীকান্ত রায়। সহসা কি দেখে তার চোখদুটো সজাগ হয়ে উঠল দারুণভাবে। ট্যাক্সিতে বসে কে ঐ লোকটি! কৃষ্ণনগর কেসের সেই অনন্তহরি না! সঙ্গে রয়েছে আরো দুজন। বীরেন্দ্র ব্যানার্জী আর ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী। কোথায় যাচ্ছে ওরা! কি ব্যাপার!

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির নম্বরটা টুকে নিতে ভুল হল না নলিনীকান্ত রায়ের। তারপরই সোজা পুলিশের দপ্তরে।

সেই রাত্রেই পুলিশ দপ্তরে ডাক পড়ল ট্যাক্সি ড্রাইভারের। বল, কোথায় তুমি নামিয়ে দিয়েছ ঐ যাত্রী তিনজনকে?

—আজ্ঞে বরাহনগর বাজারে। ওখানে গিয়ে ওরা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিল। তারপর কোথায় গেছে তা আমার জানা নেই।

—ঠিক আছে, কাল ভোরে তোমাকে নিয়ে আমরা বরাহনগর বাজারে যাব। তুমি সেই ঘোড়ার গাড়িটা আমাদের চিনিয়ে দেবে—তবেই তোমার ছুটি।

পরদিন ভোরে তাই করা হল। যথাস্থানেই পাওয়া গেল সেই ঘোড়ার গাড়িটাকে। গাড়োয়ানের জবাব—একটা পুকুরের ধারে ওরা নেমে গিয়েছিল হুজুর। তাছাড়া আর কিছু আমার জানা নেই।

—চলো, জায়গাটা দূর থেকে দেখিয়ে দেবে আমাদের।

আশংকা অপর পক্ষেরও কম ছিল না। জায়গাটা নিরাপদ নয়। অবিলম্বে এ আস্তানা ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাওয়া প্রয়োজন।

৯ই নভেম্বর চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী নৌকো নিয়ে এসে হাজির। চলো ভাই সব গঙ্গার ওপারে। আর এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

কার্যত তা আর সম্ভব হল না। মোট নয়জনের মধ্যে পাঁচ জনই সেদিন প্রবল জ্বরে অচৈতন্য। বাকী সবাই তাদের দেখা-শোনা নিয়ে ব্যস্ত। এ অবস্থায় অন্যত্র যাবেন কি করে? স্থানাভাবের দরুণ বাধ্য হয়েই সে রাত্রিটা চৈতন্যদেবকে আশ্রয় নিতে হল পাশের বাড়িতে।

ভোর পাঁচটা। কে যেন বাইরে কড়া নাড়ছে খট্‌খট্‌ করে।

এগিয়ে গেলেন বিপ্লবী তরুণ রাখাল দে। নিশ্চয় গয়লা এসেছে। তা ছাড়া কে কড়া নাড়তে আসবে এই সাত সকালে!

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল বিরাট এক পুলিশ বাহিনী।

সঙ্গে চব্বিশ পরগণার এডিশানাল সুপার মিঃ ডাকফিল্ড। হ্যান্ডস্ আপ্! একটু নড়েছ কি মরেছ।

একতলা থেকে দোতলায়। প্রথমেই ধরা হল উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত রাজেন লাহিড়ীকে। রাজেন লাহিড়ী। নামটা মনে রেখো মল্লিকা। পরে দরকার হবে।

মাঝের ঘরে প্রবেশ চ্যাটার্জী ও শিবরাম চ্যাটার্জী তখন জ্বরে অচৈতন্য। শিয়রে শুশ্রূষারত সেই পলাতক বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র। বারান্দায় দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল একে একে।

পূর্বদিকের ঘরে হরিনারায়ণ চন্দ্র, বীরেন্দ্র ব্যানার্জী আর নিখিল ব্যানার্জী। কারোরই তখন জ্ঞান নেই। তাই বাধা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র বেঁচে গেলেন চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, যিনি স্থানাভাবের দরুণ আশ্রয় নিয়েছিলেন পাশের বাড়িতে।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গেলেন শোভাবাজারে। ওখানেও একটি গুপ্ত ঘাঁটি রয়েছে পলাতক বিপ্লবীদের বসবাসের জন্য। ওদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। পুলিশ যে ওখানে গিয়েও হানা দেবে না তা কে বলতে পারে?

কিছুতেই কিছু হল না। তার আগেই ওখানে পুলিশ বাহিনী গিয়ে হাজির।

কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলেন চার নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থানকারী পলাতক বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী আর অনন্তকুমার চক্রবর্তী। কে কড়া নাড়ে? পুলিশ। পুলিশ। পুলিশ।

দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সবলে দরজা চেপে ধরলেন প্রমোদ চৌধুরী। না, এত শিগগির ধরা দিলে চলবে না। আগে ঐ মেঝেতে উপবিষ্ট শান্ত সমাহিত মানুষটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

—আপনি পালান। চাপা গলায় বললেন প্রমোদ চৌধুরী, পিছনের ঐ গরাদহীন জানালাটা দিয়ে গলিয়ে গিয়ে সোজা পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যান দেরী করবেন না।

লোকটি নির্বিকার। চারিদিকে অগুণতি পুলিশ, তবু তিনি তেমনি শান্ত। তেমনি সমাহিত। যেন কিছুই হয়নি।

—দোহাই আপনার, দেরী করবেন না। তাড়া দিলেন প্রমোদ চৌধুরী, আমাদের যা হবার হবে, কিন্তু আপনার এ সময়ে বাইরে থাকা প্রয়োজন। সারা দেশ আজ তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। এ ভাবে আপনাকে ধরা দিলে চলবে না। এক্ষুনি পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যান। ততক্ষণ আমি

ঠেকিয়ে রাখছি ওদের।

আস্তে আস্তে মানুষটি এবার এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। তারপর এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন একটু একটু করে।

ততক্ষণে পুলিশ ভেতরে ঢুকে গেছে দরজা ভেঙে। কিন্তু প্রমোদ চৌধুরী মরিয়া। শুরু হয়েছে ধস্তাধস্তি। আগে ঐ শান্ত লোকটিকে পালাবার সুযোগ দিতে হবে। ততক্ষণ ধস্তাধস্তি করে পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

শান্তশিষ্ট লোকটি ততক্ষণে উধাও। কে এই লোকটি। শুনে চমকে উঠো না যেন। লোকটি হলেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মহান বিপ্লবী—সূর্য সেন।

যথাসময়ে শুরু হল ঐতিহাসিক 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা।' আসামীর সংখ্যা মোট এগারোজন।

প্রমাণের অভাব ছিল না, তাই লঘু দণ্ডের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত প্রধান আসামী হিসেবে হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্তহরি মিত্র ও উত্তর প্রদেশ থেকে আগত রাজেন লাহিড়ীকে দেওয়া হল দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্তীর পাঁচ বছর। বাকি সবার তিন বছর।

রাজেন লাহিড়ীকে সঙ্গে সঙ্গেই আবার পাঠিয়ে দেওয়া হল উত্তর প্রদেশে। সেখানে আর একটি মামলায় তাঁকে দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। সে ইতিহাস তোমাকে আমি শোনাবো খানিকক্ষণ বাদে।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা শেষ হল। বন্দীদের স্থান হল আলিপুর জেলের বন্ধ ইয়ার্ডে।

এই বন্দীরাই সেদিন বিশেষ একটি মানুষের দেখা পেলে সমস্বরে গান ধরতেন :

'তোরে নেয় না কেন যম
এত লোকের গরু মরে
তোর বেলায় একি ভ্রম!'

মানুষটি হলেন আই. বি-র স্পেশ্যাল এস. পি. রায়বাহাদুর ভুপেন চ্যাটার্জী। বন্দীরা আদর করে ডাকতেন—'মামা।'

দেখাদেখি অন্যান্য সাধারণ বন্দী, জেলার, জেল সুপার সবাই তাকে ডাকতেন মামা বলে। এক কথায় যাকে বলে সরকারী মামা।

মামা কিন্তু এতটুকুও অসন্তুষ্ট হতেন না সবার মুখে এই সম্ভাষণটি শুনে। বলুক না। যত খুশি বলুক।

যাকে বলে নিপুণ অভিনেতা। বিশেষ করে পেটের কথা টেনে বের করতে

সত্যিই তাঁর জুড়ি ছিল না। এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে আস্তে আস্তে জাল ছড়াতেন যে, হাজার চেষ্টা করেও সে জালকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। বিশেষ করে অপরিণতবয়স্ক বন্দীদের পক্ষে।

ততদিনে লাল ঢ্যাড়া পড়ে গেছে মামার নামের পাশে। অনেক ক্ষতি করেছে লোকটা। আর ওকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না।

এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার প্রধান নায়ক শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ চন্দের বক্তব্য আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি।

'এই সময় ভূপেন চ্যাটার্জী নামে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশে এক ধূর্ত স্পেশাল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন।

গোয়েন্দাগিরির সুবাদে দেশের অনেক সর্বনাশ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাবও তিনি পেয়েছিলেন।

এই স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের একটি স্পেশাল কাজ হয়েছিল জেলে ঢুকে রাজবন্দীদের সঙ্গে কথা বলা। আর ঐ ফাঁকে তাঁদের মতিগতি লক্ষ্য করা, বিপ্লবীদের গোপন খবর জানবার ব্যবস্থা করা।

...বিপ্লবীরা সংকল্প করলেন, জেলের মধ্যে এসে গোয়েন্দাগিরি চালাবার জন্য গোয়েন্দা রায়বাহাদুরকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। ইংরেজ সরকার তাঁদের কারাদণ্ড দিয়েছে ; তাঁরা দণ্ড দেবেন ইংরেজ সরকারের পোষ্য রায়বাহাদুরকে।'

[মৃত্যুহীন : হরিনারায়ণ চন্দ : পৃ—৮৬]

কিন্তু রিভলবার। রিভলবার পাওয়া যাবে কোথায়। কি দরকার রিভলবারের। ঐ তো ওখানে একটা শাবল পড়ে রয়েছে। বোধ হয় সাধারণ কয়েদীরা কাজ করতে করতে ভুল করে ওখানে ওটা ফেলে গেছে। কায়দামত চালাতে পারলে ওটাই বা মন্দ কি। দেখাই যাক না।

২৮শে, মে ১৯২৬ সাল।

সেদিন বিকেলে মামাকে দেখেই বন্দীরা গান ধরলেন :

'তোরে নেয় না কেন যম
এত লোকের গরু মরে
তোর বেলায় একি ভ্রম।'

গান শুনে মামা হাসতে লাগলেন মিটিমিটি। কাছে দাঁড়িয়ে বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি। খানিক দূরে দুজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার মিঃ ব্রুমফিল্ড ও মিঃ লাভরি। মামার বন্দনাগীতি শুনে তারাও হাসতে লাগল বেশ প্রাণ খুলেই।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। বন্দীরা যে যার ওয়ার্ডে তালাবন্ধ। কিন্তু বাইরে যে একবার আসতেই হবে। নইলে মামাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে কি করে।

পরিকল্পনামত এগিয়ে এলেন নিখিল ব্যানার্জী। দরজাটা একবার খুলতে হবে সিপাহিজী। হাওয়ায় আমার কাপড়টা বাইরে গিয়ে পড়েছে। ঐ যে দেখো না তাকিয়ে।

তাকিয়ে দেখল সিপাহিজী। সত্যিই তাই। ঠিক আছে, তালা খুলে দিচ্ছি, চট করে তুলে নিন কাপড়টা।

—আরে মামা যে! নমস্কার জানালেন নিখিল ব্যানার্জী।

—হ্যাঁ, নমস্কার! কণ্ঠে দরদ ঢেলে জবাব দিলেন সরকারী মামা, 'শরীর-টরীর ভাল তো! কোন অসুবিধা হলে—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মামা। আচমকা এক ঘুষি খেয়ে মাথাটা তাঁর ঘুরে উঠল বন্ বন্ করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী পেছন থেকে শাবলের এক আঘাতে তার সেই মাথাটাকে দিলেন চূর্ণবিচূর্ণ করে।

পনেরো সের ওজনের শাবলের ঐ এক ঘা-ই যথেষ্ট। ফলে মাথা তো গেলই, অধিকন্তু একটা চোখ যে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ল, তার আর কোন হদিশই পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে জেলের পাগলা ঘণ্টি একটানা বেজে চলল বহুক্ষণ ধরে।

ছুটে এল সেপাই শান্ত্রীর দল। ছুটে এল জেলার, জেল সুপার, জমাদার, মেট্রন, ওয়ার্ডার ইত্যাদি সবাই। কিন্তু সরকারী মামা ভূপেন চ্যাটার্জী তখন কোথায়! তার আগেই সব শেষ।

আবার শুরু হল মামলা। আসামী—প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র, অনন্ত চক্রবর্তী, রাখাল দে, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী এবং আরো পাঁচজন। অপরাধ, জেলের অভ্যন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যা।

কিন্তু সাক্ষী! সাক্ষী কোথায়! না, হাজার প্রলোভনেও খুনী আসামী মতি স্বদেশীবাবুদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী নয়।

তবে কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডার মিঃ ব্রুমফিল্ড বা লাভার! আশ্চর্য, তারাও এ মামলায় সাক্ষ্য দিতে নারাজ। তাদের এক কথা—এমন আকস্মিক-ভাবে ব্যাপারটা ঘটে গেছে যে, আমরা স্পষ্ট করে কিছু দেখার সুযোগ পাই নি।

সময়টা বিকেল। তার আগেই জেনারেল লক আপ হয়ে গেছে। কয়েদীদের মধ্যে কারোরই সে সময় বাইরে থাকার কথা নয়। তাছাড়া ব্যাপারটা ঘটেছে এমন জায়গায়, যা watch tower থেকে পর্যন্ত দেখা যায় না।

তবু সাক্ষীর অভাব হল না। দণ্ডাদেশ থেকে মুক্তি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনকে দাঁড় করানো হল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। একজন

খাস সাহেব কয়েদী, অন্যজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তারা নাকি প্রত্যক্ষদর্শী।

রায় যা দেওয়া হল, তা বোধহয় কাজীর বিচারকেও হার মানায়। প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র ও বীরেন্দ্র ব্যানার্জীকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। আর রাখাল দে, ধ্রুবেশ চক্রবর্তী ও অনন্ত চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আরো মজা হল হাইকোর্টে। দেখা গেল, প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী বীরেন্দ্র ব্যানার্জী এবং আরো কয়েকজন একেবারে বেকসুর খালাস। তবে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের যা ছিল—তাই। অর্থাৎ—প্রাণদণ্ড।

কিন্তু অনন্তহরি মিত্র কি আদৌ জড়িত ছিলেন এ ব্যাপারে!

মোটেই না। তিনি তখন ছিলেন দোতলায়। তবু কোন কথা নয়। কোন প্রতিবাদও নয়। কারণ, দলীয় নীতি। অর্থাৎ—ফাঁসি বা দ্বীপান্তর যাই হোক না কেন, আমরা কোন করুণা ভিক্ষা করবো না বিদেশী শাসকদের কাছে।

'রায়বাহাদুরকে হত্যা করার ঘটনায় অনন্তহরি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু নিজেদের সিদ্ধান্ত মত তাঁর ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড মিললেও বিনা প্রতিবাদে, সানন্দে তা বরণ করে নিতে তিনি প্রস্তুত।

ফাঁসির আগের রাত থেকে সারা জেলে কারোর চোখে ঘুম ছিল না। মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া চলেছিল। শুধু বিপ্লবীরা নন, জেলের সাধারণ কয়েদীরাও ধ্বনি দিচ্ছিল সে রাত্রিতে।

১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। অতি প্রত্যুষে অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী হাসি মুখে বীরের মত, ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন।'

অনন্ত হরি ও প্রমোদরঞ্জন—দুজনেই মৃত্যুবরণ করলেন ফাঁসিমঞ্চে। কিন্তু এ মৃত্যু কেমন মৃত্যু! অন্যান্য রাজবন্দীগণসহ প্রখ্যাত বিপ্লবীনায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী তখন জেল ওয়ার্ডের দোতলার বারান্দায়। ওঁদের প্রাণ উৎসর্গের বর্ণনা তাঁর মুখ থেকেই বরং কিছুটা শুনে নাও।

"অতি ভোরে মশান ভূমিতে আলো জ্বলে উঠল। তারপর এল সশস্ত্র কতকগুলি সেপাই। তারা বধ্যভূমির চারিপাশে রাইফেলে সঙ্গিন লাগিয়ে দাঁড়াল।

তারপর এলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আরও কয়েকটি লোক। এরা বোধহয় সরকারের তরফ থেকে সত্যকার ফাঁসির সাক্ষী হতে এসেছিলেন। জল্লাদ ক্যারিক (Carrick) ও একজন ইয়োরোপীয় ওয়ার্ডার এসে হাজির হল।

জেলার বড় রায়ন সাহেব ও আর একজন ইয়োরোপীয় ওয়ার্ডার মায়ের জন্য সমর্পিতপ্রাণ বীর দুটিকে নিয়ে আসছিল। প্রত্যেকের হাতদুটি পিঠ-মোড়া করে হাতকড়ি দিয়ে বাঁধা।

অন্য ফাঁসির আসামীদের বাহু ধরে নিয়ে আসতে হয় বধ্যভূমিতে। তাদের পায়ে তখন তারা যেন চলতে পারে না—এমনই অশক্ত হয়ে পড়ে তারা মৃত্যুভয়ে। কিন্তু এরা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। যারা আনতে গিয়েছিল, গতিবেগে তাদের পিছনে ফেলে অনেকটা যেন ছুটে ছুটে আসছিল। মুখে অনবরত 'বন্দেমাতরম' ; 'ভারত মাতা কী জয়' ; 'স্বাধীন ভারত কী জয়'।

আর আমরা? আমরাও ক্রমাগত ধ্বনির পর ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিচ্ছিলাম। কখনও ভাবোচ্ছ্বাসে বলে উঠেছি 'চলেরে বীর—চলে' ; 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন'।

তাঁদের আনন্দোজ্জ্বল উল্লম্ফন-যুক্ত গতি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন চির রহস্য যে মৃত্যু—তাকে ভেদ করে তাদের প্রাপ্য বরণমালা পরায় পাগল হয়ে এই অসাধারণ প্রেমিকরা ছুটে চলেছে—মহামিলনভূমিতে, বধ্যভূমিতে নয়।

বীরেরা,—নানা, দেবতারা এল। ফাঁসির মঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াল। মুখে অবিরাম দেশমাতার জয়—বিপ্লবের জয়।

দেখতে দেখতে বিপুল হর্ষে তাঁদের বুকগুলো ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেল। তাঁদের পা দুটিতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হল, যেন তাঁরা পা ছুঁড়তে না পারে। ফাঁসুরে এইবার তাঁদের মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা সাদা টুপী পরিয়ে দিল। তারপর গলায় ফাঁস গলিয়ে কষে দিতে লাগল।

শেষকালে "ব" মাত্র শোনা গেল। আমরাও সময় বুঝে মাতৃভূমির সন্তান বীর আবার আসিও ফিরে' বলে ফুলের তোড়া দুটি তাঁদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ফুল ছড়াতে লাগলাম। ততক্ষণে সুপারিন্টেন্ডেন্ট কোটের পকেট থেকে রুমাল তুলে ইঙ্গিত করতে ফাঁসুরে ক্যারিক লেভার (ফাঁসিকলের লোহা) টেনে দিয়েছিল। দেশের মানিক দুটি যেন ঝাঁপিয়ে অদৃশ্য হল অজানাকে জানার জন্য।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : পৃ—৫১১-৫১২)

'বিপ্লবী জীবনের ইজ্জত, বিপ্লবীর কথার ইজ্জত, কাজের ইজ্জত অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জন তাঁদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে গেলেন।'

[মৃত্যুহীন : হরিনারায়ণ চন্দ : পৃ—৮৮]

ওদিকে তখন রাজেন লাহিড়ীর বিচার চলছে উত্তর প্রদেশে।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে মল্লিকা।

রাসবিহারী তখন জাপানে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বহু বিপ্লবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে ফাঁসিমঞ্চে। বাদবাকি সবাইকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে স্বভাবতই পার্টির তখন ভগ্নদশা।

ঠিক তখনই মাথা তুলে দাঁড়ালেন গোয়ালিয়রের তরুণ বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল। হতাশ হলে চলবে না। আবার দল গঠনের কাজে লাগতে হবে নতুন করে। নতুন উদ্যমে। এত সহজে হার মানলে চলবে কেন?

১৯২২ সালে পরিচয় হল প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক যোগেশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে। দুজনেই চিনলেন দুজনকে। যোগেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে উত্তরপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংস্থার প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল এই বিসমিলকেই। সহকারী হিসেবে সঙ্গে রইলেন আসফাকউল্লা।

দেখতে দেখতে সংগঠন আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশে। এ ব্যাপারে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র পাবনার রাজেন লাহিড়ীর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামে এক বাঙালী বিপ্লবী কানপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপন করেন। রাজেন্দ্রনাথ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন কালেই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমশঃ সমিতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠক বলিয়া পরিচিত হন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতাপগড়, কানপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানের সংগঠনের ভার রাজেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করা হয়। বানোয়ারীলাল ও অন্যান্য সংগঠকগণ রাজেন্দ্রনাথের পরিচালনাধীনে থাকিয়া কাজ করিতে থাকেন।' [ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায় : পৃ—৪০৭]

উপযুক্ত নেতৃত্ব পেয়ে উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবী তরুণদল তখন প্রস্তুত। চাই এবার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র।

অবশ্য বিধ্বংসী বোমার জন্য প্রধান নেতা রামপ্রসাদ বিসমিল তেমন চিন্তিত নন। বংগাল কা বোমা বহুত বড়িয়া চীজ। ওদের বোমা তৈরীর ফরমুলাটা শিখে নিতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ওসব সংগ্রহ করতে হলে যে অনেক টাকা দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা। না, সরকারী অর্থ ভাণ্ডারে হাত দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

পরের ইতিহাস ব্রিটিশ আমলে বাজেয়াপ্ত মণীন্দ্রনারায়ণ রায় রচিত 'কাকোরী ষড়যন্ত্র' গ্রন্থ থেকেই আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

"১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট।

ঘনান্ধকারময়ী রজনী, তাহার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আকাশ জুড়িয়া

ঘনঘটার সমারোহ, মাঝে মাঝে দুই-এক পশলা বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুতা-লোকে যুক্তপ্রদেশের শালবনে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে একখানি যাত্রী গাড়ী লক্ষ্ণৌ-সাহারানপুর লাইনে কাকোরী হইতে আলমনগরের দিকে পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ী অনেকক্ষণ কাকোরী স্টেশন ছাড়িয়া আসিয়াছে, যাত্রীগণের অধিকাংশই তন্দ্রামগ্ন, বাহিরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই।

এমন সময় গাড়ীখানি থামিয়া গেল, গাড়ীর ভিতর হইতে কে যেন চেন টানিয়া গার্ডকে সংকেত করিয়াছে।

গাড়ি থামিবামাত্র একদল যুবক,—সংখ্যায় দশজনের অধিক নহে—তড়িৎ বেগে নীচে নামিয়া পড়িল। সকলেই স্কুল কলেজের ছাত্র, নবীন বয়স, সকলের মুখমণ্ডলই উৎসাহ, বীরত্ব এবং দৃঢ়তার দেদীপ্যমান। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন গার্ডের গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই এই অসম্ভাবিত ঘটনায় বিস্মিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়িয়াছিল, গার্ড সাহেবও দেখিতে আসিতেছিল—কে, কিসের জন্য সংকেত করিয়া গাড়ী থামাইয়াছে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই যুবকদিকের মধ্যে একজন গম্ভীর কণ্ঠে আদেশের স্বরে বলিয়া উঠিল—'আপনারা যে যার কামরায় গিয়ে বসুন। যাত্রীগণের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল সরকারী অর্থ লুট করতে চাই।'

গার্ড তখন কতকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। উক্ত যুবক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনই কর্তৃত্বের স্বরে বলিল—'গাড়ীতে উঠবার চেষ্টা করো না। সমস্ত কলকব্জা তোমার হাতে। তুমি ইচ্ছা করলেই গাড়ী চালিয়ে দিতে পার। তাই আমরা তোমায় গাড়ীতে উঠতে দিতে পারি না। তবে তোমার কোন ভয় নাই। আমরা টাকা চাই, মানুষের প্রাণ নিতে চাই না। তোমাকে মারলে আমাদের কোন লাভ নেই। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজে বাধা দিতে চেষ্টা কর, তা হলে—'

বিদ্যুতালোকে সাহেব দেখিতে পাইল, বক্তার হাতে পিস্তল চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবার কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

...যাহারা গাড়ীর মধ্যে ছিল, তাহারা সকলেই শশব্যস্ত ও শঙ্কিত। কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, মাত্র দশজন যুবক মিলিয়া এমন এক কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। সকলেরই মনে হইতেছিল, হয়তো বা প্রত্যেক গাড়ীতেই ইহাদের লোক রহিয়াছে, একটিমাত্র কথা বলিলেই গুলি করিবে।

গাড়ীর শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার ইঞ্জিনের পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া বোধ হয় মনে

মনে 'Rule Britannia গাহিতেছিল, ইঞ্জিনিয়ার পায়খানার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া প্রাণরক্ষার প্রয়াস পাইল, যাত্রীগণের মধ্যে কেহ 'টু' শব্দ করিবারও সাহস পাইল না।

ইতিমধ্যে কয়েকজন মেল ভ্যানে চড়িয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া টাকার থলি বাহির করিয়া লইল। তারপর সকলে মিলিয়া নিতান্ত সহজভাবেই চলিতে চলিতে অতি অল্পকালের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যাত্রীগণের মধ্যে যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন যুবকদল লক্ষ্ণৌ শহরে প্রবেশ করিয়াছে।"

[কাকোরী ষড়যন্ত্র : মণীন্দ্রনারায়ণ রায় পৃ :—২-৫]

আজকের এই স্বাধীন ভারতে ট্রেন ডাকাতি নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা ছিল অভাবনীয়। লক্ষ্ণৌ কোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার লুই স্টুয়ার্টের ভাষায়: 'This dacoity was of a character unusual in India.'

খবর শুনে বিস্ময়ের বুঝি সীমা ছিল না সেদিন সাধারণ মানুষের। কি ভয়ংকর কথা। এ যে চিন্তাও করা যায় না।

শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্ময় এ নিয়ে কম ছিল না। ইতিমধ্যে মৈনপুর ইত্যাদি স্থানে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে। তার ওপর এই কাকোরীর ঘটনা। বেশ বোঝা যায় যে, এগুলো কোন বিপ্লবী দলের কাজ। তাছাড়া এতখানি দুঃসাহস আর কার হতে পারে?

দায়িত্ব অর্পণ করা হল স্পেশাল পুলিশের দক্ষ অফিসার মিঃ হর্টনের উপর। যে করে হোক, আসামীদের খুঁজে বের করতেই হবে।

সর্বত্র জাল ফেলা হল নিপুণভাবে। চোখ-কান খোলা রাখো। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার।

অনুসন্ধানের ফলে শেষ পর্যন্ত শাহজাহানপুরে পাওয়া গেল কয়েকটি নম্বরযুক্ত সরকারী নোট, যা সেদিন লুণ্ঠিত হয়েছিল যাত্রী গাড়ী থেকে। এ নোট এখানে এল কি করে। আর ইন্দুভূষণ মিত্র নামে বাঙালী ছেলেটিই বা এখানে কেন? ওর নামে এত চিঠিপত্র আসে কেন বাইরে থেকে? পোস্টমাস্টারকে বলে ওর ঐ চিঠিপত্র খুলে দেখার ব্যবস্থা কর অবিলম্বে।

ফল পাওয়া গেল আশাতীত। দেখা গেল, ঠিকানায় ইন্দুভূষণের নাম থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে একজন 'লেটার বক্স' মাত্র। আসলে চিঠিগুলো রামপ্রসাদ বিসমিলের। লিখেছেন তাঁর বিভিন্ন সহকর্মীবৃন্দ। যাত্রীগাড়ী থেকে অর্থ লুণ্ঠনের কথাও তার মধ্যে লেখা রয়েছে পরিষ্কারভাবে।

২৬শে নভেম্বর বিসমিল ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। সঙ্গে পাওয়া গেল এমন কয়েকটি চিঠি, যা তাঁর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

একই সময়ে শাহজাহানপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হল ঠাকুর রোশন সিংকে। বিপ্লবী নায়ক যোগেশ চ্যাটার্জী তখন বাংলাদেশে। তাঁকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল উত্তরপ্রদেশে।

কিন্তু রাজেন লাহিড়ী? তিনি তখন কোথায়? আশ্চর্য, উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

'…রামপ্রসাদ যেদিন গ্রেপ্তার হইল, ঠিক সেই দিনই রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বোমা তৈরী শিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। এই জন্যই কাশীতে রাজেন্দ্রনাথের বাড়ি খানাতল্লাসী করিয়াও পুলিশ রাজেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

'রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পেঁাছিয়া দেখিলেন, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন বিপ্লবী সারা ভারতের বিপ্লবীদের বোমা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে একটি বিরাট বোমার কারখানা চালাইতেছেন। রাজেন্দ্রনাথ ইঁহাদের সহিত কারখানার কাজে যোগদান করেন।

'যুক্তপ্রদেশের পুলিশ রামপ্রসাদের চিঠিপত্র হইতে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতার কোথাও বসিয়া বোমা তৈরী করিতেছেন। তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরের এক বাড়িতে বোমার কারখানাটি আবিষ্কার করে এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত রাজেন্দ্রনাথও গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে বিচারের জন্য রাজেন্দ্রনাথকে উত্তরপ্রদেশে লইয়া আসা হয়।'

[ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস : সুপ্রকাশ রায় : পৃ—৪১৮]

মল্লিকা, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার পরে কেন যে আর এক দফা বিচারের জন্য রাজেন লাহিড়ীকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবার তুমি তা বুঝতে পেরেছ আশা করি। আসলে কাকোরীর এই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন এই রাজেন লাহিড়ী।

কিন্তু প্রমাণ! প্রমাণ কোথায়! প্রমাণ রাজেন লাহিড়ীর নিজের হাতে লেখা কতকগুলি চিঠি, যা পুলিশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল বিভিন্ন স্থান থেকে।

বেনারসের রামনাথ পাণ্ডে ছিল রাজেন লাহিড়ীর লেটার বক্স। তাঁর বাড়ি তল্লাসী করে যে চিঠিখানি পাওয়া যায়, পুলিশের কাছে তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজেনের নিজের হাতে লেখা সেই চিঠিখানিতে ছিল বারো দফা কর্মসূচীর কথা।

(১) বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিহীন লোকদের নামের তালিকা সংগ্রহ করতে হবে।

(২) জেলার একটি নিখুঁত মানচিত্র চাই। থানা, নদী, হাসপাতাল এবং বিত্তশালী লোকদের ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

(৩) কোন থানায় কতজন সশস্ত্র পুলিশ এবং তাদের কাছে রক্ষিত কার্তুজের সংখ্যা।

(৪) সৈন্যদলের সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-গুলির পরিমাণ।

(৫) মোট কতজনের নিজস্ব বন্দুক আছে—তাদের ঠিকানা।

(৬) গোয়েন্দা, গুপ্তচর ও সি. আই. ডি. অফিসারদের নাম ঠিকানা।

(৭) ক্লাবগুলোর সংখ্যা, তারা বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করে—তার বিবরণ।

(৮) স্কুল-কলেজের সংখ্যা এবং ছাত্রদের মনোভাব।

(৯) কল-কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা।

(১০) ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সঠিক বিবরণ।

(১১) নৌকো, গরুর গাড়ী ও মোটরের সংখ্যা এবং তার মালিকদের নাম।

(১২) ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী অফিসারদের নাম ঠিকানা।

ইন্দুভূষণ মিত্রের মাধ্যমে দলনেতা রামপ্রসাদ বিসমিলকে লেখা চিঠি-গুলোও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৭-৯-২৫ তারিখে এক চিঠিতে রাজেন লাহিড়ী লিখেছেন :

'যে অনাথ ছেলেটিকে মিস্ত্রির কাজ শেখানোর জন্য পাঠাব বলে ঠিক করে-ছিলাম, তার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দুজনের একজনকেই যেতে হবে। কারখানার মালিক কালীবাবুর চিঠি এখনো আসেনি। তোমার সময় না থাকলে আমিই যাব। যা হয় জানাবে।'

২২-৯-২৫ তারিখে আর একটি চিঠিতে রাজেন লাহিড়ী লিখেছেন :

'কালীবাবুর চিঠি পেয়েছি। ২৬শে তারিখে যেতে লিখেছেন।...আমি তোমার জন্য ২৪শে তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। না এলে ২৫শে ভোরবেলা রওনা দেবো।'

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানায় কে যাবে, তাই নিয়ে এই পত্রালাপ। যদিও সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা, তবু চিঠির মর্মোদ্ধার করতে এতটুকুও অসুবিধা হয়নি পুলিশের পক্ষে।

উল্লেখযোগ্য, রাজেন লাহিড়ীর আসল নাম অনেকেই জানতেন না উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী মহলে। নিতাই, চারু, যুগলকিশোর, দীক্ষিত, মথুরা, জবাহরলাল, বাজপেয়ী, শ্রীবাস্তব—এমনি বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন সহকর্মীদের কাছে।

চিঠিপত্রেও তাই ব্যবহার করতেন। যেমন ৪-৯-২৫ তারিখে একখানি চিঠি দিয়ে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন দলনেতা রামপ্রসাদ বিসমিলকে :

'তুমি যে নামে আমাকে এবং অন্য সবাইকে চিঠি দাও, অবিলম্বে সে নামটা বদলে ফেলো। উৎসাহী মহল নাম জেনে ফেলেছে বলে সন্দেহ হয়। ইতি—
জবাহরলাল।

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বিচারপতি হ্যামিলটনের আদালতে শুরু হল ঐতিহাসিক কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলা।

আসামী—রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সিং, আসফাকউল্লা, যোগেশ চ্যাটার্জী, শেঠ দামোদর স্বরূপ, মন্মথ গুপ্ত, মোহনলাল গৌতম, শচীন সান্যাল, শচীন বক্সী প্রমুখ চুয়াল্লিশ জন। এদের মধ্যে আসফাকউল্লা এবং শচীন বক্সী তখনো পলাতক।

প্রমাণাভাবে কয়েকজনকে ছেড়ে দেবার পরে সংখ্যা দাঁড়াল সাতাশ।

রাজসাক্ষী হলেন তিনজন। ইন্দুভূষণ মিত্র, বানারসীলাল ও বনোয়ারীলাল।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল তবু মামলা শেষ হল না। আসামী পক্ষের হয়ে সেদিন যাঁরা লড়াই চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গণেশশংকর বিদ্যার্থী, পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের প্রখ্যাত জননেতা চন্দ্রভান গুপ্ত, মোহনলাল সাকসেনা, চৌধুরী খালিকুজ্জমান, কৃপাশংকর হাজেলা ও কলকাতার ব্যারিস্টার বি. কে. চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রায় দেওয়া হল ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা, বৈপ্লবিক উপায়ে সরকারের উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্র, নরহত্যা সহ ট্রেন ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধে রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী ও ঠাকুর রোশন সিং—এই তিনজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

শচীন সান্যাল—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মন্মথ গুপ্ত—চৌদ্দ বছর। গোবিন্দচরণ কর, মুকুন্দলাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, রাজকুমার সিংহ, রামচরণ ক্ষেত্রী—দশ বছর। সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণ দুবলিস—সাত বছর। বানোয়ারীলাল, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, প্রেমকিষণ খান্না, প্রণবেশ চ্যাটার্জী ও রামদুলাল ত্রিবেদী—পাঁচ বছর।

শুধু হরগোবিন্দ ও শচীন বিশ্বাসকে মুক্তি দেওয়া হল প্রমাণাভাবে। রাজসাক্ষী ইন্দুভূষণ মিত্র ও বানারসীলালকে মুক্তি দেওয়া হল পুরস্কার হিসেবে।

রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল চীফ কোর্টে। ফল হলো উল্টো। ফাঁসির হুকুমের কোন হেরফের হল না। কিন্তু দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর ও মুকুন্দলালকে সাজা বৃদ্ধি করে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণকেও তাই। তাঁদের সাত বছর

থেকে করা হল—দশ বছর। ব্যতিক্রম প্রণবেশ চ্যাটার্জী। তার ক্ষেত্রে এক বছর কমিয়ে করা হল চার বছর।

এদিকে দীর্ঘদিন বাদে ১৯২৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের পলাতক আসফাক-উল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিল্লীতে। আর গ্রেপ্তার হয়েছেন শচীন্দ্র-নাথ বক্সী।

১৯২৭ সালের ২৪শে মার্চ বিচারপতি আইনুদ্দিনের কোর্টে শুরু হল এক নতুন মামলা। আসামী—রামপ্রসাদ বিসমিলের সহকারী আসফাকউল্লা ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী।

আসফাকউল্লা খানদানী পাঠান পরিবারের ছেলে। আত্মীয়স্বজনরা সবাই রাজভক্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। আসফাকউল্লার প্রতি তাঁদের উপদেশ—'তুমি পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি কর। কাকোরী মামলা শেষ। আসামীদের সাজা হয়ে গেছে। তুমি স্বীকারোক্তি করলেও তাঁদের নতুন করে সাজা বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে শুধু শুধু ফাঁসির দড়িতে ঝুলে লাভ কি। তার চাইতে স্বীকারোক্তি করে সুখে ঘরসংসার কর।

বেঁকে বসলেন আসফাকউল্লা। না, তা হয় না। আমি আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারব না। দরকার হলে ফাঁসিতে ঝুলবো, তবু স্বীকারোক্তি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

—কিন্তু রামপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীরা সবাই হিন্দু। ওরা তো হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

—মাপ করবেন, রামপ্রসাদকে আমি চিনি। আমার কাছে সে হিন্দু নয়, হিন্দুস্থানী। তার লক্ষ্য—হিন্দুর স্বাধীনতা নয়, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা।

আসফাকউল্লার আগ্রহে একজন হিন্দু আইনজীবী দাঁড়ালেন তাঁর স্বপক্ষে। নাম তাঁর কৃপাশঙ্কর হাজেলা।

একই ভুল করলেন আইনজীবী কৃপাশঙ্কর হাজেলা। আসফাক, তুমি স্বীকারোক্তি কর। তাহলে রাজভক্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে সরকার নিশ্চয় তোমার সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

—এ কি আপনি বলছেন হাজেলা সাহেব! এক ঝলক ম্লান বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল আসফাকউল্লার সারা মুখে, আমি যে অনেক বড় মুখ করে আমার সম্প্রদায়ের সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে আমার আইনজীবী নিযুক্ত করেছি। আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনবো বলে আমি আশা করিনি।

আর কোন কথা জোগাল না হাজেলা সাহেবের মুখে। কি বলবেন। বলার আছেই বা কি! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যে বদ্ধপরিকর, তাঁকে কিছু বলার মত সাধ্য তার কোথায়।

আসফাকউল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। রামপ্রসাদ, রাজেন লাহিড়ী ও ঠাকুর রোশন সিং-এর মত তাঁকেও দেওয়া হল—মৃত্যুদণ্ড। শচীন্দ্রনাথ বক্সীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

তুমুল আন্দোলন শুরু হল উত্তরপ্রদেশে। কাকোরী ট্রেন ডাকাতিতে জনৈক যাত্রী নিহত হয়েছে—একথা সত্য। কিন্তু তার জন্য আসামীরা দায়ী নন। যাত্রীটি তার স্ত্রীর কথা ভেবে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে যাচ্ছিল মহিলা কামরার দিকে। বিপ্লবীদের একজন ভেবে তাকে গুলি করেছেন প্রথম শ্রেণীর জনৈক শ্বেতাঙ্গ যাত্রী। তার জন্য এদের শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

একই অভিমত ব্যক্ত করলেন আইনসভার ভারতীয় সদস্যবৃন্দ। এ আদেশ বে-আইনী। আমরা এর প্রতিকার চাই। সত্যিকারের বিচার চাই।

এমন কি উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণ পর্যন্ত আবেদন জানালেন গভর্ণরের কাছে। আসামীদের ফাঁসির হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। এটাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ মহামান্য সরকারের কাছে। আবেদন অগ্রাহ্য করলেন গভর্ণর বাহাদুর। ফলে জনসাধারণের উদ্যোগে এবার আপীল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। বন্দীদের ফাঁসির হুকুম রদ করে জনমতের প্রতি আস্থা দেখানো হোক।

আপীল ডিসমিস করলেন প্রিভি কাউন্সিল। এবার বড়লাটের কাছে আবেদন জানালেন সর্বভারতীয় নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার কয়েকজন দেশবরেণ্য সদস্য। আসামীদের প্রতি দণ্ডাদেশ রদ করা হোক।

পত্রপাঠ আবেদন অগ্রাহ্য করলেন বড়লাট বাহাদুর। না, সাজা ঠিকই হয়েছে। এর কোন নড়চড় হবে না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে আবেদন করা হল মহামান্য সম্রাটের কাছে, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। না, কোন দয়া বা অনুকম্পা নয়। ফাঁসির আদেশই বহাল রইল ওঁদের চারজনের প্রতি।

যথাসময়ে চারজনকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল সরকারী নির্দেশে।

রামপ্রসাদ বিসমিলের স্থান হল গোরখপুর জেলের কনডেমড্ সেলে। রাজেন লাহিড়ী—গোণ্ডা জেলে। আসফাকউল্লা—ফৈজাবাদ জেলে। ঠাকুর রোশন সিংয়ের স্থান হল নৈনি জেলে।

ফাঁসির পূর্বে এই গোণ্ডা জেল থেকেই রাজেন লাহিড়ী এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'প্রভাতের আলোর মতই মৃত্যু অনিবার্য। তবে কেন মানুষ মৃত্যুকে ভয় করবে, বা তাঁর জন্য শোক করবে?'

গোরখপুর জেলে রামপ্রসাদ রচনা করেছিলেন একটি অমর সংগীত, যা

আজো শুনতে পাওয়া যায় রেডিও, রেকর্ড, অলিতে-গলিতে সর্বত্র।

আসফাকউল্লাও একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন, যার ভাবার্থ হল—'মৃত্যু? সে তো সবার জন্যই অপেক্ষা করে আছে। তবে কেন আমি সেই মৃত্যুকে ভয় করবো। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কালক্রমে সব কিছুই ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়। আমিও তেমনি ফৈজাবাদ ছেড়ে ঈশ্বরের অমর ধামে চলেছি।'

ঠাকুর রোশন সিংও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কবিতার ভাবার্থ হল—'রোশন! মৃত্যুর আলোকে এবার মহাজীবনের বিপুল মহিমা উপলব্ধি কর।'

সবার আগে যেতে হল রাজেন লাহিড়ীকে। তারিখটা ছিল ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর।

দুদিন বাদে ১৯শে ডিসেম্বর গেলেন রামপ্রসাদ বিসমিল।

দৃঢ় পদক্ষেপে বধ্য মঞ্চের দিকে যেতে যেতে শেষবারের মত তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল তাঁর সেই স্বরচিত সংগীত:

'সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে দিল্ মে হ্যায়।
দেখ্না হ্যায় জোর কিত্ না বাজু এ কাতিল্ মে হ্যায়।'

[এখন আমার মনে শুধু মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা। দেখতে চাই, ঘাতকের হাতে কত শক্তি।]

একই দিনে, একই সময়ে ফৈজাবাদ জেলে প্রাণ দিলেন আসফাকউল্লা। শেষ কথা: 'ক্ষুদিরাম—কানাইলালের মত দেশের জন্য প্রাণ দিতে পেরে আমি তৃপ্ত, গর্বিত।'

সবশেষে ২১শে ডিসেম্বর বিদায় নিলেন ঠাকুর রোশন সিং। ধন্য হল নৈনি জেলের ফাঁসিমঞ্চ।*

১৯২৭ সাল শেষ হল। শুরু হল ১৯২৮ সাল।

এ বছরের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশন, যার জি. ও. সি. ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র।

* ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থে বলা হয়েছে—রোশন সিংএর ফাঁসির তারিখ ২১শে ডিসেম্বর। একই বিবরণ রয়েছে বিপ্লববাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ কে. সি. ঘোষ রচিত 'রোল অফ অনার' এবং বিপ্লবী নিকেতন কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুহীন' গ্রন্থে। ভারত সরকারের ইতিহাস রচয়িতার ইচ্ছায় ওটা হয়েছে—২০শে ডিসেম্বর।

বিপ্লবীদের কাছেও এ বছরটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শুরু হয়েছিল বছরখানেক আগে থেকেই। প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সবাই তখন মেদিনীপুর জেলে বন্দী। সেখানেই আলাপ আলোচনা করে ঠিক হয়েছিল যে, আর অনুশীলন, যুগান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন কোন দল নয়। সবগুলো দল এবার এক হয়ে মিশে যাবে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এ পরিকল্পনা সার্থক হয়ে ওঠেনি মল্লিকা। কিন্তু কেন! কি হয়েছিল সেদিন সবার অগোচরে! সে কাহিনী ব্যক্ত করার জন্য এই নতুন অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় জগদীশ চ্যাটার্জীকেই বরং আমি এগিয়ে দিচ্ছি।

"বিপ্লবী কোনদিনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না—হতাশ হয়ে পড়ে না। শত্রুর বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রামেই সে বিশ্বাসী।

পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ভেঙে চুরমার করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় সে মাতোয়ারা। তাই প্রবীণেরা যে ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল নেওয়ার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত, সে ক্ষেত্রে নবীন বিপ্লবীরা ঐই সংগ্রামী কর্মসূচী নিয়েই সারাদেশ জুড়ে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের শেষ প্রান্তে ১৯২৮-২৯ সনে। তারই ফলশ্রুতিতে নবীন বিপ্লবীদের উদ্যোগে বাংলার বুকে গড়ে উঠল রিভলটিং বা অ্যাডভান্স গ্রুপ। এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

এর গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের গোড়ায় বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতারা সহবন্দী হয়ে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে একত্র হবার সুযোগ পেয়েছেন। অনুশীলন সমিতির ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), নরেন্দ্র সেন, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে একই জেলে সহবন্দী হয়ে রয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি।

কারান্তরালের নিভৃতে থেকে তাঁরা অতীতের বৈপ্লবিক কর্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন, জেল থেকে মুক্তিলাভের পর যৌথ উদ্যোগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার থেকে নতুন উদ্যমে বৈপ্লবিক অভিযান পরিচালনা করবেন। সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার মাঝে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা যে শিক্ষা তাঁরা অর্জন করেছেন, সেই শিক্ষাকে এবার যৌথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

১৯২৭ সনের শেষের দিকে বিপ্লবীরা মুক্তি পেলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ শুরু হল। জেলায় জেলায় কর্মীদের সম্মিলিত করা হল। নির্দেশ দেওয়া হল, যৌথ উদ্যোগে বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার। যুক্ত আলোচনা বৈঠকও বসল জেলায়

জেলায়।…ছাত্রদের মাঝে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিতে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হল। নতুন প্রেরণায় সংগঠন এগিয়ে চলল।

১৯২৮ সাল। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে চলেছে প্রস্তুতি। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী। সর্বাধিনায়ক—তথা জি. ও. সি. হলেন সুভাষচন্দ্র, আর বিপ্লবী সহকর্মীরা হলেন উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর, লেফটেন্যান্ট আড্‌জুটেন্ট।

কলিকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময়েই আবার দেখা দিল প্রবল মতানৈক্য। এই মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন গণ সংগঠনের মাঝে, ছড়িয়ে পড়ল ছাত্র সংগঠনেও।

জনগণের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বৈপ্লবিক চেতনা, এই চেতনার প্রতি প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অনিহা আর সেই সঙ্গে বিপ্লবী নেতাদের মাঝে যে মতানৈক্য শুরু হল, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নিদারুণভাবে তরুণ বিপ্লবীদের মনে। বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজন উপলব্ধিতে গড়ে উঠল অ্যাডভান্‌স্‌ বা রিভলটিং গ্রুপ।

রংপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় যতীন দাস, সতীশ পাকড়াশী, অম্বিকা চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি একত্রে মিলিত হলেন। স্থির হল যে একই সময়ে একই দিনে তিনটি জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে যদি এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তাহলে প্রবীণ বিপ্লবীরা এবং অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মীরা তাদের এই কর্মদ্যোগে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

১৯২৯-এর ১৮ই ডিসেম্বর—গভীর রাত। তুষারঘন কুয়াশাচ্ছন্ন মহানগরী কলিকাতা। রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে হঠাৎ পুলিশ ভ্যানের ঘর্ঘর শব্দ আর লালমুখো সার্জেন্ট পুলিশের বুটের পদধ্বনি রাজপথ প্রকম্পিত করে মেছুয়াবাজারে অবস্থিত বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটির দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের হায়েনার দল বিপ্লবীদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নজর রেখে চলেছিল অতি সঙ্গোপনে। গ্রেপ্তার করল তারা সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাসকে। খানাতল্লাসী চালিয়ে আবিষ্কার করল লাল বৈপ্লবিক ইস্তাহার—বিপ্লবীদের নাম ও ঠিকানার তালিকা। বোমা তৈরীর ফরমুলার কাগজপত্রও তারা পেয়ে গেল। রাতের অন্ধকারেই ওদের নিয়ে গেল পুলিশ হাজতে। আরো কিছু বিপ্লবীকে পুলিশী ফাঁদে ধরার প্রত্যাশায় তারা গোপনে ওৎ পেতে রইল ওই ঘাঁটির চারপাশে।

মেছুয়াবাজার বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হল। এই মামলায় ৩২ জন বিপ্লবী যুবক হলেন অভিযুক্ত। বিচারে সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনের হল সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড, শচীন করগুপ্ত ও মুকুল সেনের ছয় বৎসর, সুধাংশু দাসগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস; নিশাকান্ত রায় চৌধুরী প্রমুখের হল পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।" [অগ্নিযুগ : পৃ—৯১-৯৩]

আপাতঃদৃষ্টিতে অ্যাডভান্‌স্‌ বা রিভলটিং গ্রুপের কার্যকরী ভূমিকা এখানেই শেষ, তা বলে বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাসে এ দলের অবদান কিন্তু খুব একটা তুচ্ছ নয়। বিরাট একটা ধাক্কা দিয়ে তারা যে নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে প্রচণ্ড একটা ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে কথা কে অস্বীকার করবে!

প্রমাণ—চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেনের দল। প্রমাণ—বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি.। দুটি দলের মধ্যেই তখন সাজ সাজ রব। আর কোন কথা নয়, এবার কাজ। সময় নিকট হয়েছে এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

যদিও চট্টগ্রাম বা বি. ভি. অনুশীলন এবং যুগান্তরের মত অত সুদূর বিস্তৃত দল নয়, তবু ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত একটার পর একটা আঘাত হেনে যে ভাবে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভীত; সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা কোথায় ?

চলো, আবার আমরা ফিরে যাই প্রাণ দেয়া-নেয়ার সেই রক্তাক্ত অধ্যায়ে।

এ অধ্যায়ের শুরুতেই তোমাকে আমি একটি গল্প শোনাব মল্লিকা। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা মাসিক প্রবাসীতে।

সেদিন বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই প্রবাসী পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত রীতিমত সমীহ করতেন প্রবাসী পত্রিকার মতামতকে। উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভার সবচাইতে বেশী প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবাসী পত্রিকায়।

কর্তৃপক্ষের সহৃদয় সম্মতিক্রমে ১৩৩৭ সালের (১৯৩১) চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই গল্পটি আজ আবার তোমাকে আমি শোনাচ্ছি নতুন করে। গল্পটির নাম :

মেঘ ও রৌদ্র

'অগ্রহায়ণ মাস। সবে ভোর হইয়াছে। শহরের লোক তখন জাগিয়াছে,—জাগেও নাই। দু একটি মাত্র দোকানের দরজা অর্ধেক খোলা

হইয়াছে।

ছোট দারোগা হাফিজনুদ্দীন সাহেব রাত্রির ডিউটি সারিয়া একজন কনেস্টবল সংগে করিয়া থানায় ফিরিতেছেন। কনেস্টবলের নাম রাম সিং। সুদূর মজঃফরপুর জেলা হইতে এই বাংলা মুলুকে নোকুরি কাওয়াস্তে আসিয়াছেন। নোকরিটা যে ভালই চলিতেছে, তাহা তাহার ভুঁড়ির পরিমাণ দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায়।

হঠাৎ একটা ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিয়া দারোগা সাহেব ঘাড় ফিরাইয়া চাহিলেন। রোগা পিট-পিটে, সাদা-কালো, দো-আঁশলা একটা কুকুর, তার পিছনে পিছনে মুক্তকচ্ছ এক ব্যক্তি ছুটিতেছে। বিরাট এক লম্ফ প্রদান করিয়া লোকটি কুকুরটার পিছনের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। কুকুরটা মুখ ফিরাইয়া একবার কামড় দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া কেঁউ কেঁউ করিতে লাগিল।

লোকটি চিৎকার করিয়া বলিল—'ওরে ন্যাপলা, শিগগীর আয়। পটলা আয়তো রে। হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। মজাটা টের পাওয়াচ্ছি এবার।'

হাঁকডাকে ন্যাপলা পটলা নামধারী ব্যক্তিগণ বাহির হইয়া আসিল এবং অনাহূত আরও অনেকে কাপড় পরিতে পরিতে, চোখ মুছিতে মুছিতে রাস্তায় আসিয়া জমা হইয়া মুক্তকচ্ছ ব্যক্তির বীরত্ব দেখিয়া হাঁ করিয়া রহিল।

রাম সিং কনেস্টবল দারোগা সাহেবকে বলিল—'হুজুর, মালুম হোতা হৈ উধার কোই হল্লা মচা রহা হৈ।'

হুজুরের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

লোকটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেপাল ও পটল দুইজনে কুকুরটির দুই কান সজোরে টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেচারা কুকুর শীতে ও ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ল্যাজটির উপর কোন অত্যাচারের আশংকায় তাহা একদম পেটের নিচে চালান করিয়া দিয়াছে। লোকটির ডান হাতের একটি আংগুল দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ডান হাতটা তুলিয়া ধরিয়া সে সক্রোধে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—'কুত্তাকা ছোনা হামলোককো একদম মেরে ফেলা হ্যায়।'

দারোগা সাহেব ভিড় ঠেলিয়া লোকটির কাছে আসিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—'এইও হল্লা মৎ করো। কি হয়েছে? কিসের এত গণ্ডগোল? তুমি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? নাম কি তোমার?'

লোকটি শশব্যস্তে একটা নমস্কার করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—'হুজুর আমার নাম বংশীলোচন কর্মকার। সোনার কাজ করি, এই যাকে বলে

সন্নেকার। রূপো আমি ছুঁইওনে, আমাদের বংশেও কেউ রূপোর কাজ করেনি। হুজুর মা বাপ। মেরে ফেলেছে হুজুর।'

দারোগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গোঁফে একটা চাড়া দিয়া বলিলেন—'চিল্লাও মৎ। হয়েছে কি খুলে বল।'

বংশীলোচন একবার কুকুরটার দিকে চাহিল। তারপর একবার নিজের রক্তমাখা আঙ্গুলটার দিকে চাহিয়া বলিল—'হুজুর, ঘুম থেকে উঠে একবার মাঠে গিয়েছিলাম। মাঠ থেকে এসে গাড়ুটা রেখে যেমনি ঘরে ঢুকব, অমনি কিছুর মধ্যে কিছু না—কোত্থেকে হতভাগা কুকুরটা এসে দিলে এই আঙ্গুলটায় ক্যাঁক করে একটা কামড় বসিয়ে। একেবারে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল হুজুর। আঙ্গুলটা একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। হুজুর মা বাপ, এর একটা বিহিত করুন হুজুর।'

হুজর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'হুঁ, কার এ কুকুর ?'

বংশীলোচন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—'জানিনে হুজুর। হুজুর মা বাপ।'

দারোগা সাহেব আর একবার গম্ভীর মুখে বলিলেন—'হুঁ। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'এসব চলবে না। কুকুর পোষার সখটা বের কচ্ছি। কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যাব। পিঠে দু-ঘা পড়লেই কুকুর পোষার সখ মিটে যাবে। রাম সিং, দেখ তো কুকুরটা কার! শালাকে কান ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে একবার মজাটা টের পাইয়ে দি। কার এ কুকুর ?'

চারিদিকের জনতা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—'এ তো স্যার পুলিশ সাহেবের কুকুর।'

একটু চমকিয়া উঠিয়া দারোগা সাহেব কুকুরটাকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, কিছু যেন স্থির করিতে পারিলেন না। রাম সিং-এর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া যেন প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—তুমি কি বল ?

রাম সিং তখন অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। দারোগা সাহেবের সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—'বড়ী উমশ মালুম হোতী হৈ হুজুর, সাওন বরষেগা।'

দারোগা সাহেব চট করিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—'মালুম তো ঐসা হী পড়তা হৈ।'

তারপর বংশীলোচনের দিকে ফিরিয়া কড়া সুরে বলিলেন—দেখ, একথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না, এতটুকুন একটা কুকুরের বাচ্চা তোমার মত বুড়ো ধাড়িকে কামড়াল কি করে। তোমার অমন হাঁড়িপানা মুখ দেখেই তো কুকুর ভয়ে এগোবে না। যাও-যাও, কোত্থেকে আঙ্গুল কেটে এসে এখন

ন্যাকামো করা হচ্ছে। মিথ্যেবাদী কোথাকার। কষে দু ঘা লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়। চলো রাম সিং।'

বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্য হইতে একজন লোক আগাইয়া আসিয়া বলিল—'হুজুর, বংশীর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। ওটা একটা পাঁড় মাতাল। সারা রাত মদ খেয়েছে। ভোরবেলা কুকুরটা পথ দিয়ে যাচ্ছিল দেখে সেটাকে ধরে এনে কাঁধে করে কতক্ষণ ধেই ধেই করে নেচেছে। তারপর একটা সিগারেট এনে যেই কুকুরটার মুখে গুঁজে দিতে গেছে, অমনি সেটা ওর আঙ্গুলে ক্যাঁক করে একটা কামড় লাগিয়ে দিয়েছে। কুকুরটার আর দোষ কি হুজুর। মানুষকে অমন করলে মানুষও ওকে কামড়ে দিত। এই তো সেদিন—

বংশী বাধা দিয়া বলিল—'হয়েছে হয়েছে, তোকে আর বক্তিমে কত্তে হবে না। তুই কত ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির জানা আছে। গুলিখোর আবার এখানে বিদ্যে ফলাতে এসেছে। সিরগেট গুঁজবে কিরে গাধা! সিরগেট কি এখন কেউ খায় নাকিরে?'

বংশী তর্ক ছাড়িয়া দারোগা সাহেবের দিকে ফিরিয়া লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—'হুজুর, বড় সাহেবের কুকুর আমি চিনি। এটা বড় সাহেবের কুকুর নয়।'

—'ঠিক তো?'

—'হাঁ হুজুর।'

চারিদিকের দুই চারিজন লোকও মাথা নাড়িয়া তাহার কথার সমর্থন করিল।

দারোগা সাহেব একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন—'তাই তো বলি আমিও। এটা আবার একটা কুকুর! আর তাকে রাখবেন পুলিশ সাহেব! কোন শুয়ার বলেছে এটা পুলিশ সাহেবের কুকুর? পুলিশ সাহেবের কুকুর তোমাদের মত কিনা যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। চল বংশী, থানায় চল, এজাহার দিবি।'

রাম সিং এতক্ষণ কুকুরটাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। সে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—'হুজুর, এটা বোধহয় সাহেবেরই কুকুর। কাল এমনি একটা কুকুর যেন তাঁর বাড়িতে দেখেছিলাম।'

একজন কে বলিয়া উঠিল—'আরে, এটা যে পুলিশ সাহেবের কুকুর সে তো সবাই জানে।'

দারোগা সাহেবের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ানকভাবে কাশিয়া কহিলেন—'উঃ! কি শীত পড়েছে। সাধ্য কি দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলি। রাম সিং, কুকুরটাকে বড় সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাও। সাহেবকে

আমার সেলাম জানিয়ে বলবে, কুকুরটাকে পথে পেয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তারপর বংশীলোচনকে বলিলেন—'খুব হয়েছে, খুব হয়েছে। ঐ মুগুরের মত কালো হাতটা উঁচিয়ে আর ন্যাকামি করতে হবে না। কি আমার বীরপুরুষ রে! কোথায় একটু আঁচড় লেগেছে কি না লেগেছে, আর অমনি উনি একেবারে লাফাতে শুরু করে দিলেন। তোমার মাথাটা যে চিবিয়ে দেয়নি এই তোমার ভাগ্যি। দোষ করেছে নিজে, আবার তার হম্বিতম্বি দেখ না! যাও যাও।'

এই সময় একজন বলিয়া উঠিল—'আরে, এই যে পুলিশ সাহেবের চাপরাশী করিম যাচ্ছে। ওকে ডাকলেই তো হয়।'

করিমকে আর ডাকিতে হইল না। ভিড় দেখিয়া সে নিজেই আসিয়া জুটিল। একটি লোক ব্যগ্রকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'চাপরাশী সাহেব, এটা পুলিশ সাহেবের কুকুর না?'

করিম একটু হাসিয়া বলল—'কে বললে? এটা তো বড় সাহেবের কুকুর নয়? এটা—'

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'আরে তাই বল করিম। আমিও তো তাই বলি, এমন মরা কুকুর হবে বড় সাহেবের? আর এত জিজ্ঞাসাবাদেরই বা দরকার কি? দেখলেই তো বোঝা যায়, এ কোন উকিলবাবুর কুকুর। হাঃ হাঃ হাঃ! যাক, হাসির কথা নয়। এ কুকুর যাকে তাকে কামড়াবে তা চলবে না। নিয়ে চল এটাকে গলায় দড়ি দিয়ে থানায়। তারপর কুকুরের সখওয়ালা বাবুদেরও দেখা যাবে।'

করিম বলল—'এটা বড় সাহেবের কুকুর নয় বটে, কিন্তু এটা তার দোস্ত হ্যার সিং সাহেবের। তিনি যে কাল এখানে এসেছেন।'

দারোগা সাহেবের মুখ আবার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কোনরকমে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—'কই, সাহেবের দোস্ত যে এসেছেন তা তো আমি জানতাম না। কদ্দিন থাকবেন তিনি এখানে? তাঁর শরীর বেশ ভাল আছে তো? বেশ—বেশ। কেমন লোক সাহেবের দোস্ত? এ কুকুরটি বুঝি তাঁরই? বেশ-বেশ।'

দারোগা সাহেব কুকুরটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, মুখের ভাব হাসি হাসি করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কুকুরটি কিন্তু খুব শান্ত, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছা করে। কেমন চুপ করে বসে আছে। কেমন চোখদুটি শীতে কাঁপছে। এ আবার এই লোকটার নাকি আঙুল কামড়ে দিয়েছে। যত সব কথা।'

করিম দারোগা সাহেবের কোল হইতে কুকুরটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

দারোগা সাহেব বংশীলোচনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—'ব্যাটার সাহস কত। সিগারেট খুঁজতে গিয়েছিলেন। ব্যাটা মাতাল। আবার ন্যাকামো দেখ না! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবকে দিলে ঠিক হয়।'

'মেঘ ও রৌদ্র' এখানেই শেষ। তবে নিচে একটি ফুটনোট রয়েছে। ওখানে লেখা রয়েছে—'লেখক সম্প্রতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।'

এবার নিশ্চয় লেখকটিকে তুমি চিনতে পেরেছ মল্লিকা। দীনেশ গুপ্ত। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ দীনেশ গুপ্ত।

সেদিন প্রবাসী পত্রিকায় প্রবেশাধিকার পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না কোন নবীন লেখকের পক্ষে। মাত্র বিশ বছরের দীনেশ অতি সহজেই সেই ছাড়পত্র পেয়েছিলেন নিজের প্রতিভার জোরে।

কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক দীনেশ সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী বীর শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই তোমাকে আমি শুনিয়েছি ইতিপূর্বে। তাই পুনরাবৃত্তি না করে আমি শুধু একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ তুলে ধরবো তোমার কাছে।

এ ঘটনা ঘটেছিল বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত 'বেণু' পত্রিকা অফিসে। বেণু সম্পাদক বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখনী থেকেই এ কাহিনী তোমাকে আমি শোনাচ্ছি নতুন করে।

'১৯২৭ সাল। বেণু পত্রিকার অফিস তখন ৯৩।১এফ, বৈঠকখানা রোডের ত্রিতল বাড়িতে। দীনেশ কলকাতা এসেছেন। মে কি জুন মাসের এক দুপুর। বন্ধুদের তখন জমাট আড্ডা জমত বেণু অফিসে।

সাহিত্য রসিক মুজতবা আলির সঙ্গে আমরা একমত—সত্যি, আড্ডা ব্যতীত মানুষ দিলখোলা মনের স্পর্শ পায় না, দিলখোলা মন না হলে বড় কাজ করা যায় না।

বিপ্লবীরা আড্ডামুখী জীব। কিন্তু আড্ডাগুলোর ধর্ম ছিল একটু আলাদা। তাদের মূলে ছিল বিপ্লবাত্মক বোধ, তাদের রসান্বিত করত সতীর্থ-মন।

যা হোক, সেদিন দীনেশ গুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে আপিস-ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর একটি বইয়ের প্যাকেট দুম্ করে রাখলেন এবং চেয়ার টেনে বসলেন। মনে হল যেন একখানা ঝড় এসে ঢুকেছে এবং চেয়ারের আয়ত্তে বসে থাকা তাঁর পক্ষে দুষ্কর।

কোন ভূমিকা না করে অথচ সসংকোচে দীনেশ একটা পুলিন্দা আমার হাতে দিয়ে বললেন: ভারতবর্ষের সামরিক স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে একটা আবোলতাবোল রচনা লিখেছি বেণুর জন্য, আপনি একটু দেখে দেবেন।

আমি সুদীর্ঘ রচনাটি ড্রয়ারে রেখে দিলাম। তৎপর ঢাকা-প্রত্যাগত দীনেশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম।

আমি বললাম : ঐ প্যাকেটে কি বই এনেছ ?

উচ্ছ্বাসিত দীনেশ বললেন : সেকেণ্ডহ্যাণ্ড যুদ্ধ বিজ্ঞানের বই, একখানা বলাকা, একখানা গীতাঞ্জলি।

আমার ভারি মজা লাগল। প্রশ্ন করলাম : ঐ মেসিনগানের স্তূপের সঙ্গে গীতাঞ্জলির সমন্বয় ঘটাবে কি করে দীনেশ ?

কিশোর দীনেশ তখন সবেমাত্র প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন। তাঁর চোখে দূরের স্বপ্ন, কামনায় বিশ্বজয়ের গুঞ্জন।

আমাকে উত্তর দিলেন : 'বেণু' কেমন করে বিপ্লবের তূর্যধ্বনির সঙ্গে তাল রাখে ?

এমন উত্তর আমি ঐটুকু ছেলের কাছে আশা করিনি। মনে হল, ঐ চিরচঞ্চল কিশোরের কোথায় যেন তাঁরই অজ্ঞাতে সকল প্রশ্নের উত্তর স্থির হয়ে আছে।

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : দীনেশ, তুমি কবিতা ভালবাস ?

—বাসি।

—লেখ না কেন ?

—ভালবাসি বলেই লিখি না। কারণ, দু একটা লিখে দেখেছি, ও আমার হয় না।

প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে; কোন বস্তু পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও ?

—কবিতা।

—গীতার শ্লোকগুলোও কবিতা। তবে একদিন বলেছিলে কেন যে, গীতা পড়বার সময় তোমার কষ্ট করে মন বসাতে হয় ?

—গীতা পড়তে ভাল লাগে কিন্তু দুলাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ে; আর তখুনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে যুদ্ধের সৈনিক হব। ব্যস, গীতা পাঠ খতম হয়ে যায়।

—কিন্তু কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড় ?

—রবীন্দ্রনাথের।

—কেন ?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি 'গীতা'র বাণী আমার মাতৃ কণ্ঠে খুঁজে পাই; আরো পাই এই পৃথিবী ও তার অগণিত মানুষকে, পাই আলো-বাতাস জীবজন্তু ও সবুজ গাছগুলোকে।

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা তোমাকে চঞ্চল করে না ?

—অভিভূত করে, কিন্তু করে না। ভাল লাগে এত বেশী যে, আমার রক্তধারা বিবশ হয়ে আসে, মনে রোমাঞ্চ লাগে। আমি স্থির হই।

বললাম: তোমার খুব ভাল লাগে এমন দু একটি চরণ আবৃত্তি করো না।

দীনেশ শুরু করলেন:

'হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।
কী তোমারে দিব আনি।
সন্ধ্যাদীপখানি?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।'

চঞ্চল দীনেশ ক্রমশ স্থির হয়ে আসছেন। আবার বলতে থাকেন:

'দেখিবে সহসা—
[illegible]ার কবরী থকে খস
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।'

দীনেশের কণ্ঠ থেমেছে, কিন্তু কবিতার রেশ তাঁর সত্তায় অদৃশ্য তরঙ্গ-দোলায় বহমান।

আমি বললাম: আরো বল!

দীনেশ শুরু করলেন:

'বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ-বাতাসে
ফাগুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।...'
'ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।'

প্রশ্ন করলাম: তোমার এসব পংক্তিগুলো অত ভাল লাগে কেন? মারামারি কাটাকাটির কথা তো এতে কিছু নেই।

সহাস্যে দীনেশ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

বলেন : কেন জানি নে—আমার বড় আপনার মনে হয়। তার পৃথিবীতে আমাদের পৃথিবীরই দক্ষিণ-বাতাসের মর্মর আছে, ফাগুনের বর্ণময় নিশ্বাস আছে, অথচ আরো আছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার প্রাচীরকে অস্বীকার করার সাহস।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি গান ভালবাস ?

দীনেশ উৎসাহে উত্তর দেন : খুব।

—স্বদেশী গান ?

—স্বদেশী গান তো নিশ্চয়ই, ঐ যুদ্ধের বাজনার মত। তবে খুব ভাল লাগে রবীন্দ্র সংগীত।

—বল তো দু' একটি তোমার প্রিয় গানের দু' একটি চরণ।

দীনেশ বলে চললেন :

'দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে;
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।'

আমি বললাম : আরো বল।

দীনেশ তাঁর ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে অজস্র গানের অজস্র চরণ আবৃত্তি করে চললেন। মনে হল, তাঁর কানে যেন কবির নীরব কণ্ঠের গীত ভেসে আসছে। তাই গানের আবৃত্তি তাঁর তন্ময়তা সুন্দর। দীনেশের কণ্ঠে বেজে উঠল :

'ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়।
ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম : আচ্ছা, কিছু লোকে তো বলে, রবীন্দ্র কাব্যে মেয়েলী-ঢঙ বড় বেশী। ও পড়লে ছেলেরা ন্যাকা হয়ে যায়। কিন্তু তোমার কি মনে হয় ?

দীনেশ আমার দিকে একটু তাকিয়ে রীতিমত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন : সেই লোকগুলো রবি ঠাকুরের একটি কথাও বুঝতে চায় না। ওদের হাতের কাছে পেলে—

দীনেশের আর বলা হল না। মনে হল সেই কল্পিত মানুষগুলোকে কাছে পেলে দীনেশচন্দ্র তখুনি তাদের ঘাড় মটকে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, দীনেশের প্রিয়তম সাথী ছিল। কবির কাব্যে দীনেশ সেই ধ্বনি মর্ম দিয়ে অনুভব করতেন, যে ধ্বনি তাঁকে কাল ও দেশের গণ্ডি পার করে একদা সে জগতের গান শুনিয়েছিল; যার কল্পনা ঘুমিয়েছিল তাঁরই রক্তের নিভৃত স্পন্দনে।

···নিজের জীবনকে নিজের দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করে বিপ্লবের বেদীমূলে আহুতি দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র। তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা দিনে দিনে সুন্দর হয়েছিল। তাঁর এই দীক্ষা-তরুর মূলে জলসিঞ্চন করত রবীন্দ্র কাব্য; সে তরুকে আলোক ও বাতাস দান করত রবীন্দ্র-দর্শন; সে তরু যে মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল তার প্রতি রন্ধ্রকে উর্বর করত সতীর্থ ও পুরোগামী শহীদদের বন্ধুত্ব, ত্যাগ; বীর্য ও আদর্শমগ্নতা।'

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃ—৩২২-৩৩০]

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে।

পুলিশের সর্বময় কর্তা লোম্যানকে সেদিন প্রাণ হারাতে হল বি. ভি-র দুঃসাহসী তরুণ বিনয় বসুর অব্যর্থ গুলিতে। আহত হলেন পুলিশ সুপার মিঃ হডসন। বিনয় বসু উধাও।

৮ই ডিসেম্বর সেই বিনয় বসুর নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। সঙ্গে রইলেন আরো দুজন। বাদল আর দীনেশ।

নিহত হলেন কর্নেল সিম্পসন। বাদল ঘটনাস্থলেই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। আহত বিনয় প্রাণ দিলেন আরো চারদিন বাদে। বিচারে দীনেশকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড।

দীনেশ তখন আলিপুর জেলের কনডেমড সেলে ফাঁসির অপেক্ষায়। পাশের সেলে রয়েছেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

মাঝে মাঝে ভাবের আদান প্রদান চলে দুজনের মধ্যে। রামকৃষ্ণ সবেমাত্র গুরুতর রোগ ভোগ সেরে উঠেছেন, তাই জোরে জোরে প্রশ্ন করেন দীনেশ—এখন কেমন আছ রামকৃষ্ণ ?

—একটু ভাল আছি দীনেশদা।

—তোমার সেই 'কাজিন সিস্টার' আজ দেখা করতে আসেন নি?

—কাজিন সিস্টার! হাসি চেপে জবাব দেন রামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, এসেছিলেন।

কে এই কাজিন সিস্টার! ধৈর্য ধরো। একটু বাদেই তুমি পরিচয় পাবে এই কাজিন সিস্টারের।

দিন ঘনিয়ে আসে। সেদিন তারিখটা ছিল ৬ই জুলাই। ঠিক হয়েছে কাল ভোরেই ফাঁসি দেওয়া হবে দীনেশকে।

ঘোর তমস্বিনী রাত্রি। পাশের সেল থেকে এক সময়ে ভেসে আসে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কণ্ঠ :

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।...'

এ দিক থেকে সাড়া দিলেন দীনেশ :

'যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই।'

ফাঁসির পূর্বে আলিপুর জেল থেকে লেখা দীনেশের পত্রাবলী সম্বন্ধে নতুন করে আর বলার কিছু নেই। ইতিপূর্বে বহুবার সে সব চিঠির কথা তোমাকে আমি শুনিয়েছি বিভিন্ন ভাবে। তাই এখানে আমি শুধু ফাঁসির পূর্বক্ষণে বৌদিকে লেখা তার শেষ চিঠিখানির কথা উল্লেখ করবো বিশেষ প্রয়োজনে।*

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, কলিকাতা
৭-৭-৩১ (প্রত্যুষে)

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো? আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ জন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার ঠাকুরপো

---

* লক্ষনীয়, ফাঁসির পূর্বক্ষণে শেষ চিঠিখানি লিখেছিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে। জেলখানায় স্থাপিত প্রস্তরফলকেও তাই রয়েছে। 'বেণু' সম্পাদকীয় মন্তব্যেও উল্লেখ করা হয়েছে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কথা। সরকারী গ্রন্থটি তাকে ফাঁসি দিয়েছেন প্রেসিডেন্সি জেলে।

সেদিনই (৭ই জুলাই) সব কিছু শেষ হয়ে গেল আলিপুর জেলের ফাঁসিমঞ্চে। সংবাদপত্রের ভাষায়:

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি

'সোমবার শেষ রাত্রিতে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতার প্রতি রাস্তার মোড়ে বহু পুলিশ মোতায়েন দেখা যায়। ইহা হইতেই প্রবল অনুমান হয় যে, ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ৭-৭-৩১]

সম্পাদকীয়

'বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল। মাতা-পিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকেই সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে—মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা।

অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্ততঃ প্রাণভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বাকল্যাণ্ডের মন্তব্যে এই আশা দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু চরমদণ্ডের অন্যথা করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। অসহায় জাতি—তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রুসিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল।

দীনেশ বাঁচিল না—তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদখিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল, কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল; বোঝা গেল না। কেহ কি বুঝিবে?'

[আনন্দবাজার ৮-৭-৩১]

দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কর্পোরেশনের সভা স্থগিত

'স্বকীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গতকল্য বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।

...প্রস্তাবটি সম্পর্কে মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলেন: হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বাকল্যাণ্ড রায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই যুবক আত্মস্বার্থ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই কার্য করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড ইতিহাসের রায়ই লিখিয়াছেন। ইতিহাসে

আমরা এমন অনেক কাহিনী পাঠ করিয়াছি, যাহারা একসময় এরূপ কার্যের জন্য দণ্ডিত হয়, পরবর্তীকালে তাঁহারাই আত্মোৎসর্গকারী বীর বলিয়া পূজা পায়।

সুতরাং এই যুবক তাঁহার আদর্শের অনুসরণে যে অবিচলিত সাহস দেখাইয়াছেন, আসুন আমরা সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

[আনন্দবাজার : ৯-৭-৩১]

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি

বাঙলার সর্বত্র বিক্ষোভ

বাগেরহাট : শ্রীযুক্ত রণদাকান্ত রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৮ই তারিখে এক জনসভা হইয়াছে।...

কান্দি : ৯ই তারিখে কান্দিতে হরতাল হইয়াছে।

বরিশাল : ডাক্তার আনন্দমোহন রায়ের সভাপতিত্বে অশ্বিনীকুমার হলে এক সভা হয়।

ফরিদপুর : ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়াছিল। বাবু দীনেশচন্দ্র সেন উকীলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়।...

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ জেলা ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত হরসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[আনন্দবাজার : ১১-৭-৩১]

আগেই বলেছি দীনেশ ছিলেন বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি-র সদস্য। বি. ভি-র মুখপত্র ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় সম্পাদিত 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে সেদিন এ সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল দেখা যাক।

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ

"মর্ত্যের তামসী নিশি" যখন আষাঢ়ের আচ্ছন্ন ঊষায় মিলাইয়া যাইতেছিল সেই সময় মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশের জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। আবার শ্রাবণের এই "ঘন বাদল বরিষণে" রামকৃষ্ণের শেষ সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। দেশবাসীর আকুল আবেদন, জনক জননীর কাতর প্রার্থনা সবই নিষ্ফল হইল। আইনের অমোঘ আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইল।

এই দুই তরুণের জীবনদীপ নির্বাপিত করিয়া মানব সভ্যতার কোন্ চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা আমরা জানিনা। তবে জনমতকে পদদলিত ও জনক জননীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করায় দেশবাসী যে কতখানি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কর্পোরেশনে শ্রদ্ধাঞ্জলি, বাংলার শহরে

শহরে শোভাযাত্রা, শোক সভা বা হরতাল তাহারই পরিচয়।

দেশবাসী তাঁহাদের জীবন ভিক্ষা শুধু চাহিয়াছিল—সসম্মানে মুক্তির দাবী করে নাই। আশা কুহকিনী, তাই লাহোরের ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির পরও আবার দয়াভিক্ষা করিয়াছিল।

ভিখারীর অশ্রুজল ব্যর্থ হইয়াছে, প্রবলের রুদ্ধদ্বার অসহায় দুর্বলের প্রার্থনায় উন্মুক্ত হয় নাই। অথচ প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় নয়। লাহোরে তাহার নজীর রহিয়াছে।

জনমতকে পদদলিত করিয়া ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির পর লাহোরেই ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে জনৈক আসামীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হইয়াছে। আইনের মর্যাদা তাতে ক্ষুন্ন হয় নাই। সাম্রাজ্যের কাঠামোও ধূলিসাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দীনেশ ও রামকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিলে কি অন্যথা হইত ?

"The punishment of murder is death"—হত্যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। প্রতিহিংসামূলক এই নীতিকে বর্তমান সভ্যজগতে কোন যুক্তি দ্বারাই সমর্থন করিতে পারা যায় না। "Eye for an eye" অথবা "Tooth for a tooth" এই নীতির বীভৎসতা সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ নাই। হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডও বর্বরোচিত। প্রাণদণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য চরম শাস্তির ভীতি প্রদর্শনে অপরাধ নির্মূল করা।

মানবের অভিজ্ঞতা বার বার ইহা ভালভাবেই দেখাইয়াছে যে, আইনের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। রাজশক্তি চরম অপরাধীকে ফাঁসি দিয়াছে অথচ অপরাধের নিবৃত্তি হয় নাই। শাসক তাহার হাতের ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করিলেও শাস্তি প্রাণদানে কুণ্ঠিত হয় নাই। রিপুর বশবর্তী হইয়া অতি হীন স্তরের লোকও যে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে কম্পিত হয় না, সুশিক্ষিত ভগবদ্বিশ্বাসী ভদ্র সন্তান যে একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই মৃত্যুকে শংকা করিবে না, তাহা তো অধিক চিন্তাসাপেক্ষ নয়।

অথচ ইহা লইয়া "ভারত বন্ধু" (?) "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" বেশ একটু উল্লাস কটাক্ষ করিয়াছে এবং "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইবার, নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছে। তাহারই দেশের 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' যে বলিয়াছে 'Injustice is the life-blood of terrorism—(অন্যায় হইতেই ভীতি উৎপাদন নীতির সূত্রপাত হয়), তাহা বোধ হয় 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' ভুলিয়া গিয়াছে। "Murder কে fine art-এ (হত্যার চারুশিল্পে) পরিণত তো পাশ্চাত্য দেশবাসীই করিয়াছে। তাহাদের 'গ্যানম্যান' 'গাঙষ্টার', 'সুইণ্ডলার', ইত্যাদির তুলনায় এ দেশবাসী শিশু মাত্র।

ইংরাজের স্বদেশে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার স্বপক্ষে যুক্তি অধিক মিলে নাই। অবশ্য ইংরাজ ও বিদেশে ইংরাজ এক নয়—এ কথা Up on Close ও বেশ ভালভাবেই দেখাইয়াছেন।

বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী Bernard Shaw লিখিয়াছেন "Murder and Capital punishment are not the opposite that Cancel each other but similar that breed their kind."—ইহা প্ররোচক কিংবা কোন কিছুর প্রতি আরোপ নয়—সত্য ঘটনার বিবৃতি মাত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার অসংখ্য নিদর্শনই বর্তমান।

আলিপুরের ভীষণ হত্যাকাণ্ডেও শ'র উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। আমাদের মনে হয়, এই যুবকদ্বয়ের প্রাণদণ্ড রহিত হইলে জনমতকে মান্য করাও হইত এবং কোন ভাবপ্রবণ যুবকের দ্বারা এইরূপে শোচনীয় ঘটনার অভিনয় হইত না।

প্রাণদণ্ড যদি স্বার্থসিদ্ধি বা হীন প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রসূত অপরাধ না হয় (J. Buckland দীনেশ সম্পর্কে তাই বলিয়াছেন), এবং তারপর যদি দণ্ডিত অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া হাসিমুখে মরণকে বরণ করে, তবে তাহাতে দণ্ডিতের অপরাধ ঢাকিয়া যায় এবং তাহার আত্মবিসর্জন ও আদর্শকে মহান ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অপরাধীর প্রাণ কাঁপিল না, শেষ দর্শনাভিলাষিণী স্নেহময়ী জননীর আনিত আহার্য অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়াও সানন্দেই ভক্ষণ করিল—এ অতি আশ্চর্য কথা, সহসা বিশ্বাস হইতে চায় না।

বিশ্বের যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু গৌরবময়; তাতেই মাথা নত হইয়া শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া যায়। তাই না আজ সমগ্র দেশব্যাপী এই বীরপূজা—তাই আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

[বেণু : শ্রাবণ সংখ্যা : ১৯৩১ সাল]

সেদিন জনমত উপেক্ষা করে দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি মিঃ গার্লিক। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসও রেহাই পাননি। তাঁকেও তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন সেই একই ভাবে।

এবার এল তাঁর নিজের শাস্তি গ্রহণের পালা। বিপ্লবী নায়ক নিকুঞ্জ সেনের লেখনী থেকেই সে কাহিনী তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'দীনেশ গুপ্তের বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন গার্লিক। সেদিন দীনেশ গুপ্তের বিচার তিনি করেছিলেন। আর ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে দীনেশ গুপ্তের বন্ধুর পথের বন্ধুরা কিছুদিন পরে তাঁর বিচার করেছিলেন। বিচারে তাঁর প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হল।

১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই, আলিপুর সেসন জজের কোর্টে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন বিপ্লবী বীর কানাই ভট্টাচার্য।...

কার্য সমাধা করে কানাই ভট্টাচার্য সকলের অজ্ঞাতেই বীরের ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে এমন নিরাসক্ত আত্মবিলুপ্তি সত্যই দুর্লভ। কানাই ভট্টাচার্য বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া কর্মী। সাতকড়িবাবুই তাঁকে এ কাজে পাঠান।' [অগ্নিযুগ : পৃ—১৭৬]

দার্শনিক-সাহিত্যিক দীনেশ গুপ্ত চলে গেলেন নিজের কর্তব্য শেষ করে।

এ প্রসঙ্গে আরো দু-একজনের কথা তোমাকে বলছি, যাদের সেদিন কম মূল্য দিতে হয় নি শাসকদের বিচারে।

রাইটার্স অভিযানের বীর অধিনায়ক বিনয় বসু মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১২ই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে। ঠিক তার চারদিন পরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আবার ঢেউ তুললেন নতুন করে।

রাজদ্রোহের অপরাধে ইতিপূর্বে তিনি একবার দুঃসহ কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন সে ইতিহাস সবারই জানা। কিন্তু পরবর্তীকালেও যে তিনি একবার দণ্ডিত হয়েছিলেন, সে ইতিহাস কে মনে রেখেছে। আশ্চর্য, ঘটনাটা একেবারেই চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে।

প্রথমবার দণ্ডিত হয়েছিলেন ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর বিচারে। অপরাধ—গত পুজো সংখ্যা ধূমকেতু পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন :

'আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশী ?'

বিচারে কবিকে সাজা দেওয়া হল এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

—এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

সম্মতি দিলেন বিচারক সুইনহো। কবি ইচ্ছা করলে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন আদালতের কাছে।

ধীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে কবি তাঁর বক্তব্য রাখলেন আদালতের কাছে :

'আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, করেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রাজার নিযুক্ত বিচারক কখনো সত্য বিচারক হতে পারে না. কিন্তু আমি জানি, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান।

আমি কোন কিছুর ভয়েই সত্যকে ছোট করিনি। লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেকে বিক্রিও করিনি। আমি কবি। আমি যে সত্যের হাতের বীণা। আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।

আমার ভয় নেই। কোন দুঃখও নেই। আমি সত্যরক্ষক। ন্যায় এবং বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর আমি লাল সৈনিক। আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু দিয়ে আমি আমার আদর্শ পালন করেছি।'

দ্বিতীয়বার দণ্ডিত হয়েছিলেন ১৯৩০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

প্রলয়শিখার কবি

হাইকোর্টে জামিনের দরখাস্ত

'প্রলয়শিখা' নামক একখানা রাজদ্রোহমূলক কবিতার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অপরাধে কাজী নজরুল ইসলাম গতকল্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

তাঁহার পক্ষ হইতে মিঃ সন্তোষকুমার বসু, মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং রামদাস মুখার্জী হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি গ্রাহামের এজলাসে আপীল সাপেক্ষে জামীনের দরখাস্ত করেন।

[আনন্দবাজার : ১৭-১২-৩০]

অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, বিচক্ষণ আইনজীবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। ফলে সরকার বাহাদুর মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কবির বিরুদ্ধে।

পাশাপাশি মনে পড়ে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কথা। সত্যই চারণ কবি। তাই চারণের মতই তিনি গোটা দেশটাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন তাঁর স্বদেশী গানের মাধ্যমে।

ফলে রাজরোষ। অপরাধ-১৯০৬ সালে রচিত 'মাতৃ পূজা' নামে তাঁর পালা নাটকটি। নাটকের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন :

'বাবু, বুঝবে কি আর ম'লে
ছিল ধান গোলা ভরা,
শ্বেত ইঁদুরে করলে সারা
চোখের ঐ চশমা জোড়া
দেখনা বাবু খুলে।'

মারাত্মক অপরাধ, তাই ১৯০৮ সালে ১০৮ ধারা অনুযায়ী কবিকে গ্রেপ্তার করা হল বরিশালের সাহাবাজপুরে। তারপরই রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারপতি মিঃ ডসনের আদালতে। বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশ টাকা জরিমানা করে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হল দিল্লীর কারাগারে।

মুক্তি পেয়ে আবার যে-কে-সেই। ফলে আবার রাজরোষ।

বোধ হয় একটা দিনও তিনি শান্তিতে কাটাতে পারেন নি পুলিশের উৎপাতে। যেখানে পালা গাইতে গিয়েছেন, সেখানেই হরেক রকমের নিষেধাজ্ঞা। একটা মাত্র ঘটনার কথা বলছি।

মুকুন্দ দাসের বিপদ

'ঢাকা, ২৮শে নভেম্বর বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস যাত্রার অভিনয় করিবার জন্য নারায়ণগঞ্জ আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে জরুরী অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারানুসারে নোটিশ পাওয়া মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা জেলার সীমানা ত্যাগ করিবার জন্য হুকুম প্রদান করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার : ৩০-১১-৩২]

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী সংগীত যে সেদিন জনমানসে কি প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, তা আজকের দিনে কল্পনা করাও কষ্টকর। সেদিনের অন্তরীণ বন্দী লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জবানী থেকেই একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

'১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। তখন আমি ফরিদপুরের সদরঘাট থানায় অন্তরীণ বন্দী। থানা এলাকার মধ্যেই নির্দিষ্ট একটা কুটিরে বাস করি। কারো সংগে মেলামেশা বা কথাবার্তা বলার হুকুম ছিল না।

হঠাৎ একদিন শুনলাম, পাশের চৌদ্দরশি গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে মুকুন্দ দাস এসেছেন পালা গাইতে। মনটাই খারাপ হয়ে গেল শুনে। এত কাছে থেকেও মুকুন্দ দাসের গান শুনতে পাব না! এ দুঃখ যে কোনদিনই যাবার নয়।

শাসকদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হলেও সাধারণ মানুষের কাছে আমরা ছিলাম একটু অসাধারণ। ঘর ছাড়া এই ছেলেগুলোর প্রতি ওদের সহানুভূতি ও মমতার বুঝি সীমা পরিসীমা ছিল না।

কি করে যেন আমার এই আকাঙ্ক্ষার কথাটা পেঁছে গেল জমিদার তনয়ের কানে। গোপনে তিনি খবর পাঠালেন,—রাত ঠিক সাতটার সময় বাইরে আসবেন কুটিরের দরজা খুলে। তারপর যা করার আমিই করব, সব দায়িত্ব আমার।

ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি, তবু কুটির ছেড়ে বাইরে পা দিলাম নির্দিষ্ট সময়ে। তখন বর্ষাকাল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে ঘুটঘুটে

অন্ধকার। তদুপরি পথঘাটে অসম্ভব কাদা। এই কাদা পেরিয়ে আমি যাব কি করে?

আর ভাবতে হল না। তার আগেই জমিদার তনয়ের খাসভৃত্য ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। তারপর সবার অলক্ষ্যে সোজা মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের কাছাকাছি একটা বিশেষ আসনে।

একইভাবে শেষ রাত্রে আবার ফিরে এলাম নিজের কুটিরে। সারা মনে তখন একটা কূলপ্লাবী আনন্দ। এ পরিস্থিতিতে বাস করেও যে মুকুন্দ দাসের গান শুনতে পাব একথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরদিন দুপুর নাগাদ থানার কাছ দিয়েই মুকুন্দ দাসের নৌকো ফিরে চলেছে ভাঁটির টানে। ছইয়ের উপর খালি গায়ে বসে স্বয়ং মুকুন্দ দাস। আমাদের দুজনের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান তখন দু-তিন হাতের বেশী নয়।

পাছে তাঁকে বিপদে পড়তে হয়—তাই হাত তুলে নমস্কার করতে সাহস পেলাম না। শুধু মাথাটা একটু নোয়ালাম নমস্কারের ভঙ্গীতে। তিনিও সাড়া দিলেন সেই একই ভঙ্গীতে। চোখে স্থির অপলক দৃষ্টি। তারপরই তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। বোধহয় ভাবছিলেন, এই পরাধীন দেশে আজ কত ছেলে বাপ-মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে এমনি অন্তরীণ জীবন যাপন করছে, কে তার খবর রাখে। এত অত্যাচার এত নির্যাতন, একি বৃথাই যাবে। 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন!'

আজ যাত্রা শিল্পীদের কদর, অনেক হাঁক-ডাক। কিন্তু এত হাঁক ডাক সত্ত্বেও এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যাকে মুকুন্দ দাসের সার্থক উত্তরসূরী বলা চলে। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য।

এ প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মোহিত মৈত্রের আত্মোৎসর্গের কাহিনীও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৩৩ সালের মে মাসের কথা। তখন বিপ্লবী বন্দীদের অনশন চলছে আন্দামান সেলুলার জেলে।

আজকের মত সেদিনের অনশনে মাইক, প্যাণ্ডেল ও ফুলের মালার এত সমারোহ ছিল না। ছিল শুধু অনমনীয় বিপ্লবী চরিত্রের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। তাই আদর্শের জন্য তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করে দিতে ওঁদের এতটুকুও বাধে নি। প্রমাণ—অনশনে প্রাণ উৎসর্গকারী যতীন দাস, রামরক্ষা, হরেণ মুন্সী, মোহনকিশোর দাস, মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রমুখ শহীদবৃন্দ।

এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৭ই মে অনশনের ফলে প্রাণ দিলেন শহীদ ভগৎ সিং-এর সহকর্মী মহাবীর সিং। ২৬শে মে—মোহনকিশোর দাস। সবশেষে সঙ্গীত শিল্পী মোহিত মৈত্র। এ প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রে কি লেখা রয়েছে দেখা যাক।

আন্দামানে আর একজন বন্দীর মৃত্যু

সিমলা, ২৯শে মে—অদ্য অপরাহ্নে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত গভর্নমেন্ট দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, বাংগালার বৈপ্লবিক কার্যাবলী সম্পর্কে দণ্ডিত মোহিতমোহন মৈত্র নামক অপর একজন বন্দী গত ২৮শে মে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছে।

দণ্ডাদেশের পর তাঁহাকে আন্দামান সেলুলার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১২ই মে তিনি অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন এবং ১৯শে মে তাঁহার নিউমোনিয়া দেখা দেয়। এই রোগেই নয় দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনশন ধর্মঘটের ফলে তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।

[আনন্দবাজার : ১-৬-৩৩]

এ তো গেল সরকারী ভাষ্য। কিন্তু আসল ঘটনা কি। কি ঘটেছিল সেদিন সবার অলক্ষ্যে। মোহিতের সহবন্দীগণ কর্তৃক প্রকাশিত 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' পুস্তিকা থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'ফর্সা তীক্ষ্ম চেহারার মোহিতের সুন্দর দর্শন, তাঁর প্রাণোচ্ছল কথাবার্তা, হাবভাব ও সুকণ্ঠ সংগীত আশেপাশের সকলকে বিমোহিত করতো।

কারাদণ্ডের প্রায় এক বছর কাল আলিপুর জেলের স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যান্য বন্দীদের সংগে তাঁর দিন কাটে। এই সময়েই গানে গল্পে হাসিতে উচ্ছ্বাসে মোহিতের প্রাণোচ্ছলতার সংগে সকল বন্দীর পরিচয় ঘটে।

মোহিত ছিল সকলের বন্ধু অজাতশত্রু। জেল জীবনের কঠোর ক্লেশকে মোহিত গানে গানে সরস করে তুলতেন। একা গাইতেন, দল বেঁধে গাইতেন—গানের আসরে সবাইকে টেনে আনতেন। গান ছিল মোহিতের প্রাণ, মোহিতের প্রাণ ছিল গানময়।

১৯৩৩ সালে অনশন সংগ্রাম শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে মোহিত আলিপুর জেল থেকে আন্দামান সেলুলার জেলে আসেন। এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৭ই মে তারিখে বলপূর্বক খাওয়াবার নাম করে যে বর্বর প্রাণ হত্যার কাজ চলে, মোহিত তারই শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রথমে যন্ত্রণা, তারপর জ্বর।

নিউমোনিয়া ব্যাধির সংগে মোহিতের চলে দীর্ঘ দশদিনব্যাপী লড়াই। জেল হাসপাতালে মোহনকিশোরের পাশাপাশি একটি আলাদা কেবিনে তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহ মৃত্যুর সংগে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে গেছে। বন্ধুপ্রিয় মোহিত সেই চরম দিনগুলিতেও তাঁর প্রিয় মুখগুলোর কথা ভোলেনি।

সিরাজুল হক, কালিপদ রায়—এদের নাম ধরে ধরে ডেকেছে মৃত্যুর আগে। গানের সুর ভেজেছে সেই যমুনা নদীর উদাসী আবহাওয়ায় লালিত কণ্ঠে তাঁর

সেই প্রিয় গানের কলি—'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়…'

তারপর ২৮শে মে এমনি গানের কলির ক্ষীণ আওয়াজ ক্ষীণতর হয়ে তাঁর জীবন প্রদীপের যবনিকাকে টেনে দিল।

শহীদ মোহিতের জন্য সেদিন অন্ত্যেষ্টির কোন ব্যবস্থা হয়নি। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁর জীবনহীন পবিত্র দেহটি ভারী পাথরে ভারাক্রান্ত করে কসাইয়ের দল এবারডীন উপকূলে গভীর সমুদ্রে হিংস্র হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল।

কিন্তু সুদর্শন সুগায়ক, প্রাণোচ্ছল মোহিত শহীদ হয়ে চিরজীবী হয়ে আছে। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগর কালোনী আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করে চলেছে।'

পাশাপাশি মনে পড়ে চট্টগ্রামের সেতার শিল্পী স্বদেশ রায়ের আত্মোৎসর্গের কথা। সে ইতিহাস তোমাকে আমি শোনাব আরও কিছুক্ষণ পরে। এখন বরং আগের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

দীনেশ গুপ্ত প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই। পরবর্তী শহীদ পাশের কনডেমড জেলে বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের দায়িত্বশীল সৈনিক রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

যুব বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।

কোথায় গেল সেদিন জেলার শ্রেষ্ঠ শক্তিকেন্দ্র পুলিশ আর্মারি! কোথায় গেল সেখানকার শত শত সশস্ত্র প্রহরীর দল!

কোথায় রইল রেলওয়ে অকজিলিয়ারী ফোর্স আর্মারি! কোথায় টেলিগ্রাম আর টেলিফোন ভবন!

সব তখন বিপ্লবীদের দখলে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল চোখের পলকে। তারপর মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সেই ভস্মরাশির উপরেই উত্থিত হল বিপ্লবী ভারতের জাতীয় পতাকা।

২২শে এপ্রিল ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধ।

একদিকে মেসিনগান সহ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ এবং সুর্মা ভ্যালি রাইফেলস্, অন্যদিকে পঞ্চাশ-ষাটটি বিপ্লবী তরুণ। একমাত্র ভরসা তাদের স্বল্প পাল্লার রাইফেল।

মাস্টারদার নির্দেশে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ছাত্র নেতা লোকনাথ বল।

এ প্রসঙ্গে জালালাবাদ যুদ্ধের সেনানায়ক লোকনাথ বল পরবর্তীকালে যুগান্তর পত্রিকায় (স্বাধীনতা সংখ্যা) কি বক্তব্য রেখেছিলেন দেখা যাক:

"বাইশে এপ্রিল প্রাতে দীর্ঘ পথ পার হবার পর জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে

আশ্রয় নিয়েছি। ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের আয়ত্তে আসে। তারপর বিভিন্ন পাহাড়ে আমরা দিন কাটাই। এই ক'দিন আহার জোটেনি। পাহাড়ের ঘোলাজল এবং বুনো কাঁচা আম ছিল আমাদের পানীয় ও আহার।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ওঠার সময়ে অনেক গ্রামবাসী আমাদের দেখেছিল। কাজেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুলিশ এবার আমাদের খুঁজে পাবে। দুর্যোগের জন্য মনের দিক থেকে তাই আমরা তৈরী ছিলাম। অবশ্য তিনদিন ধরে অভুক্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। দেহের দিক থেকে আমরা ক্লান্ত।

বেলা অনুমান পাঁচটা। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষীরা বিপদ-ধ্বনি বাজিয়েছেন। সবাই পাহাড়ের চূড়ায় জড়ো হলাম। দেখলাম, একদল সৈন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

আমরা মরিয়া হয়ে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়ালাম। সৈন্যবাহিনী আমাদের নিশানার মধ্যে আসতেই গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হল।

আমাদের গুলিবর্ষণ শুরু হতেই সৈন্যরা পিছু হটতে লাগল। কিছুটা দূরে তারা পেল একটি পাহাড়ী খাদ। সেখানে তখন জল ছিল না বললেই চলে। সেই খাদে ঢুকে তারা পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল।

প্রায় পনের মিনিট যুদ্ধ চলার পর আমরা হঠাৎ লুইশগানের গুলি বর্ষণের আওয়াজ শুনলাম। গুলিবর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠল।

আমার পাশে আমার ছোট ভাই হরিগোপাল (টেগরা) আহত হয়ে ঢলে পড়ল। বলে গেল, 'দাদা, আমি চললাম। তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ কর।'

দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মতি কানুনগো আহত হয়ে ধুলোয় গড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি।

তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে তিনবার হুইসেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ষণের আওয়াজ থেমে গেল। আমরা 'লাইইং ডাউন পজিশন' থেকে লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্য-বাহিনী পলায়ন করছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ পুনরায় শুরু হল। আমাদের বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। উঃ! সে কি বিজয়োল্লাস!

তিনদিনের অভুক্ত, পরিশ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণায় কাতর জন পঞ্চাশেক বিপ্লবী

(তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পনের-ষোল বছরের কিশোর) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং মৃত্যু নেশায় মত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন একদিকে—আর অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, রণবিদ্যায় পারদর্শী, বহু যুদ্ধবিজয়ী ব্রিটিশের সৈন্য-বাহিনী। তাই সে মুহূর্তের জয়লাভ বিপ্লবীদের ইতিহাসে কম গৌরবের নয়।''

২৪শে এপ্রিল প্রাণ দিলেন অনমনীয় বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দী।

৬ই মে কালারপোল সংগ্রামে প্রাণ দিলেন আরও চারজন। দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন এবং স্বদেশ রায়।

এই স্বদেশ রায়ের কথাই আমি উল্লেখ করেছিলাম একটু আগে। আসলে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের একজন উদীয়মান সেতার শিল্পী।

কোনদিনই তিনি বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কোনরকম বৈপ্লবিক শিক্ষাও তাঁর ছিল না। ঐতিহাসিক ১৮ই এপ্রিল তারিখে দূরে থেকে রাইফেলের শব্দ শুনে নিজে থেকেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন পুলিশ আর্মারিতে। দাবী ছিল একটাই। আমাকেও একটা সুযোগ দিন মাস্টারদা। আমিও লড়াই করে প্রাণ দেব দেশের জন্য।

স্বদেশ রায় তাঁর কথা রেখেছেন। পুলিশ আর্মারি, জালালাবাদ পাহাড় ইত্যাদি সংঘর্ষে বীরের মতই তিনি লড়াই করেছিলেন। পরিশেষে কালারপোল সংগ্রামে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে, শিল্পী শুধু সেতার বাজাতেই পারে না; দরকার হলে প্রাণও দিতে পারে দেশের জন্য।

১লা সেপ্টেম্বর চন্দননগর সংঘর্ষে প্রাণ দিলেন জীবন ঘোষাল। ধরা পড়লেন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল আর আনন্দ গুপ্ত। স্বামী-স্ত্রী সেজে যারা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, সেই শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীও (পুঁটুদি) বাদ গেলেন না। তাঁরাও একই সঙ্গে ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে।

লক্ষ্য করো, এর কোন ঘটনার সঙ্গেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস জড়িত নয়। কিন্তু কেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর এই বেমানান নিঃশব্দতার কারণ কি।

উত্তর দিয়েছেন যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষ। আমি পড়ে শোনাচ্ছি :

'রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিল কলেজের বৃত্তি পাওয়া বিজ্ঞানের ছাত্র। ঐ বছরের (১৯২৯) শেষ ভাগে বোমা বিস্ফোরণের 'ক্যাপ' তৈরী করবার সময় অকস্মাৎ তার হাতে বিস্ফোরণ হয় এবং রামকৃষ্ণ গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে অপসারিত করা হয় ও তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

অল্প কয়েকদিন পরেই রামকৃষ্ণের গোপন বাসগৃহের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং একদিন প্রত্যূষে পুলিশ ঐ বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু পুলিশ আসবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই রামকৃষ্ণকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়।

এইভাবে লুকোচুরি খেলার ন্যায় বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের কয়েকবার প্রতিযোগিতা হয় এবং প্রত্যেকবারেই পুলিশ পরাজিত হয়েছে। অবশেষে মাস্টারদার নির্দেশে রামকৃষ্ণকে গ্রামাঞ্চলের একটি গোপন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ স্থানে কয়েক মাসের মধ্যেই রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে নীরোগ ও সুস্থ হয়ে ওঠে। [অগ্নিযুগ : পৃ—১০৬]

এই হল আসল ঘটনা। আসলে বোমা বিস্ফোরণের ফলে রামকৃষ্ণ গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, যার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন কোন অভিযানে অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সুস্থ হবার সংগে সংগেই তাঁর অন্য চেহারা। আর দেরী নয়। এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সর্বস্ব পণ করে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। ইতিপূর্বে বিনয় বসুর গুলিতে পুলিশের আই. জি. লোম্যান নিহত হয়েছিলেন সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। সম্প্রতি তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন মিঃ ক্রেগ। সেই ক্রেগ তখন চট্টগ্রামে। উদ্দেশ্য—বিপ্লবীদের দমন করা।

খবরটা অজানা রইল না চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রমুখ অন্যতম নায়কদের।

আসামী অর্ধেন্দু গুহ তখন জামিনে মুক্ত। সকাল দশটায় কোর্টে হাজির হয়ে আদালত শেষে আবার তিনি ফিরে যান নিজের বাড়িতে। তাঁর মাধ্যমে সংগে সংগে খবর চলে গেল মাস্টারদার কাছে। ক্রেগকে টার্গেট করুন। লোকটা কিছুতেই যেন প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে চট্টগ্রাম থেকে।

সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে যুব-বিদ্রোহের অন্যতম অংশীদার অর্ধেন্দু গুহ কি বক্তব্য রেখেছেন শোনা যাক :

"সেই বছরের ৩০শে নভেম্বর বিচারের সময় কাঠগড়ার ভিতরে গণেশদা ও অনন্তদা আমাকে বলেন, আজ রাত্রেই যে করে হোক, মাস্টারদার কাছে যেতে হবে। তাঁকে বল; বাংলার পুলিশ প্রধান ক্রেগ বিশেষ কাজে গোপনে চট্টগ্রাম এসেছে এবং আগামীকাল সন্ধ্যায় কোলকাতা মেলে আবার ফিরে যাবে। ক্রেগ যেন ফিরে যেতে না পারে, চট্টগ্রামেই থেকে যায়,—তার ব্যবস্থা যেন মাস্টারদা অবশ্যই করেন।

দাদাদের কথায় আমি বুঝলাম, আমার উপর কঠিন দায়িত্ব পড়েছে। সময় মাত্র একদিন। মাস্টারদার কাছে যেতে হবে; তাঁকে বলতে হবে, কর্মী স্থির করতে হবে; তাদের গ্রাম থেকে এনে নিরাপদে ট্রেনে তুলে দিতে হবে,

ইত্যাদি।

যাই হোক; কোর্ট ছুটির পর আমার অনুসরণকারী ছয় গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাত্রে গিয়ে মাস্টারদার সাথে দেখা করলাম। সব শুনে মাস্টারদা তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দৃঢ়তার সংগে বললেন—এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হবে। একদিনের মধ্যে সব বন্দোবস্ত করা যতই কঠিন হোক, নিশ্চয়ই সব করা হবে।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কালীদা (কালীপদ চক্রবর্তী) এবং রামকৃষ্ণদাকে (রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) নিয়ে অপূর্ব সেন ও শচীন সেন শহরের এক গোপন স্থানে উপস্থিত হন। এঁরা দুজনেই পলাতক এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী।

বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বে রামকৃষ্ণদা বোমা তৈরী করার সময় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, এখন সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠেছেন।

ব্যবস্থামত আমি তাঁদের সংগে মিলিত হয়ে গণেশদা ও অনন্তদার কাছে শোনা ক্রেগের চেহারার বিবরণ, অন্যান্য সব উপদেশ এবং নির্দেশ তাঁদের জানালাম এবং তাদের ট্রেনে নিরাপদে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

[সূর্য সেন স্মৃতি : পৃঃ—১৫৪]

পরের কাহিনী বলার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গী কালীপদ চক্রবর্তীকে এগিয়ে দিচ্ছি।

"২৯শে নভেম্বর, ১৯৩০ সাল।

কোয়েপাড়ার বিনয় সেনের বাড়ির দোতলার ছাদে আমি ও বন্ধুবর বিনোদ দত্ত পলাতক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলাম। এমনি দিনের এক দুপুরবেলায় বিনয়দা এসে বললেন যে, আমাদের দুজনের কালবিলম্ব না করেই নদীর ওপারে যেতে হবে।

শ' পাঁচেক হাত দূরেই নদী। মুহূর্তেই বিনয়দার সাথে বেরিয়ে পড়লাম এবং সাম্পানে চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে নদীতীরস্থ মণীন্দ্র মজুমদার মশায়ের বাড়ি এসে উঠলাম। মজুমদার মশায়ের বাড়ির এক কামরায় ঢুকতেই চোখে পড়ল পলাতকদের অনেকেরই সমাবেশ। ওখানে মাস্টারদা, নির্মলদা, রামকৃষ্ণ, শৈলেশ্বর প্রমুখ বসে আছেন। শচীন সেনও উপস্থিত ছিল। আমরা দু'জন একধারে বসে পড়লাম।

মাস্টারদা বলেছিলেন যে, শচীন খবর এনেছে, মামলার তদ্বির উপলক্ষে বাংলার পুলিশপ্রধান টি, জে; ক্রেগ গোপন সফরে চট্টগ্রাম এসেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই তিনি কোলকাতায় ফিরে যাবেন। অতএব, অবিলম্বে তাঁকে ইহজগৎ থেকে যেন সরিয়ে দেওয়া হয়।

গত আগস্ট মাসে বাংলার পুলিশপ্রধান মিঃ লোম্যান বিনয় বোসের গুলিতে

নিহত হন। মিঃ ক্রেগ ঐ জায়গায় বহাল হয়েছেন। তিন মাসের মধ্যেই যদি মিঃ ক্রেগকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একদিকে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনে এক গভীর প্রেরণা সঞ্চারিত হবে, আবার অন্যদিকে শাসকমহলে ভীতি ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করবে। অতএব অবিলম্বে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মাস্টারদা বলে চললেন যে, ঐ কাজ সফল-ভাবে সম্পন্ন করার কাজে লেদু (রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) ও পণ্ডিতকে (কালীপদ চক্রবর্তী) দায়িত্ব দেওয়া হল। ঐ গুরুদায়িত্ব বহন করার এদের যোগ্যতা সম্পর্কে কারও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না—এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন

এরপর মাস্টারদা কাজের খুঁটিনাটি সব আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, বোমা থেকে নিশ্চিত হল রিভলবার। রিভলবার দিয়ে গুলি ছুঁড়লে লক্ষ্যভ্রষ্ট খুব কমই হয়ে থাকে। তাই রিভলবার ব্যবহার করা হবে সমীচীন।

যদি দেখা যায় অকুস্থলে অনেক লোক জড়ো হয়েছে কোন প্রকারেই লক্ষ্যের কাছে পৌঁছান সম্ভব হচ্ছে না, কেবলমাত্র তখনই বোমা ব্যবহার করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে রিভলবার নিয়ে ধাওয়া করা হবে যুক্তিসঙ্গত। ঐ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে লক্ষ্যবস্তুকে নাগালের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। বোমার আঘাতে যদি লক্ষ্যবস্তু খতম হয়ে যায় তাহলে খুবই ভাল কথা—ইত্যাদি বলে মাস্টারদা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। খেয়েদেয়ে নিলাম। দুপুর রাতেই আমাদের রওনা হতে হবে।

রাত তখন প্রায় বারটা। নাইট্রো গ্লিসারিন পাউডার দিয়ে তৈরী এলুমিনিয়াম সেলে পূর্ণ করা বোমা ও ওয়েভলি রিভলবার নিয়ে আমরা দু'জন রওনা হলাম। শচীন আগে আগে, তার পেছনে রামকৃষ্ণ। তারপর আমি।

এগুতে লাগলাম। অন্যান্য বন্ধুরা পেছনে পেছনে আসছে। পুকুর-পারের আমতলায় আসতেই থমকে দাঁড়ালাম। মাস্টারদা এগিয়ে এলেন। বিদায় নিতেই মাস্টারদা বলে উঠলেন, 'না মেরে ফিরবে না'।

একটা অব্যক্ত অনুভূতি আমার সমগ্র সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। শ্রদ্ধা জানালাম। বিদায় নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কয়েক মিনিট পরেই শচীনের ইঙ্গিতে আমরা তিনজনই সাম্পানে চড়ে বসলাম।

উজান বেয়ে সাম্পান চলেছে। ঘোর অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্রগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। ওপারের গাছগুলো অন্ধকারের ঘোমটা টেনে যেন আমাদের বিদায় দিচ্ছে।

তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। গন্তব্যস্থানে পেঁছোতেই সাম্পান থামল। শচীনের ইঙ্গিতে বাকলিয়ায় নামলাম। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে গিয়ে সড়কে উঠলাম। কাতালগঞ্জস্থ রামকৃষ্ণের কলেজ সহপাঠী সরোজ রায়ের বাড়ি গিয়ে পেঁছলাম।

আগে থেকেই আমাদের আগমনবার্তা সরোজ রায়কে দেওয়া হয়েছিল। ডাকতেই সে উঠে এসে দরজা খুলে আমাদের দু'জনকে দোতলায় নিয়ে এল। পাটী বিছান ছিল, আমরা শুয়ে পড়লাম।

সকাল প্রায় সাতটার সময় অর্ধেন্দু গুহ এসে হাজির হলেন। আমাদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা হল। আলাপের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল আমাদের আশু কর্ম-কাণ্ডের ওপর।

আলোচনার ফল দাঁড়াল এই যে, আমরা দু'জন আজ বিকেল চারটের সময় মোটরযোগে কুমিরা স্টেশনে চলে যাব। কুমিরা স্টেশন থেকে আমরা সীতাকুণ্ড ও কলকাতার টিকিট কাটব।

সেদিন যদি ক্লেগ না যায় তাহলে আমরা সীতাকুণ্ডে নেমে পড়ে কুমিরায় ফিরে আসব। ঐভাবে তার পরদিনও এর পুনরাবৃত্তি হবে। সেদিনও যদি আগের দিনের মত ব্যর্থকাম হই তাহলে মনে করব যে, ক্লেগ স্বস্থানে ফিরে গেছে এবং আমরাও যথাস্থানে ফিরে আসব।

ইত্যবসরে ঐ মুহূর্ত থেকে কোতোয়ালী, ডি আই বি অফিস, জেলখানা ও রেলওয়ে স্টেশনে ক্লেগের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের তরফ থেকে যেন সতর্ক পাহারা মোতায়েন রাখা হয়। আর রাত্রি নয়টার ট্রেনে চড়ে 'পাহারাদারদের' একজন আমাদের যেন সঠিক খবর জানায়।

অর্ধেন্দু গুহকে আরও বলা হয় যে, যদি সম্ভব হয় প্রথম শ্রেণীর কামরার চাবি যোগাড় করে চারটার আগেই আমাদের কাছে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অর্ধেন্দু গুহ বিদায় হলেন।

খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা বিধায় সকালবেলার নাস্তা খাওয়া যেমন সম্ভব হয়নি, দুপুরবেলাও তার অন্যথা হল না

বিকেল চারটার সময় একটা মোটর ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। আমাদের পরনে ছিল ধুতি, গায়ে ছিল সার্ট ও কোর্ট এবং সবুজ ও লাল রঙের এক একখানা আলোয়ান। পায়ে ছিল কেড্‌স্‌ সু। ঐ নিয়ে আমরা দুজন গাড়ীতে চড়লাম, গাড়ীখানা লালদীঘির পাড়ে এনে পাম্প করে গাড়ীতে তেল নেওয়া হল। আমরা যে কোন দুর্ঘটনার জন্য সতর্ক রইলাম।

তেল নেওয়ার পর মোটরখানা শোঁ-শোঁ করে চলল কুমিরার দিকে। প্রায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা কুমিরা বাজারে নামলাম। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে কুমিরা স্টেশনে গিয়ে পায়চারি করতে

লাগলাম।

গাড়ী আসার তখনও অনেক দেরী। গাড়ী কুমিরা স্টেশনে পৌঁছাতে সাড়ে নয়টার কম হবে না। তখনও প্রায় আরো দু'ঘণ্টা দেরী ছিল। সময় কাটতে লাগল। টিকিট কাটার সময় হলে টিকিট করা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র স্টেশন বিধায় কোলকাতার টিকিট পাওয়া গেল না। অগত্যা লাকসামেরই টিকিট কাটা হল।

দূর থেকে গাড়ীর উজ্জ্বল আলো নিকটতর হতে লাগল। আমরা দু'জন তৈরী হয়ে নিলাম। স্টেশনে গাড়ী এসে থামতেই তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা থেকে সুশীল সেন নেমে এল। সতর্কতার সাথে সে বলল যে, প্রথম শ্রেণীর ঐ কামরায় ক্রেগ উঠেছে দেখলাম, কামরার পাশে প্ল্যাটফরমের ওপর বন্দুক কাঁধে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

'এই যে ক্রেগ তা তুমি বুঝলে কি করে?' জবাবে সে বলল যে, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি, ডি এস পি ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ তাকে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিল। চেহারাটা কেমন জিজ্ঞেস করলে সুশীল জবাবে বলে যে, লোকটা লম্বা, ওভারকোট গায়ে, খাকী পোশাক পরিহিত ইত্যাদি বলে ক্রেগের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল।

তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। স্টেশনের পর স্টেশন পার হলাম। ফেণী জংসন অতিক্রম করলাম। লাকসামে গাড়ী থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে কোলকাতার টিকিট করে নিলাম। চাঁদপুরগামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় উঠে বসলাম। পাশেই ছিল ক্রেগের কামরাটি। গাড়ী এগিয়ে চলেছে চাঁদপুরের দিকে।

মাস্টারদার সেই কঠোর আদেশটুকু বারবারই মনে পড়ছিল। অনিশ্চয়তা, দ্বিধা সেই আদেশের অগ্নিশিখায় পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। কর্তব্য পালনের দৃঢ় সংকল্পে মন আপ্লুত ও সিক্ত হয়ে উঠল। চাঁদপুরে হোক, স্টিমারে হোক, গোয়ালন্দ ঘাটে হোক বা শিয়ালদহ স্টেশনে হোক, যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে, সেখানেই তাকে মারা হবে। সে যেন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে না পারে—এই দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান হয়ে উঠলাম।

ভোর চারটায় গাড়ী এসে থামল চাঁদপুর স্টেশনে। গাড়ীর গতি শ্লথ হতেই যাত্রীরা সব নেমে পড়ছে। আমরাও নেমে পড়লাম।

নেমেই দেখি, ক্রেগের কামরার সামনে প্রায় ৩০ জন লাঠিধারী পুলিশ একটা বেষ্টনী তৈরী করে দাঁড়িয়েছে। ক্রেগের কামরার ভেতর থেকে খাকী পোশাক ও হ্যাটপরা আমাদের দিকে পেছন ফেরা একটি লম্বা লোক প্ল্যাটফরমে নামছে এবং পুলিশরা তাকে সালাম জানাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন আলোগুলোর অস্পষ্ট আলোকে তা দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমরা উভয়েই বেষ্টনী ভেদ করে দুহাত-আড়াই হাতের মধ্যে লোকটার উপর গুলি চালালাম। গুলির শব্দে সব লাঠিধারী পুলিশ মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। প্ল্যাটফরম সম্পূর্ণ খালি।

গুলিবিদ্ধ হয়ে লোকটা দৌড়াতে চেষ্টা করল। যেন হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ান, মৃত্যু-পূর্বের বাঁচবার শেষ প্রচেষ্টা। পেছনে আমরা প্রায় তার পিঠের উপর ব্যারেল বসিয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। গুলি ছোঁড়ার বিরাম নাই; দুজনে বার রাউণ্ড গুলি চালিয়ে চেম্বার খালি করলাম।

রাইফেলের গুলির মত ওয়েভলির এক একটা গুলিতে লোকটার পৃষ্ঠদেশ ঝাঁজরা ঝাঁজরা হয়ে গেল। লোকটা হুমড়ি খেয়ে 'বাবা গো গেলুম' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এটা যে ক্রেগ নয়, কথাটা স্বতঃই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে উভয়েই রিভলবারে গুলী ভরলাম। রামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে আবার বলে উঠলাম, 'এ লোক ক্রেগ নয়, চল সরে পড়ি; এ মরে গেছে।' ভুল খবরের ওপর নির্ভর করে কাজ করেছি মনে করলাম।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়ান গাড়ীর দুই বগীর ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে আমরা দু'জন পরপর পার হলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অচেনা পথে এগিয়ে যেতেই নদীর কিনারায় ছিটকে পড়লাম। একটা গুলিরও আওয়াজ শুনতে পেলাম।

নদীর কিনারা থেকে উঠে সেই একই পথে (অবশ্য পথ নয়) পা বাড়ানোর উদ্যোগ করতেই রামকৃষ্ণকে বললাম, 'আমরা আক্রান্ত হতে পারি, সিগার জ্বালাও।' কারণ হল, বোমা বিস্ফোরণ করতে হলে সিগারেটের আগুন বিস্ফোরক তুলায় বা সলিতায় অগ্নিসংযোগ করেই বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়।

সিগারেট জ্বালান হল। সতর্কতার সাথে ফিরে এলাম আবার সেই প্ল্যাটফরমে। অবাক হলাম। জনমানবহীন প্ল্যাটফরম, স্টেশনটি যেন সুপ্ত নগরী। কেবলমাত্র তারিণী মুখার্জির মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গেছে দেখলাম।

এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে; যখন তারিণীর ওপর গুলিবর্ষণ চলছিল, ক্রেগ তখন লুকিয়েছিল তার কামরার ভেতর। প্রাণভয়ে সে ছিল আতঙ্কগ্রস্ত। তারিণী হত্যার মুহূর্ত পরও তা যদি জানতে পারতাম, তাহলে তার কামরার ভেতর ঢুকে পড়তাম। তাকে তার জীবন দিয়েই যেতে হত।

অথবা সে যদি দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রাণরক্ষার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে দেখতাম, তাহলে তার সেপাই লোকজন পরিত্যক্ত এই সুপ্তপুরীতে শেষ চেষ্টা করে যেতাম—হয় সে মরত, না হয় আমরা মরতাম। মাস্টারদার কঠোর আদেশ লঙ্ঘন করতাম না।

খবর যে দিয়েছে, সে ঠিক খবরই দিয়েছিল। তারিণী মুখার্জী নামবার একটু পরেই ক্রেগ নামত। মনে হয়, তারিণী মুখার্জি ক্রেগকে গ্রহণ করার দায়িত্ব বহন করার জন্য হয় লাকসামে ক্রেগের কামরায় উঠেছে, অথবা গাড়ীর বেগ না থামতেই গাড়ীতে উঠেছে। আমরা কিন্তু তাকে গাড়ী থেকে নামবার সময়ে মাত্র দেখেছিলাম। তারিণী তার প্রাণ দিয়েই ক্রেগকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

পরে মামলা চলাকালীন ক্রেগ তার সাক্ষে বলেছিল যে, তারিণীর ওপর গুলি-বর্ষণ করতে সে আমাকে দেখেছে এবং সে আমাকে গুলি করেছে।

এটা সত্যি যে, গুলি চলাকালীন সে যদি লুকোন অবস্থায় না থেকে থাকে তাহলে অবশ্য সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সে আমাকে গুলি করেছে তা মিথ্যে মনে হয়। কারণ, সে যখন গুলি করে তখন আমরা দূরে নদীর কিনারায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে। তখনই মাত্র আমরা একটি গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনেছিলাম।

গুলি করেছে ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যহীন অবস্থায়। ইজ্জত বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই গুলি ছুঁড়েছে। গুলি ছুঁড়েছে নিম্নপদস্থ বা সমপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন না হবার উদ্দেশ্যে। তারিণীর ওপর গুলি-বর্ষণ কালীন সে লুকিয়ে যে প্রাণরক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল তাই হল বাস্তব সত্য।

যাহোক, আমরা আক্রান্ত হলাম না। চারিদিক জনমানবহীন সুপ্তপুরী। পুলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পুলের গোড়ায় টিকিট কালেক্টার রজনী দাশ দাঁড়িয়ে আছেন। নিকটে এগুতেই তিনি টিকিট চাইলেন। পকেট থেকে কোলকাতার টিকিটখানা খুঁজে বের করতে দেরী হচ্ছিল বলে তিনি লাকসাম থেকে চাঁদপুরের ভাড়া বার আনা চেয়ে বসলেন।

আমরা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। আমি যখন টিকিট দিচ্ছিলাম, রামকৃষ্ণ আমার পেছনে আমাকে গার্ড দিচ্ছিল। রামকৃষ্ণ যখন টিকিট দিচ্ছিল, তখন আমি তাকে গার্ড দিচ্ছিলাম। স্টেশনের চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চলছিল।

আমরা দুজন পুলের উপর উঠলাম। লোকজনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। পুল পার হয়ে চাঁদপুর বাজারে পেঁছিলাম। সেটা বাজার কিনা তা অজ্ঞাত অনুমানের উপর নির্ভর করে বললাম। সেখানে দু-একটা কেরোসিনের আলো মিটমিট করে জ্বলছিল। রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ অচেনা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার চতুর্দিকে বিরাজ করছিল। আবার ফিরলাম। এবার রেল লাইন, ধরে সোজাসুজি হাঁটতে শুরু করলাম চট্টগ্রামের দিকে।

১লা ডিসেম্বরের ভোরবেলা। সবুজ রঙের আলোয়ানটা ছিল আমার গায়ে জড়ান। লাল রঙের আলোয়ানটা জড়ান ছিল রামকৃষ্ণের গায়ে।

শীতের কুয়াশা ভেদ করে রেল লাইন ধরে এগুচ্ছি। স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করলাম। লাইনের পাশে এক স্টেশনে ট্রেনভর্তি সশস্ত্র এক পুলিশ-বাহিনী চাঁদপুরের দিকে চলছে দেখলাম।

প্রায় বেলা ১০টার সময় আঠার মাইল দূরে হাজিগঞ্জ স্টেশন অতিক্রম করে এক চায়ের দোকানে উঠলাম। কথা প্রসঙ্গে জানতে পেলাম, চাঁদপুরে এক এস ডি ও গুলিতে নিহত হয়েছে। আমাদের উভয়ের মন খুবই খারাপ; বিষাদ ও ক্লান্তিতে মন ভারাক্রান্ত।

এবার রেল লাইন ছেড়ে ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে শুরু করি। পথে স্কুলের ছাত্ররা যে স্কুলে যাচ্ছে তা দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। পথ চলার ক্লান্তি এসে গেছে। পথে সামান্য একটু বিশ্রাম নিলাম।

মিনিট কয়েক পর আবার হাঁটতে শুরু করি। এমন সময় দুজন সাধারণ ইংরেজ আমাদের অতিক্রম করে গেল। রামকৃষ্ণ বলল যে, এদের খতম করে দেব নাকি! তারা তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

ঐ পথ ধরে কিছু কিছু মোটরকার আসা-যাওয়া করছিল। আমাদের গন্তব্যস্থল চট্টগ্রামের দিকে, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কুমিল্লার দিকে। ঐভাবে আমরা ২২ মাইল পথ অতিক্রম করলাম।

মেহের কালীবাড়ি স্টেশনের পেছন দিকে রাস্তা ধরে চলছিলাম, হঠাৎ একখানা মোটরকার আমাদের থেকে সাত-আট হাত দূরে ঝট্ করে থেমে পড়ল। এবং এ এস পি-র পরিচালনায় ঝট্ ঝট্ করে ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেলে।

লাল ও নীল র‍্যাপার গায়ে জড়ান দুই যুবক যাচ্ছে এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।

পুলিশদল সব দিক দিয়ে তৈরী ছিল। ঝাপটিয়ে বোমা ও রিভলবার ছিনিয়ে নেয়। রাস্তার পাশে মাঠে আটকান জলে বোমা ডুবিয়ে রাখল। এবং অস্ত্রাগারের রিভলবার দেখে এ এস পি আনন্দে লাফিয়ে ওঠে এবং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল যে, এরাও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী।

সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মারধোরও হল। হাতকড়ি পরিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে আমাদের মোটরে তোলা হল। মোটরখানি চলছিল বিদ্যুৎগতিতে। কয়েক মিনিট পর এ এস পি তার সোফারকে বলে যে, এরা ওকে মারতে আসেনি, এরা মারতে এসেছিল অপর একজনকে।

শোনামাত্র ক্রেগ যে গাড়িতে ছিল তাতে আর সন্দেহ রইল না। একটা আফশোষ, দুঃখ ও একটা অব্যক্ত বেদনা মনটাকে পিষে মারতে লাগল। রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালাম। গভীর একটা বেদনার ছাপ তার চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে মনে হল।

শোঁ শোঁ করে মোটরখানা ছুটছিল। প্রায় পাঁচটায় সময় কুমিল্লা শহরে এসে পৌঁছলাম। আনন্দের আতিশয্যে এ এস পি কুমিল্লার পুলিশ সুপার মিঃ মায়ের বাসার সামনে যেন শিকার দেখাবার উদ্দেশ্যে মোটরশুদ্ধ আমাদের হাজির করে। সুপার তার নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করল যে আমাদের দুজনকে ফাঁসিতে লটকান হবে।

এর দু-এক মিনিট পরই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ডি আই বি অফিসে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন এসে জিজ্ঞেস করলেন—ঐ রিভলবার আমাদের কিনা। আমরা সরাসরি অস্বীকার করে বসলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলি লগ্নে আমাদের ঢোকান হল কুমিল্লা জেলের সেলে। কাপড়-চোপড় সব খুলে নিয়ে আমাদের জাঙ্গিয়া, কোর্তা, পরানো হল, পাছে কাপড়ের সাহায্যে ফাঁসিতে লটকে আত্মহত্যা না করে বসি।

সেলে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলাম। সর্বাঙ্গ ক্লান্তিতে জড়সড়, তবুও ঘুম আসছিল না। উদ্বেগপূর্ণ চিন্তাজালে যেন জড়িয়ে পড়েছি। ক্লেগ যে ছিল তা বারবারই মনে পড়ছিল।

ক্লেগ তার কামরায় লুকিয়ে আছে জানতে বা বুঝতে পারলে মনের তখনকার অবস্থায় আক্রমণ না করে ছাড়তাম না। ক্লেগের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও হয় সে মরত, না হয় আমরা মরতাম। আফশোষে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

গভীর রাত্রে আমাদের দুজনকে জাগান হল। নিয়ে আসা হল গেটের অফিস কামরায়। ইয়োরোপীয় পোষাক পরিহিত দুজন ইংরেজ চেয়ারে বসে আছে তা চোখে পড়ল। একজন একজন করে আমাদের দুজনকে তাদের সামনে হাজির করা হল।

তাদের মধ্যে একজন বাংলায় আমাদের নাম-ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে চলে। চাকরী করার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় যাচ্ছি বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম।

বাংলায় কথা বলার লোকটা হল চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মিঃ সুটার। অপরজন আর কেউ নয়, মিঃ ক্লেগ স্বয়ং। একটা রোষমিশ্রিত আফশোষ মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আমাদের চেহারাটা দেখে যাওয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে হল। এরপর আবার আমাদের দুজনকে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

সেলগুলোর একপাশে আমি, অপর পাশে রামকৃষ্ণ। ছয়টি সেলের মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া ছিল। কথা বলা তো দূরের কথা, পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাওয়াটাও দুঃসাধ্য। খাওয়ার সময় কয়েক মিনিটের জন্য সেলের দরজা খোলা থাকলেও ২৪ ঘণ্টা সেলের দরজা বন্ধ রইল।

পরদিন সকালবেলা টিফিনে রুটি ও গুড় খেলাম। দুপুরের খাওয়ার

সময় পুরাতন লৌহ থালায় অপরিষ্কার ভাত-তরকারী পরিবেশন করায় খেতে অস্বীকার করলাম।

জেলার ও জমাদার তাড়াতাড়ি ছুটে এল। অভিযোগের জবাবে জেলার বললে যে, আপনাদের জন্য এলুমিনিয়ামের নতুন থালা-বাটি দেওয়া হচ্ছে এবং কংগ্রেস আন্দোলনের বন্দীদের রান্নাঘর থেকে আপনাদের খাওয়া আসবে—ঐ নিশ্চয়তা দেওয়ার সাথে সাথেই তা কার্যকরী করা হল দেখে আমরা খাদ্য গ্রহণ করলাম।

ঐভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল। ৯ই ডিসেম্বর সকালবেলা জেল-ডাক্তার গোপনে বললেন যে, আগের দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয় বোস, বাদল ও দীনেশ গুপ্ত বাংলা জেলসমূহের প্রধান মিঃ সিমসনকে গুলি করে হত্যা করেছে। শুনে খুবই আনন্দ পেলাম সত্যি, সাথে সাথে ব্যর্থতার বেদনায় নিজেদের ধিক্কার দিলাম।

এরই মধ্যে একদিন এক বিকেলবেলা আমাদের দু'জনকে কাপড়চোপড় পরিয়ে জেলের এক প্রাঙ্গণে নেওয়া হয়। সেখানে আইন অমান্য আন্দোলনের ৫০-৬০ জন বন্দীর সাথে মিশিয়ে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে সকলের সাথে আমাদের সারিবন্ধভাবে দাঁড় করান হল।

চাঁদপুরের প্রায় ছয়-সাতজন রেলওয়ে খালাসী-শ্রমিক আমাদের দু'জনকে সনাক্ত করল। টিকিট কালেক্টর রজনী দাশ বলল যে, সে কাউকেই চিনতে পারছেনা, অথচ সেই চিনতে পেরেছে। ভয়ে হোক বা দেশপ্রেমের প্রভাবে হোক, সে আমাদের সনাক্ত করল না। আমাদেন দু'জনকে আবার সেলে ফিরিয়ে নেওয়া হল। সেলে আমরা আবার বন্ধ হলাম।

সাতাশ দিন পর এক গভীর রাত্রে আমাদের দু'জনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জেলগেটে নিয়ে আসা হল। এক গুর্খা হাবিলদারের নেতৃত্বে প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র পুলিশদল কোথায় যেন আমাদের নিয়ে চলেছে বুঝতে পারছিলাম না। খানিক পর গাড়ীখানা চাঁদপুরের দিকে ছুটছিল, তখন বুঝতে বাকি রইল না যে আমাদের নেওয়া হচ্ছে কলকাতায়।

গোয়ালন্দগামী জাহাজে আমাদের তোলা হল। ডেকের একপাশে কর্ডন দিয়ে আমাদের মাঝখানে বসান হল। গোয়ালন্দে জাহাজ ভিড়বামাত্র আমাদের নামান হল এবং তোলা হল কলকাতার ট্রেনে।

রাত প্রায় নয়টায় শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে অপেক্ষমান বন্দীভ্যানে করে রাত প্রায় দশটায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ঢুকান হয়। আইরিশ জেলার সোয়ানসাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন এবং ১৩ নং সেল ওয়ার্ডে নিয়ে আমাদের সেল বন্ধ করা হয়।

পরদিন ভোরবেলা ঐ ওয়ার্ডে অস্ত্রআইনে ধৃত আরও তিনজন বিচারাধীন

রাজনৈতিক বন্দীর সাথে দেখা হয়। খানিক পর জেলার ও জমাদার এসে সামনের ১৪নং সেলওয়ার্ডে সিগ্রিগেট করা হল। ওখানে অসুস্থ অবস্থায় দীনেশ গুপ্ত ছিলেন। তাঁর সেলের সামনে পাহারারত এক ইয়োরোপীয় সার্জেণ্ট চেয়ারে বসে আছে দেখলাম। এছাড়া জেলসিপাহীও মোতায়েন রাখা হয়েছিল। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঐ ১৪ নং ওয়ার্ডে আমরা সংখ্যায় দাঁড়ালাম তিনজন।

আলিপুর কোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। একজন ইংরেজ, একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম বিচারক নিয়ে এক বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে। মিঃ গার্লিক হলেন বিশেষ আদালতের সভাপতি।

আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞের অভাব অনুভব করতে লাগলাম। রামকৃষ্ণের পরিচিত উকিল বিনোদবাবুকে লেখা হল যে, তিনি যেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মামলার দিন যেন তিনি কোর্টে হাজির থাকেন—এই অনুরোধ তাঁকে জানান হল।

বিচারের দিন আমাদের যখন কোর্টে হাজির করা হয়, তখন দেখা গেল যে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য দু'জন ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র সহ বিনোদবাবু কোর্টে হাজির হয়েছেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, মামলা চালানোর ব্যাপারে সুভাষবাবুই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

মামলা শুরু হল। জাল দিয়ে ঘেরা ডেকের মধ্যে আমরা আবদ্ধ।

পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন বাঁড়ুজ্জের আগুন-ঝরানো ও রোমাঞ্চকর বর্ণনাসহ বক্তৃতা শুনলাম। তারিণী মুখার্জির রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝরা করা পোষাকগুলো বিচারকদের সামনে দেখান হল। প্ল্যাটফরমে নিক্ষিপ্ত কার্টিজের খোলগুলিও বাদ গেল না।

অস্ত্রবিশেষজ্ঞকেও আনা হয়েছে। ধোঁয়ামাখা চোঙা দুটো দিয়ে কার কোন কোন বুলেট দেহ বিদ্ধ করেছে—তারও মত পেশ করা হল। চাঁদপুরের খালাসী-শ্রমিকেও সাক্ষ্যপ্রদান করল।

ক্রেগ সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আমাকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছেন এবং তিনিও আমাকে গুলি করেছেন বলে সাক্ষী দিলেন এবং সনাক্ত করলেন।

খানিক পর ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী এসে আমাকে বললেন যে, আমার সম্পর্কে আর কোন আশা করা যায় না। জবাবে আমি বললাম যে, ভাবনা বা উদ্বেগের কিছুই নেই, কি হতে পারে বা না পারে তা আগে থেকেই আমাদের জানা হয়ে আছে।

এটা সত্যি যে, ক্রেগ সাক্ষ্য না দিলে, বা সনাক্ত না করলেও প্রমাণ করবার উপাদান এত বেশী ছিল যে এর পরিণতি যে মৃত্যুদণ্ড তা বুঝতে পেরে-ছিলাম।

ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র বিভিন্ন কৌশলে জেরা করতে এবং যুক্তি পেশ করতে কোন কার্পণ্য করেন নি। আমাদের তরফ থেকে জবানবন্দী পেশ করার পূর্বে ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী আমার কাছে এসে বললেন যে, আমি যেন আমার বয়স ১৭ বৎসর বলি। রামকৃষ্ণের ইচ্ছে ছিল, সাহসিকতাপূর্ণ একটা বিবৃতি (বোল্ড স্টেটমেন্ট) পেশ করা, কিন্তু ব্যারিস্টারদ্বয় এতে মত দিলেন না

প্রথমে রামকৃষ্ণের জবানবন্দী নেওয়া হল। তার বয়স ২০ বৎসর বলতে বিচারকেরা তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না, কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় চট্টগ্রামে বিভাগীয় বৃত্তিলাভের রেকর্ড অনুযায়ী বিচারকেরা তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন এবং বিশ বৎসর বলে মেনে নিলেন।

আমি আমার জবানবন্দী পেশ করার সময় বললাম যে, রামকৃষ্ণ যা যা বলেছে, সেটা আমারও বক্তব্য। বয়স জিজ্ঞেস করলে ১৭ বৎসর বললাম। বিচারকমণ্ডলী বারবার আমার চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৭ বৎসর বলে মেনে নিলেন।

বাস্তবে আমি রামকৃষ্ণের চাইতে দুই বৎসরের বড় ছিলাম। কিন্তু আমাকে শশ্রু-গুম্ফহীন ষোল-সতের বৎসরের এক যুবকের মতই দেখাত। অথচ রামকৃষ্ণ বয়সে আমার চাইতে চোট হলেও চেহারা ও আকৃতির দিক দিয়ে আমার চাইতে লম্বা ছিল, তাকে হৃষ্টপুষ্ট এক ২৩-২৪ বৎসরের যুবকই মনে হত। অধিকন্তু, সে একজন ভাল খেলোয়াড়ও ছিল। তাই, যখন সে তার বিশ বৎসর বয়স বলে জবানবন্দী পেশ করে, তখন বিচারকেরা তা বিশ্বাস করতে চান নি।

মামলা চলাকালীন পর পর রামকৃষ্ণের মা, বাবা মারা যান। অতি প্রিয়জনের মৃত্যুতেও তাকে ভারসাম্য হারাতে দেখি নি। যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে সে ধরে নিয়েছে। মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে অথচ উৎকণ্ঠার লেশমাত্র ছিল না, বরঞ্চ সে বলত যে, বিশ বৎসর কারাভোগের চাইতে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেওয়া শতগুণ শ্রেয়। সে গৌরবজনক মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করে। মৃত্যুর পর সে আবার জন্মগ্রহণ করবে। ১৬-১৭ বৎসর বয়সে সেই নতুন জীবনে নতুন তেজ ও শক্তি নিয়ে ইংরেজ ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যাবে।

ভুলের জন্য আমরা দুজনই অনুতপ্ত ছিলাম। ঐ ভুলের একটা সান্ত্বনা খুঁজতে আমি চেষ্টা করতাম। মনে প্রশ্ন আসত এই যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রে, ক্ষীণ হলেও আঘাত পড়েছে কিনা। রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করে দেওয়ার কাজে ঐ ভুলটুকুও কোন সাহায্য করেছে কিনা, অথবা আন্দোলনকে এগিয়ে বা পিছিয়ে দিয়েছি কিনা। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হত, রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল করে দেওয়ার কাজে বা আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে এ নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে।

যেমন আমাদের পূর্ববর্তী প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষুদিরাম, গোপীনাথ ভুল করা সত্ত্বেও তাঁদের কর্মকান্ড আন্দোলনকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা আজও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে রয়েছেন, শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসনে তাঁরা আজও আসীন হয়ে আছেন। এ ধরনের চিন্তার সাহায্যে আমি সান্ত্বনা লাভ করতে চেষ্টা করতাম।

সেদিন ছিল সরস্বতী পূজার দিন। জেলের রাজবন্দীরা মিলে সরস্বতী পূজার উৎসব করছিলেন। বিকেলবেলা জেলার আমাদের দু'জনকে পূজা-মন্ডপে নিয়ে গেলেন। অবশ্য এভাবে নিয়ে যাওয়াটা বেআইনী হলেও জেলারের সহানুভূতি ও রাজবন্দীদের প্রভাবের ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল।

আমরা দু'জন রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে প্রবেশ করলে সকল রাজবন্দীরা আমাদের স্বাগত জানালেন। কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর সুভাষবাবু একান্তে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা হাইকোর্ট করব কিনা। প্রয়োজনবোধে হাইকোর্ট করার চেষ্টা করব বলে মত প্রকাশ করলাম। এর কিছু পর আমরা আবার সেলে ফিরে এলাম।

জবানবন্দী পেশ করার দু-তিনদিন পরই রায় দেওয়ার দিন ধার্য হল। সেদিন ছিল শনিবার। দুপুরবেলা আমাদের দু'জনকে কোর্টে হাজির করা হল। বিচারকমণ্ডলী সবাই কালো পোষাক পরিহিত এবং বিচারাসনে উপবিষ্ট। মনে হল এক অনিশ্চিত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট গার্লিক রায় পড়ে শোনালেন, রামকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ড—যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আমার স্বল্প বয়স বিধায় ভুল পথে অন্যের দ্বারা পরিচালিত বলে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হল। এই বলে প্রেসিডেণ্ট বিচারের রায় পড়া শেষ করলেন।

আমাদের ব্যারিস্টার মিঃ বি. সি. চৌধুরী ছুটে এলেন আমাদের কাছে। হাইকোর্টে আপিল রুজু করা হবে বলে তিনি বললেন। এ কথা বলতেই রামকৃষ্ণ বলে উঠল যে, এর সম্বন্ধে যেন কোন আপিল করা না হয়। একজন যে বেঁচে গেছি—এই যথেষ্ট—আমাকে উদ্দেশ করে বারবারই সে এ কথাগুলো বলে চলে।

ভাবলাম, কি অদ্ভুত! নিশ্চিত মৃত্যুর খড়্গ ঝুলছে মাথার ওপর। তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, উদ্বেগ নেই, আমাকে বাঁচাবার জন্য তার সমগ্র সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। একেই বলে সত্যিকারের বিপ্লবী। যে আদর্শ এ রকম লোক তৈরী করতে পারে, সেই আদর্শের প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম।

দু'জনকে মোটরে করে জেলগেটে নিয়ে আসা হল। এখন আমাদের ছাড়া-ছাড়ির পালা। একজন যাব আঁকা-বাঁকা অনিশ্চিত জীবনের দিকে, আরেকজন

যাবে মৃত্যুহীন মৃত্যুর দিকে।

কথা বলতে পারছিলাম না, বুকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায় নিলাম। আমাকে বোম ইয়ার্ডে নেওয়া হল, সেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হয়েছে। তাঁরা এক গভীর উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিয়ে আমাদের দু'জনকে একপলক দেখবার উদ্দেশ্যে দোতলার বারান্দার উত্তরপার্শ্বে ফাঁসির সেলে যাওয়ার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখামাত্রই তাঁরা আনন্দে ফেটে পড়লেন। তাঁদের ভাবাবেগে আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, নূতন জাঙিয়া-কোর্তা পরিহিত রামকৃষ্ণকে ফাঁসির সেলে ঢোকান হচ্ছে।

প্রায় তিন মাস পরের কথা।

হাইকোর্টে আপিল চলছিল। প্রতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক রাজবন্দীও আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ডাঃ নারায়ণ রায় ছিলেন আমাদের সাথে। তাঁদের খাতির ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আইরিশ জেলার সোয়ানসাহেবকে প্রভাবান্বিত করে এক নির্জন দুপুরবেলায় জেলার এসে আমাকে রামকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ করাতে নেয়। জেলার তার চাকরী হারাবার ঝুঁকি নিয়েও এই বিপজ্জনক কাজ করেছিল।

প্রথমে ফাঁসির সেলওয়ার্ডে ঢুকতেই ফাঁসি প্রতীক্ষারত দীনেশ গুপ্তের সাথে দেখা হল। হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারার লোক যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছেন।

'কেমন আছেন ?'—জিজ্ঞেস করতেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। জেলার ওখানে দাঁড়াতেই দিল না। রামকৃষ্ণের সেলের দরজার সামনে আসতেই চোখে পড়ল তার আশেপাশে অনেকগুলো বই ছড়ান রয়েছে, সে পড়ে চলেছে। আমাকে দেখেই বসতে বলল।

'কেমন আছ। শুকিয়ে গেছ' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। 'ভাল আছি' জবাবে বললাম।

সে বলতে লাগল যে, 'আমি তিন মাসে যা পড়েছি, সারা জীবনেও তা পড়ি নি। তুমিও পড়, দু-একটা ভাষা শিখে নাও। তাকে যে কি বলব, তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জেলার জোর তাগিদ দিতে লাগল। হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম।

হাইকোর্টেও মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল। এক দুপুরবেলা শুনলাম যে মিঃ গার্লিক বিচারকার্যে যখন ব্যস্ত, তখন এক যুবক আদালতে প্রবেশ করে গার্লিকের কপাল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলির আঘাতে গার্লিক নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত যুবকটিও আত্মত্যাগের এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত রেখে যান। অনেককাল ধরে এ যুবকের নাম কেউ জানত না।

কলকাতার পার্টি সিদ্ধান্ত করেছিল যে, দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস যেন ফাঁসির আগে শুনে যেতে পারে যে গার্লিক আর ইহজগতে নেই। পার্টি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেছিল। দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ গার্লিকের মৃত্যুর খবর শুনে যেতে পেরেছিল।

এ সময়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার প্রমুখ বীর নারীরা রামকৃষ্ণের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাড়িতে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো দৈনিক খবরের কাগজে বের হতে থাকে। এদের ফাঁসি মকুবের জন্য আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।

সুপ্রীম কোর্টেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল রইল। জনসাধারণের দাবী জোরদার হয়ে উঠছে দেখে শাসকমহল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। জুলাই মাসের প্রথম দিকে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল। জেলের ভেতরই তার মরদেহ দাহ করা হয়।

রামকৃষ্ণ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হবার দরুণ দুবার তার ফাঁসি স্থগিত রাখতে হয়। পরের বার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও গোপনে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার পূর্বেই খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমরা সতর্ক হয়ে রইলাম।

ফাঁসির পূর্বে জেলের চতুর্দিক অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা ঘেরাও করা হয়। কারণ, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রদ করার আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠছিল।

রাত ১২টায় ফাঁসিমঞ্চের আলোগুলো জ্বলে উঠল। লোহার খুঁটি ও বীম ইত্যাদি মঞ্চে লাগান হল। রামকৃষ্ণের সেল থেকে কিছু কিছু আওয়াজও ভেসে আসছিল।

রামকৃষ্ণকে সেলের বাইরে নিয়ে আসার সময় সে 'বন্দেমাতরম' 'ইনকিলাব, জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলতেই সারা জেলের রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ আওয়াজে সারা জেল কাঁপিয়ে তোলে।

ইনকিলাব বলতেই মঞ্চের লিভার টেনে দিল, গুড়ুম করে পড়ার এক আওয়াজ শোনা গেল। দেখলাম, দড়িখানা ঝুলছে ও একটু একটু নড়ছে। খানিক পরে মৃতদেহ বের করে জেলের ভেতরেই জ্বালান হল।

রামকৃষ্ণ ছিল প্রতিভাদীপ্ত এক সংগঠক। সে ছিল জ্ঞানপিপাসু অধ্যয়নশীল এবং বলিষ্ঠদেহী এক খেলোয়াড়। সে ছিল বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান এক বিপ্লবী। তার স্মৃতি অমর হোক।

এরই এক বৎসর পর আমি গেলাম আন্দামান, যাবজ্জীবন নির্বাসনে। প্রায় ১৬ বৎসর কারাভোগের পর বেরিয়ে এলাম দিনের আলোয়।

এর কিছুদিন পরই আবার বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হলাম, প্রায় সাড়ে তের

বছর কাটালাম জেলে—মোট ২৯ বৎসর গেল চার দেওয়ালের মাঝখানে।

সেদিনকার ও তার পরবর্তী দিনগুলোর প্রতিরোধ সংগ্রামের চিহ্নগুলো সর্বাঙ্গে আজো অঙ্কিত রয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেয় অবিস্মরণীয় দিনগুলো, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আজিকার কর্তব্য। মাস্টারদা, রামকৃষ্ণ ও হাজারো শহীদের রক্তসিক্ত পতাকাখানি আজও এ বার্ধক্যেও বহন করে চলেছি। এ চলার শেষ কোথায় তা সম্পূর্ণ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বিশ্রাম অসম্ভব।'

[১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের স্মারক পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত]

কিন্তু সেই কাজিন সিস্টারের কি হল, যিনি প্রায় প্রতিদিনই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন পুলিশের অনুমতি নিয়ে।

কে এই কাজিন সিস্টার। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সার্থক অধিনায়িকা অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

আত্মবিসর্জনের পূর্বে এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর ডায়েরীতে কি লিখে রেখে গেছেন দেখা যাক :

"১৯৩০ সালে পড়বার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে এসেছিলাম। আমার কোন বিপ্লবী ভাই-এর নির্দেশে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হলাম। মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ। দেশকে ভালবাসার অপরাধে ব্রিটিশ কানুনের বন্দী রামকৃষ্ণ ফাঁসির আগ্রহে অপেক্ষমান।

আমি 'কাজিন সিস্টার' সেজে কোনক্রমে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আদায় করলাম। প্রত্যেকদিন যেতাম হাসিখুশি সপ্রতিভ ঐ বীরকে দেখার জন্য।

তাঁর ফাঁসি মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আমি অন্ততঃ চল্লিশটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। তাঁর সমাহিত রূপ, অকপট আলাপ-আলোচনা, মৃত্যুর তপস্যায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, দ্বন্দ্বহীন ভগবৎ ভক্তি, শিশুসুলভ সারল্য, প্রেমস্নিগ্ধ হৃদয়াবেগ, গভীর জ্ঞান, নিবিড় আত্মানুভূতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দুঃসাহসিকতার পথে চলবার সামর্থ্য আমার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল ৪ঠা আগস্ট (১৯৩১) ভোর রাত্রে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

ব্যাপারটা প্রীতিলতার অজানা। তাই সেদিন বিকেলেই আবার তিনি যথারীতি জেলগেটে গিয়ে হাজির। আমি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের কাজিন সিস্টার। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—তার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটি।

—দেখা হবে না! প্রীতিলতা অবাক, দেখা হবে না কেন?

—আজ ভোরে তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

ফাঁসি! প্রীতিলতা অসাড় নিস্পন্দ! তাঁর চোখের সামনে পরিচিত জগৎটা কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে, মিলিমেশে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

"রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর সক্রিয়ভাবে কোন অ্যাকশনে যাবার আগ্রহ আমার প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চলে এসেছিলাম। দুর্জয় ইচ্ছা—মাস্টারদার সঙ্গে পরিচিত হবার। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দাঁড়ালাম এসে দুটি অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের কাছে। তাঁরাই পরিচালনা করছেন প্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংস্থাকে। তাঁরা হলেন মাস্টারদা ও নির্মলদা (নির্মল সেন)।"

কথা রেখেছিলেন প্রীতিলতা। মাত্র কিছুদিন বাদে তিনি যে কি অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন সে তো আজ সবারই জানা। বলা বাহুল্য তার পেছনে ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা।*

দীনেশ এবং রামকৃষ্ণ দুজনেই চলে গেলেন। এবার ডাক এল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের।

আগেই বলেছি, অর্থাভাবের দরুণ তখনকার দিনের বিপ্লবীদের বাধ্য হয়েই মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করতে হতো। ১৯৩২ সালের প্রথমদিকে এমনি একটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুরেন করের নেতৃত্বে, যা 'চরমুগুরিয়া মেল ডাকাতি' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। সুরেন কর ছাড়াও সেদিন এ ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবল রায়, সন্তোষ দত্ত, রামচন্দ্র দাস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ।

---

* রামকৃষ্ণ বিশ্বাস মহানায়ক সূর্য সেনের প্রিয় শিষ্য। 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রামে জন্ম। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিভাগীয় বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেলের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে একজন ইন্সপেক্টারকে হত্যার অপরাধে ১৯৩১ সালের ৪ঠা আগস্ট ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ দেন।' সমালোচকদের মতে তারিখটা ভুল। কারণ, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঐ প্রামাণ্য গ্রন্থ। তারা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছেন প্রায় এক বছর বাদে ১৯৩২ সালের ২রা মার্চ।

পরিণাম শুভ হয়নি। হৈ-চৈ শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘেরাও হয়ে পড়লেন পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের হাতে। বেষ্টনী ভাঙতে গিয়ে নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন কিশোর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। হাতে তাঁর উদ্যত ছোরা।

কিছুতেই কিছু হল না। ছোরার ঘাতে একজন নিহত হলেও কেউ রেহাই পেলেন না জনতার হাত থেকে। ফলে, সবাইকেই ধরা পড়তে হল পুলিশের হাতে।

এ সম্বন্ধে সেদিন সংবাদপত্রে কি প্রকাশিত হয়েছিল দেখা যাক।

চরমুগুরিয়া ডাকঘর আক্রমণের জের

'মাদারীপুর, ১৫ই মার্চ—চরমুগুরিয়া ডাকঘর আক্রমণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানা গেল, ডাকাতেরা মোট ৮০০০ টাকা হস্তগত করিয়াছিল। তন্মধ্যে পুলিশ ৪০০০ টাকা উদ্ধার করিয়াছে।

ডাকাতরা পালাইয়া যাওয়ার সময় তাহির খাঁ নামক এক ব্যক্তি জনৈক ডাকাতকে ধরিয়া ফেলে। এমন সময় অপর একজন ডাকাত আসিয়া তাহাকে ছোরার আঘাত করে। আহত হইয়া তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জনতা কর্তৃক ঢিল নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে পাঁচ জন ডাকাত ভূপাতিত হইয়াছিল। ইহারা ধৃত হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম—ব্রিজহরির সুরেন্দ্র মোহন কর, হরিকাঠির মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (এই দুইজনই হাসপাতালে আছে); কলিকাতার সুবলচন্দ্র রায় এবং ঢাকা তেজপুরের শান্তি ও অপর একজন।'

[আনন্দবাজার : ১৬-৩-৩২]

বিচারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। দলনেতা সুরেন করের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সুবল, সন্তোষ, রামদাস—সবাইকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

এবার আপীল। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চরমুগুরিয়া ডাকাতির মামলা

প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল

ফরিদপুর ১২ই জুন, চরমুগুরিয়া ডাকলুঠের মামলা সম্পর্কে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে মনোরঞ্জনকে এখান হইতে বরিশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। (আনন্দবাজার : ১৩-৬-৩২)

আপীল অগ্রাহ্য করলেন মহামান্য হাইকোর্ট। না, কোন ভুলচুক হয়নি ট্রাইবিউন্যালের বিচারে। সুতরাং সাজা যা দেওয়া হয়েছে তাই থাকবে। অর্থাৎ—প্রাণদণ্ড।

বেশীদিন আর অপেক্ষা করতে হল না মনোরঞ্জনকে। ১৯৩২ সালের ২২শে আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হল বরিশাল জেলের বধ্যমঞ্চে।*

পরবর্তী নায়ক প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। মেদিনীপুরের প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

প্রদ্যোৎ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে তোমাকে বলেছি, তাই কিছুটা সংক্ষেপে আমি তাঁর কাহিনী তুলে ধরছি তোমার কাছে।

প্রকৃতপক্ষে এর মূলে ছিলেন দীনেশ গুপ্ত। ১৯২৭ সালে দীনেশ গুপ্তই একদিন বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি-র একটি শাখা স্থাপন করেছিলেন ঢাকা থেকে মেদিনীপুর গিয়ে। পরিমল রায়, ফণী কুণ্ডু, ফণী দাস, বিমল দাশগুপ্ত, যতিজীবন ঘোষ, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, প্রভাংশু পাল, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ সবাই ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য।

দীনেশকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়েছিল ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে।

সঙ্গে সঙ্গে শপথ নিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ মেদিনীপুরের তরুণবৃন্দ। এর জবাব আমরা দেব। কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা থাকতে দেব না মেদিনীপুরে। যেই আসুক না কেন, তাকেই আমরা কবর দেব মেদিনীপুরের মাটিতে।

১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল প্রথমেই কবর দেওয়া হল দুর্দান্ত জেলাশাসক পেডিকে। আততায়ী বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ বেপাত্তা। উল্লেখযোগ্য, প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দীনেশ গুপ্ত তখনও জীবিত।

১৬ই সেপ্টেম্বর পাল্টা আঘাত এল শাসকদের দিক থেকে। সেদিন হিজলী বন্দীনিবাসে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হল বিনা বিচারে বন্দী সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে।**

* মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসির তারিখ ১৯৩২ সালের ২২শে আগস্ট। উৎস—বিপ্লববাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত কালীচরণ ঘোষ রচিত 'রোল অফ অনার।' সমালোচকদের মতে তারিখটা সন্দেহজনক। কারণ, ভারত সরকারের ইতিহাস তাঁকে ফাঁসি দিয়েছেন দশদিন আগে—১২ই আগস্ট।

** সরকারী প্রচারযন্ত্র আকাশবাণীর সমীক্ষা রচয়িতার মতে—নিহত হয়েছিলেন একজন। তিনি হলেন সন্তোষ মিত্র। সংবাদপত্রের বিবরণ : "গৈলা, ২৪ শে অক্টোবর। আত্মত্যাগী তারকেশ্বরের চিতাভস্ম সমাহিত-করণ উৎসব উপলক্ষে তারকেশ্বরের ঐকান্তিক যত্ন ও সেবায় গঠিত গৈলা সেবাশ্রমে গত ২৪ শে অক্টোবর বৈকালে এক বিরাট সমাবেশ হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সদলবলে বেলা ৪।. টায় আসিয়া উপস্থিত হন।"...

(আনন্দবাজার : ২৮-১০-৩১)

ব্রিটিশ আমলে এই একটি মাত্র ঘটনা, যেখানে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল জেলের অভ্যন্তরে। স্বাধীন ভারতে যে কতজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে, কে তার হিসেব রাখে।

সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে সারা দেশে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হল এই নিয়ে। সব চাইতে বেশী ধিক্কার জানালেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

উত্তরে শোনা গেল ইউরোপীয়ান বণিকসভার সভাপতি ভিলিয়ার্সের সদম্ভ উক্তি—'If another European murdered detenues should be shot.' অর্থাৎ—আবার কোন ইউরোপীয়ান নিহত হলে রাজবন্দীদের এভাবে হত্যা করাটাই উচিৎ কাজ হবে।

উত্তর দিলেন বিমল দাশগুপ্ত তাঁর রিভলবারের মুখে। সেই বিমল দাশগুপ্ত, যিনি মেদিনীপুরের প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করেছিলেন নিজের হাতে। বিচারে দশ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হল বিমল দাশগুপ্তকে। আহত ভিলিয়ার্স প্রাণভয়ে সোজা বিলেত।

হিজলীর ঘটনায় সবচাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হল মেদিনীপুর। কারণ হিজলী মেদিনীপুরেই অবস্থিত। সুতরাং, তাঁদের শপথ—এর জবাব দিতে হবে। বদলা নিতে হবে।

পেডির পরে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন ডগলাস। ওকেই এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের প্রাণ দিয়ে।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল জেলা বোর্ড ভবনে। হঠাৎ সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র ঝলসে উঠল দিকবিদিক কাঁপিয়ে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে।

কাজ শেষ করে ছুটে চললেন দুই বিপ্লবী তরুণ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য আর প্রভাংশু পাল। পেছনে সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী। ঐ যে পালাচ্ছে ওরা। শিগগীর ধরো ওদের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আগুন ছড়ালেন প্রভাংশু পাল। তারপরই এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পাশের গলি দিয়ে। এড়াতে পারলেন না প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। রিভলবার অকেজো হয়ে যাবার দরুণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। সংবাদপত্রের ভাষায়:

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস নিহত

৩০শে এপ্রিল, অদ্য সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস যখন জেলা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, তখন প্রায় তিনবার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। প্রকাশ যে, তাঁহার বাহুতে ও বক্ষস্থলে গুলি লাগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা

হইয়াছে। ডগলাস সাহেব রাত্রি ৯।। টায় মারা গিয়াছেন। এই সম্পর্কে রিভলবারসহ একজন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ১-৫-৩২]

অকথ্য নির্যাতন করা হল বন্দী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের উপর। তোমার সঙ্গীর নাম কি বল। কি তার পরিচয়। কোথায় সে থাকে।

প্রদ্যোৎ নিরুত্তর। ফাঁসি বা দ্বীপান্তর যা খুশি হোক, তবু মন্ত্রগুপ্তি ভঙ্গ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হল সন্দেহবশে। প্রদ্যোতের সঙ্গী প্রভাংশু পাল তাঁদের অন্যতম। এবার সনাক্তকরণ প্যারেড। দেখা যাক, অপর আসামী প্রভাংশু পালকে এবার সনাক্ত করা সম্ভব হয় কিনা।

সেদিন আর আজ এক নয় মল্লিকা। সেই পরাধীন যুগে আর কিছু না থাকলেও গর্ব করার মত আমাদের একটা চরিত্র ছিল, যা আজকের দিনে দুর্লভ। তাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, স্বাধীনতা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু নিয়েছে চরিত্র। সেই মূল্যবোধ আজ একেবারেই হারিয়ে গেছে আমাদের দেশ থেকে।

সেদিনের সেই সনাক্তকরণ প্যারেড সম্বন্ধে জেলাশাসক পেডির অন্যতম হত্যাকারী যতিজীবন ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়জীবন ঘোষ কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

'সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ হয়েছিল এক বুড়ী পানওয়ালী কি করবে তাই নিয়ে। বুড়ী শহরের সতীকুণ্ডের চকে একটি কাঠের বাক্স পেতে পান বিক্রি করত। প্রভাংশু মিঃ ডগলাসকে যখন গুলি করে ঐ চক পার হয়ে ছুটে যাচ্ছিল, বুড়ী তাকে ঠিকই দেখেছিল।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এ সবের কিছু বোঝে না। কারও কাছে গল্প করে ফেলেছিল—'হ্যালো, সে ছেলেকে আমি দেখেছি। দেখতে যেন সাক্ষাৎ ভীম।' ক্রমে বুড়ীর কথা পুলিশের কানে ওঠে। পুলিশ বুড়ীকে লোভ দেখায়—সে যদি সেই ছেলেটিকে চিনিয়ে দিতে পারে, তাহলে তাকে অনেক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আমাদের তরফ থেকে বুড়ীকে বলা হল যে—সে যাকেই দেখিয়ে দেবে, তার ফাঁসি হবে। শুনে বুড়ী বললে—ওমা কি সর্বনাশ! একজন সোনার চাঁদ বাছার প্রাণ যাবে—এ কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না, তা পুলিশ আমায় যত টাকাই কবুল করুক।

বুড়ী কাউকেই সনাক্ত করেনি। এতে প্রভাংশুর পক্ষে খুব ভালই হয়ে গেল। দেখা গেল, গরীব বুড়ী পানওয়ালীর হৃদয় অনেক রাজবাড়ির রূপসী বধূরাণীর চেয়ে ঢের উঁচু ও মহৎ। [বিপ্লবী মেদিনীপুর : পৃঃ—৪০-৪১]

এবার বিচার। বিচারকের সংখ্যা মোট তিনজন। কে. সি. নাগ, ভুজঙ্গধর মুস্তাফী এবং জ্ঞানাঙ্কুর দে। প্রথম দুজনের মতে প্রদ্যোৎ অপরাধী। সুতরাং, তাঁরা সাজা দিলেন—প্রাণদণ্ড। একমত হতে পারলেন না জ্ঞানাঙ্কুর দে। তিনি একটি নতুন নজির স্থাপন করলেন প্রদ্যোতের মামলায়। আলাদা একটি রায় দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন—আসামী অল্পবয়স্ক তরুণ। তাছাড়া তাঁর রিভলবার আদৌ কার্যকরী হয় নি। তাই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

পরদিনই সে খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রাণদণ্ড

অদ্য প্রাতে ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। নরহত্যার অপরাধে আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সে শান্তভাবে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে।

[আনন্দবাজার : ২৫-৬-৩২]

কিন্তু প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে বিচারকরা একমত নন। তার কি হবে?

২২শে আগস্ট মীমাংসা করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। একজন বিচারক ভিন্ন রায় দিলেও তাতে কিছু আসে যায় না। মেজরিটি হিসেবে বাকি দুজনের দেওয়া সাজাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ—প্রাণদণ্ড।

প্রিভি কাউন্সিল, ছোটলাট, বড়লাট ও সম্রাটের কাছে প্রদ্যোৎজননী পঙ্কজিনী দেবীর আবেদন—সব কিছুই হল একে একে, কিন্তু ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ ফাঁসি।

পরের কাহিনী তখনকার সময়ের সংবাদপত্র থেকেই আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি

ভোর পাঁচটায় সব শেষ

'মেদিনীপুর, ১২ই জানুয়ারী, ডগলাস হত্যাকাণ্ড মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি অদ্য প্রত্যুষে পাঁচটার সময় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

ফাঁসির পূর্বে

এইরূপ জানা গিয়াছে যে প্রদ্যোৎ ভোর বেলায় স্নান করে। স্নান করিবার পর সে গীতা পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকা হয়। সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়।

তাঁহার দুই ভ্রাতাকে যখন জেলের ভিতর লওয়া হইল, তখন তাঁহারা গিয়া দেখেন যে, প্রদ্যোৎ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। অবিলম্বে তাঁহাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতে বলা হয়। সে অবিচলিত পদক্ষেপে ফাঁসির

মঞ্চের উপর গিয়া ওঠে, তৎপর ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করিয়া জহ্লাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। [আনন্দবাজার : ১৩-১-৩৩]

প্রদ্যোৎ চলে গেলেন। কিন্তু ইতিহাস জানে যে, কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের সেই কবরখানায় আরো একটি নতুন কবর খুঁড়তে হয়েছিল পেডি এবং ডগলাসের পাশে। সে কথায় আমি আসছি আরো পরে।

এবার তোমাকে বলবো কালীপদ মুখাজীর কথা।

হয়তো খুব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত হবার সুযোগ তাঁর হয়নি, কিন্তু বিপ্লবী চরিত্রের যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন তা চিরকাল অনুকরণযোগ্য।

১৯৩২ সাল। সেদিন চাকুরী জীবনে উন্নতি করার সবচাইতে সহজ পন্থা ছিল দেশবাসীর উপর অত্যাচার করে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খুশি করা। এ ব্যাপারে ঢাকার মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত মহকুমাশাসক কামাখ্যা সেন ছিলেন রীতিমত একজন কৃতী পুরুষ।

ততদিনে লাল দাগ পড়ে গেছে কামাখ্যা সেনের নামের পাশে। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করেছ তুমি কামাখ্যা সেন। তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। যেখানেই পালাও না কেন, তোমার রেহাই নেই।

শেষ পর্যন্ত একদিন পালিয়েই গেলেন কামাখ্যা সেন। আশ্রয় নিলেন ঢাকার নিরাপদ দুর্গে। কিন্তু তারপর! পারলেন কি তিনি বিপ্লবীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে?

তখনকার সংবাদপত্র থেকেই আমি ঘটনাগুলি পরপর তুলে ধরছি তোমার সামনে।

ঢাকায় গুলির আঘাতে মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন নিহত

ঢাকা ২৭শে জুন। মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন অদ্য ভোর ৪টায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। মিঃ সেন কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং উয়ারীতে সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস. এম. চ্যাটার্জীর বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন।

প্রকাশ যে, আততায়ী একটি জানালার মধ্য দিয়া মিঃ সেনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মশারী তুলিয়া খুব নিকট হইতে গুলি করে।

[আনন্দবাজার : ২৮-৬-৩২]

নিহত ম্যাজিস্ট্রেটের লাস কুমিল্লায় প্রেরিত

গতকল্য সকাল বেলা মিঃ কামাখ্যা প্রসাদ সেন গুলির আঘাতে নিহত হন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মিঃ সেনের বিধবা পত্নী ঢাকাতে যাইয়া

তাঁহার স্বামীর শেষ চিহ্ন দেখিতে অসমর্থ হওয়াতে মিঃ সেনের শব একটি বরফের বাক্সে পুরিয়া কুমিল্লাতে প্রেরণ করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহক্রমে এ পর্যন্ত ১৩জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[আনন্দবাজার : ২৯-৬-৩২]

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার জের

ঢাকা এবং কলিকাতায় খানাতল্লাস

গতকল্য বুধবার প্রাতে কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কলিকাতার ৬ খানি বাড়ি খানাতল্লাস করিয়া ৩ জন যুবককে ইলিসিয়াম রোডে লইয়া গিয়াছে। ঢাকাতে যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তৎসম্পর্কেই নাকি এই খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

ঢাকা, ২৯শে জুন। গত ২৭শে জুনের হত্যাকাণ্ডের পর অনেক স্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে। কবিরাজ গণেশচন্দ্র সেনের ঔষধালয় খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ তাঁহার ছাত্র ব্রজলাল নন্দী এবং নিবারণ ভৌমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ফকির গোস্বামী ও ফণীন্দ্র গোস্বামী (দুই ভ্রাতা), যোগেশ চ্যাটার্জী ও কালীপদ চ্যাটার্জী (দুই ভ্রাতা), গেণ্ডারিয়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী, সংগতটোলার যোগেশ দত্ত—ওরফে জাতু, ইউনাইটেড ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সুরেন্দ্র চক্রবর্তী, কালীপদ মুখার্জী, রঞ্জন মোহন দে, মনোরঞ্জন দত্ত, ভবেশ সেন, মনসা দাশগুপ্ত এবং পটুয়াটোলার তড়িৎকুমারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[আনন্দবাজার : ৩০-৬-৩২]

কালীপদ মুখার্জী ধরা পড়লেন একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে। ভাষাটা ছিল রীতিমত সন্দেহজনক। লেখা ছিল—কামাখ্যার অপারেশন সাকসেসফুল, চিন্তার কারণ নেই।

আদালতে সব কিছুই মেনে নিলেন কালীপদ। হ্যাঁ, আমিই মেরেছি কামাখ্যা সেনকে। না না, রিভলবার দিয়ে নয়, পিস্তল দিয়ে। এ ব্যাপারে আর কেউ জড়িত ছিল না আমার সঙ্গে।

পরিষ্কার স্বীকৃতি। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই। তাই আদালত সাজা দিলেন—প্রাণদণ্ড। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সে আদেশ কার্যকরী হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের বধ্যমঞ্চে। সংবাদপত্রের ভাষায় :

কালীপদ মুখুজ্যের ফাঁসি

ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালীপদ মুখুজ্যেকে অদ্য প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৭শে জুন তারিখে হত্যাকাণ্ড হয়। কালীপদর স্ত্রী একটি শিশুপুত্র

প্রসব করিয়া গত ৭ই জানুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীপদ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৭-২-৩০]

হতভাগ্য পিতার একমাত্র সন্তান প্রাণ দিলেন ফাঁসি মঞ্চে। কিন্তু সত্যিই কি কালীপদ হত্যা করেছিলেন কামাখ্যা সেনকে। কক্ষনো না। কামাখ্যা সেনের আততায়ী অন্য লোক।

তাহলে কেন তিনি অপরাধ স্বীকার করে এভাবে প্রাণ দিলেন ফাঁসির দড়িতে? এইখানেই কালীপদর বিশেষত্ব মল্লিকা। ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার কথা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে। সেদিন অন্যতম দলনেতা বারীন ঘোষের লক্ষ্য ছিল—দল বেধে সবাই ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিয়ে সারা দেশে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করা।

কালীপদর লক্ষ্য—একা প্রাণ দিয়ে অন্যান্য দলীয় সদস্যদের রক্ষা করা। নইলে এ মামলায় যে আরো কতজন সতীর্থকে প্রাণ দিতে হত তা কে বলতে পারে।

বিপ্লবী জীবনে কোনটা সত্য মল্লিকা। কোনটা গ্রহণযোগ্য। সে বিচারের ভার তোমাদের উপরই রইল।

এবার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মহান বিপ্লবী সূর্য সেন, যিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন সবার কাছে।

ভারতবর্ষে অগ্নিযুগের সূত্রপাত ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সেটা ছিল বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর। তারপর সে ইতিহাস ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে চরম পরিণতির দিকে। প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক ও চিন্তাবিদ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ব্যাপী এই ইতিহাসকে কিভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন দেখা যাক।

'পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য করা যায়। (ক) প্রথম হল, রাষ্ট্র-প্রতীক বা ব্যক্তিবিশেষ নিধন পর্ব (Stage of individual murder), (খ) দ্বিতীয় হল, বাধ্যতামূলক সম্মুখ-সংঘর্ষ পর্ব (Forced open fight), (গ) তৃতীয় হল, খণ্ড অভ্যুত্থান পর্ব (Insurrection), (ঘ) চতুর্থ হল, বিপ্লব (Revolution) বা শেষ পর্ব।

ভারতবর্ষের প্রথম পর্বের বিপ্লব ইতিহাসে দেখা যায়—দুঃসাহসী যুবকরা প্রয়োজনে ব্রিটিশের স্বজন ও তাঁবেদার, তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা, ইংরেজ শাসনকে না মানা। ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকারের 'র‍্যাণ্ড' নিধন থেকে শুরু করে ১৯১২ সালে রাসবিহারীর

নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল অ্যাকশনই উল্লিখিত কার্যক্রমের অন্তর্গত।

তারপর আসে বিপ্লব-ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব।...যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারটি দুর্জয় সঙ্গীসহ স্থির করলেন—ঘরে আর ফিরে যাব না, পালিয়ে পালিয়ে আর ঘুরব না, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেব।...এরই নাম 'ফোর্সড্ ওপেন ফাইট'। যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ভারতকে দ্বিতীয় ধাপে তুলে দিলেন। শুরু হল সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস।

এল ১৯৩০ সাল। এ বছরেই বিপ্লবের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের সূচনা। সূর্য সেন বিপ্লবী-ভারতকে তৃতীয় ধাপে তুলে দিলেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তাঁর নেতৃত্বে সফল 'ইনসারেক্শান' সংঘটিত করল।

অতঃপর এল চরম মুহূর্ত। ১৯৪১-৪৫ সাল। ভারতীয় বিপ্লব ইতিহাসের এটাই চতুর্থ বা শেষ পর্ব। বিপ্লবের পর্বে তুলে দিলেন বিপ্লবী-ভারতকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজীর অভূতপূর্ব নায়কত্বে 'আজাদ হিন্দ বাহিনীর আবির্ভাব। তারই প্রভাবে বিন্নাল্লিশের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে সার্থক 'বিপ্লব' দিল ব্রিটিশকে এমন আঘাত—যার ফলশ্রুতি হল ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে ব্রিটিশের বহিষ্কার এবং ভারতের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা প্রাপ্তি।'

[ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : পৃঃ—১৪৮-১৫২]

ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের নায়ক মাস্টারদার কথাতেই ফিরে যাই।

১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর মাস্টারদা কি ভাবে শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানা থেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কাহিনী তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। তবে বেশীদিন নয়। বছরখানেক বাদেই তিনি অকস্মাৎ ধরা পড়ে গিয়েছিলেন পুলিশের হাতে। তাঁর নিজের লেখনী থেকেই সে কাহিনীর কিছুটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর।

প্রায় দু'বছর হল abscond করেছি। ঐদিন সকালবেলা ৮টায় সময় Shelter থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের উপর খানিক দূর গিয়ে একটি লেনে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম, একজন লোক গলির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

তার হাবভাব দেখে Spy বলে সন্দেহ হল। মনে করলাম, কলকাতার Spy আমাকে কি করে চিনবে।

সে গলির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় বাসায় ঢুকে কথাবার্তা শেষ করে Shelter-

এ ফিরবার সময় ঐ গলিটা দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর একটা গলির মধ্য দিয়ে Shelter-এ ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি আগের গলিটা দিয়ে ফিরি, তাহলে ঐ Spyটা আমায় আবার mark করতে পারে।

খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই বাসায় যাওয়ার কথা। তাই স্নান করে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৃথক আর একটা গলি দিয়ে উক্ত বাসায় গেলাম। পথে সন্দেহজনক কিছুই দেখলাম না। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছি—এমন সময় দেখলাম, একজন যুবক বাসার সামনের blind laneটা দিয়ে বাসাটা Pass করে চলে যাচ্ছে।

দেখেই সন্দেহ হল। কারণ blind lane দিয়ে সে যাবে কোথায়, বাসাটির পরেই blind lane বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বাসা Pass করে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে Spy বলে সন্দেহ হল।

২।১ মিনিট পরেই দেখি, সে আবার ফিরে আমরা যে room-এ বসেছি তার জানালার ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করল। ও নামের কোন লোক সে বাসায় থাকত না। আমরা 'না' উত্তর দিতে সে চলে গেল। তার জিজ্ঞেস করার ভংগী দেখে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল।

একটু পরে আমি বাসার একটি ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম। সে দেখে এসে বলল—রাস্তার ২।৩ জায়গায় দু'তিন batch plain dress-পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—I. B.-র লোক বলে মনে হচ্ছে। শুনে মনে করলাম, বাসার পর যেখানে laneটা শেষ হয়েছে, সেখানকার ছাদ-দেওয়াল টপকে বেরিয়ে চলে যাব।

দেরী না করে দেওয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, দেখি, যে লোকটি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই লোকটি আমার ৩০।৪০ হাত পেছনে।

সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে। আমি ছাতাটা খুলে চলতে লাগলাম। ঐ লোকটি এক পা দু' পা করে আমার ঠিক পিছনে এসে বলল—'দাঁড়ান মশাই।'

আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সাধারণ গতিতে চলতে লাগলাম। সে আবার আমাকে দাঁড়াতে বলল—আমি কেন দাঁড়াব, জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দিল না এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল।

আমি হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করছি, এমন সময় সে চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লোকদের বলল 'এ একজন ডাকাত, একে ধরুন।'

আর কেউ তাকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার হাত আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। ইতিমধ্যে সে হাত নেড়ে কি একটা ইসারা করল,

আর ৪।৫ জন plain dress-পরা লোক এসে আমায় ভালরূপে ধরে ফেলল।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিল। তারা মোটর ডেকে আমায় তার উপর তুলল। বুঝতে পারলাম, তারা সবাই I. B. Department-এর লোক।

মোটরে তুলে তারা দু'জনে আমার দু'হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট Search করল। বলা বাহুল্য, আমার সংগে incriminating কিছুই ছিল না, পকেটে কয়খানা Forward পত্রিকার Cuttings, আর একটি ক্ষুদ্র Slip-এ ২।৩টি রেলওয়ে স্টেশনের time table লেখা ছিল। দু'হাত ধরে Search করবার সময় তাদের অভদ্র, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল দিলাম, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে Search করে নিল।

আমি গাল দিতে দিতে বললাম—'তোমরা যে পুলিশের লোক, তারই বা নিদর্শন কি? শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে পথের মধ্যে অপমান করছ কেন?'

এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেলা এবং গর্বের ভাব দেখিয়ে সার্টের নীচে কোমরে ঝুলান revolver-টা চাপড়ে বলল—'এই পুলিশের নিদর্শন।'

বললাম—'পুলিশ হলেই কি পথের মধ্যে লোককে অপমান করতে হয়? Elysium Row-তে নিয়ে বড় Officer-দের সামনে Search করলেই হত। আমি সেখানে তোমাদের against এ নিশ্চয় Complain করব।'

তারা চুপ করে রইল, পথে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। 'তোমাদের মত অভদ্রকে আমি নাম বলব না।' নাম না বলার ইচ্ছাটা আগে থেকেই ছিল। এখন তাদের অভদ্রতার সুযোগটাকে না বলার কারণ করে নিলাম।

...দেখতে দেখতে মোটর Elysium Rowতে অবস্থিত Central I. B. Office-এর (13 Elysium Row) গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। উঠানে মোটর থেমে গেল এবং I. B.-এর লোকেরা নেমে গেল।

উঠানে নামামাত্র আমার সংগের একজন I. B. কর্মচারী একজনকে ডেকে বলল, 'রায়সাহেবকে ডেকে আন।'

একটু পরে দেখি, রায়সাহেব ব্রজবিহারী বর্মন অফিসের দোতলা থেকে নেমে উঠানে এসে আমার দিকে ভাল করে ঠাহর করে দেখে বলল, 'Oh! my friend Surjya Babu, I see.'

একে একে অনেক অফিসার এসে আমার নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি কিছুতেই বললাম না। তারা বলল, 'আপনাকে আমরাও চিনেছি, শুধু শুধু নাম ধাম গোপন করে লাভ কি?'

আমি বললাম, 'আপনারা যদি চিনেই থাকেন, তবে আমাকে আর জিজ্ঞেসা করছেন কেন ?" তবু তারা আমার নাম, আমি গত দু'বছর কোথায় ছিলাম ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করতে থাকল।

আমি একটা কথারও জবাব না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নকারীদের সম্বোধন করে বললাম, 'I won't reply to any of your question.' একজন বলল, 'Why ?' আমি উত্তর দিলাম, 'Because I think it is unnecessary.'

কোন সুবিধা করতে না পেরে তারা শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠানে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে আমার ২।৩ টা ফটো তুলে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় I. B.এর যে লোকগুলি আমাকে নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে দু'জন সিঁড়ির নীচে আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন তারা যে মোটরের মধ্যে আমাকে জোর করে Search করেছে, এর জন্য কোন Complain না করি।

তখনকার দিনে detenu-দের পক্ষে জাতীয় সংবাদপত্র খুব জোরে লিখত এবং কোন detenu-র উপর পুলিশ অথবা জেল কর্তৃপক্ষ কোন খারাপ ব্যবহার করলে তার জন্য খুব জোরে প্রতিবাদ চলত। Assembly ও Council-এ তা নিয়ে খুব আন্দোলন চলত। বোধ হয়, সেজন্যই I. B.-র ঐ লোকগুলি আমাকে Complain না করার জন্য এবং তাদের উপর কোন রাগ না রাখার জন্য অনুরোধ করল।

যাক্, আমি তাদের কথার কোন উত্তর দিলাম না। উপরে গিয়ে দেখি, একটা টেবিলের চারদিকে চেয়ার রয়েছে এবং একটা চেয়ারে I. B.-এর Special Superintendent নলিনী মজুমদার আসীন।

কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তাঁকে আগে কোনদিন দেখিনি, ওইদিনই প্রথম দেখলাম। মজুমদার মহাশয় একখানা চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন এবং এতদিন কোথায় ছিলাম ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন।

আমি এসব প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না। ইতিমধ্যে আরও ২।১ জন অফিসার এসে আমার আশেপাশে বসে গেছেন। তন্মধ্যে রায়সাহেব ব্রজবিহারী বর্মণ শ্লেষমিশ্রিত মিহি মিহি সুরে আমাকে বোঝাতে লাগলেন, এতদিন পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কত অসুবিধা ভোগ করছিলেন, এখন আর কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না, জেলের ভিতর বেশ ভাল থাকবেন ইত্যাদি।

শুনে রাগ হল, জবাব দিলাম, You need not bother yourself about that I am wise enough to think of myself.'

কড়া জবাবটি শুনে তিনি থেমে গেলেন। তখন মজুমদার মহাশয় উঠে

telephone ধরে কার সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এই কথাগুলি বললেন, 'চাটগার বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন ধরা পড়েছেন। মনে করেছিলাম, এতবড় একজন নামজাদা লোক, boldly নিজের গৌরবের কাজগুলি এবং আদর্শের কথা বলে যাবেন, কিন্তু দেখছি তিনি তাঁর নাম পর্যন্ত বলছেন না।' ...তারপর টেলিফোনে আরও কি কি কথা বললেন mark করলাম না।

আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য, আমাকে একটু শ্লেষ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে boldly সব বলে ফেলার জন্য আমাকে excite করা। যাক্, তাঁর কোন উদ্দেশ্য সফল হল না। কিছুক্ষণ পর কলিকাতার পুলিশ কমিশনার Mr. Armstrong এল (খুব সম্ভবত তখন Tegart সাহেব ছুটিতে ছিল)। সেও এসে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করল এবং বলা বাহুল্য, আমিও আগের মত জবাব দিলাম। Armstrong চলে গেল।

তখন আমাকে D. I. G. Mr. Lowman এর ঘরে নিয়ে গেল। সে বেশ ভদ্রভাবে Smilingly আমাকে একখানা চেয়ারে বসাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, এতদিন কোথায় কি ভাবে abscond করে ছিলাম।

আমি উত্তরে বললাম, "I was not absconding : I was leading peaceful life.'

শুনে সে মৃদু হেসে বলল, 'We have declared Rs. 1000 for your arrest in last December and you say that you were not absconding. Well I don't like to give you any pressure, you will have no troubles. You are arrested under Bengal Ordinance.'

আমি তাকে জেলে কোন অসুবিধা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে 'না' বলল, এবং বলল, কোন অসুবিধা হলে Additional Deputy Secretary, Political Department, Govt. of Bengal অথবা আমাকে জানাবে।

Address গুলি একটুকরা কাগজে লিখে দিল। মোটের উপর খুব ভদ্র ব্যবহারই Lowman করল। আবার নলিনী মজুমদারের অফিসে ফিরে গেলাম। [বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতি : পৃঃ ৭—১২]

গ্রেপ্তারের পরেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেদিনীপুর জেলে, তারপর ভারতের বিভিন্ন জেলে।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য নিরঞ্জন সেনগুপ্তের বক্তব্যের কিছুটা অংশ তুলে ধরছি তোমার সামনে। তাঁর এই বক্তব্য থেকে মাস্টারদার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক সহজেই তুমি খুঁজে পাবে আশা করি।

"রাজবন্দী অবস্থায় সূর্য সেনকে প্রথম রাখা হয় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সতীশ পাকড়াশি, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী যুবনেতারাও তখন সেই জেলে। মেদিনীপুরে পেঁছানোর পর সূর্যবাবুর সঙ্গে গণেশ আমার পরিচয় করিয়ে দিল। খুব অমায়িক গণেশের এই মাস্টারদা। তাদের চাটগাঁ দলের নেতা, অথচ বোঝবার কারু সাধ্যি নেই। কথায় কোন ঝংকার নেই, কোন ব্যাপারেই যেন নিজেকে জাহির করতে চান না।

গণেশের আমি সমবয়সী। অন্যদলের হলেও তার সংগে খাতির বেশ জমাট বেঁধে গেছে। তার দেখাদেখি আমিও সূর্যবাবুকে মাস্টারদা বলে ডাকতে শুরু করলাম।

মাস্টারদার চালচলন দেখে আমি গণেশকে একদিন বললাম—তোমাদের যে মাস্টারদাই নেতা তা বোঝবার কারু সাধ্যি নেই। নিজেকে একটি বারের জন্যও সামনে আনতে চান না।

গণেশ আমার কথাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে জবাব দিয়েছিল—'মাস্টারদা ঐ ধরনেরই। আমাদের সবসময় প্রকাশ হওয়ার পথ করে দেন, কোন কাজে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়ে এ তিনি চান না।'

কিছুদিনের মধ্যে আমাকে ও মাস্টারদাকে মেদিনীপুর থেকে স্থানান্তরিত করে বোম্বের রত্নগিরি জেলে রাখা হয়। এরপর হঠাৎ একদিন আমরা জানতে পারি, আমাকে ও মাস্টারদাকে এখান থেকে বেলগাঁও জেলে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমরা চলে যাব শুনে রত্নগিরি জেলে আমাদের সেই ক্ষুদ্র এলাকাটির সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত সবাই হায় হায় করতে লাগল। বিদায়ের সময় আমাদেরও চোখ ছলছল করে উঠেছিল…।

রত্নগিরি থেকে মোটরে করে বেলগাঁও যাব। পাহাড়ের উপর দিয়ে চলেছি। আস্তে আস্তে রত্নগিরি দিগন্তে মিলিয়ে গেল। মোটরের রাস্তাটি সুন্দর। কোথাও ঝরণার জল, কোথাও গভীর খাদ, আবার কোথাও উঁচু শিখর।

গল্প গুজব করতে করতে আমরা পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক গ্রামে এসে পড়লাম। আমাদের মোটর চলছে—পিছনে পুলিশের মোটর। গ্রামে ঢুকতেই গাঁয়ের লোকেরা তো অবাক। এরা কারা!

আমরাও সজাগ হলাম। অনেকদিন পরে বাইরের লোক দেখছি, হয়তো আলাপ করার সুযোগও মিলবে। আমাদের সঙ্গের ইনসপেক্টার বললেন, 'এখানে জলটল খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে রওনা হব। ইনসপেক্টারটি সাধারণ পুলিশের মত নন। তাই আমরা অবাধে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলাম।

মাস্টারদা ভারি খুশি। গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাই একেবারে মশগুল হয়ে গেলেন। আমাদের বাংলা ভাষা তাদের কাছে অবোধ্য। তাতে কি হয়। মাস্টারদা ভাঙা ভাঙা হিন্দি আর মারাঠি মিশিয়ে যে নতুন ভাষায় কথা কইতে লাগলেন, তাতে কোঙ্কনের সেই পাহাড়ী গাঁয়ের লোকেরা মাস্টারদাকে ঘিরে কত যে প্রশ্ন করতে লাগল।

বাংলাদেশের স্বদেশী দলের লোক আমরা, এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমরা এসে গ্রামের পোস্ট অফিসে বসলাম। পোস্ট মাস্টারের সে কি বিরাট আপ্যায়ন। আবার যখন শুনলেন—মাস্টারদা বাইরে হেডমাস্টার ছিলেন, তখন তো কথাই নেই। ছেলেমেয়ের দল এসে নমস্কার করতে লাগল। গাঁয়ের বুড়ো মোড়লরা তাঁকে ঘিরে কত সম্মানই না দেখাতে লাগলেন।

মাস্টারদাকে সাধারণ লোকের মাঝখানে প্রাণ খুলে আলাপ করতে এই আমি প্রথম দেখলাম। আজ হঠাৎ এখানে সাধারণ লোকের মাঝে গল্পগুজব করার সুযোগ পাওয়া গেল বলেই মাস্টারদার বিপ্লবী চরিত্রের নতুন দিক আমার নজরে পড়ল। মাস্টারদা তখনও অজস্র প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। বেশীর ভাগ প্রশ্ন সবাই তাঁকেই করতে লাগলেন। মাস্টারদাও যেন তাদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

গ্রামের মাতব্বর গৃহস্বামী আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সমস্ত গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। আমাদের পাহারাদার পুলিশরা একটুও বাধা জন্মাচ্ছে না, বরঞ্চ এই আবহাওয়ায় তারাও যেন স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে পেয়ে গর্বিত।

খেতে এসে দেখি আমাদের জন্যই দুটি আসন। মারাঠি মেয়েদের পর্দা নেই, তাই তারাই খাবার সাজিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। গাঁয়ের অর্ধেক লোক বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছেন। ভেতরেও অনেকে আনাগোনা করছেন। আবার এদিকে খাবারেরও বিশেষ আয়োজন। এত ধরনের খাবার দেখে মাস্টারদা বাড়ির কর্তাকে বললেন—'এত আয়োজন কিসের জন্য?'

তিনি এগিয়ে এসে সংকুচিত হয়ে বললেন—'গাঁয়ের আরো দু চার বাড়ি থেকে আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছে।'

আমি মাস্টারদার মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, মুখখানা তাঁর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। মাস্টারদা আমাকে কানে কানে বললেন—'এদের এই ভালবাসা আমাকে যে কত অনুপ্রাণিত করেছে, তা আর বলার নয়। আমাদের এখানে আসা সার্থক।'

বন্দীজীবনে মাস্টারদা পড়াশুনা করে সময় কাটাতেন।...মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গর্বিত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের কত বড় সম্পদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধা নিবেদন

করতেন।

রত্নগিরিতে থাকার সময় জেল সীমানার ভেতর পাহাড়ের যে উঁচু শিখর, সেখানে আমরা বেড়াবার সময় বিশাল আরব সাগর আমাদের চোখের সামনে এসে দেখা দিত। স্তব্ধ হয়ে বসে সে দৃশ্যের দিকে আমরা চেয়ে রয়েছি। মাঝে মাঝে মাস্টারদা গুনগুন করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াতেন।

আমি কবিতায় বড় বেশী গা মাথাতে চাইতাম না। মাস্টারদা সেসব জেনেশুনেই আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন—'কবিতাকে ভালবাসলে তুমি অবিপ্লবী হয়ে যাবে না। বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো।'

[বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতি : পৃ: ৬৫-৬৮]

মুক্তি পেলেন ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে। পরের কাহিনী সবই তোমার জানা। ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ—জালালাবাদ পাহাড়ের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম—অসংখ্য শহীদের আত্মদান—রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি—সবই আমি তোমাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে। ওদিকে তখন শুরু হয়েছে মামলা। ঐতিহাসিক সেই মামলা সম্বন্ধে এবার তোমাকে আমি কিছু বলবো মল্লিকা।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের মূল্যায়ন অনেকেই অনেক ভাবে করেছেন। ভবিষ্যতে তোমরাও হয়তো করবে। কিন্তু সব কিছুই যে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে বিস্মৃতির অতলে। তাই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আমি কিছু বিবরণ রেখে যেতে চাই অগ্নিযুগের ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই মামলাটি সম্বন্ধে। হয়তো ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে কারো কাজে লাগলেও বা লাগতে পারে।

শুরুতেই বলে রাখছি যে, এর মধ্যে আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই। আমি শুধু তখনকার সাময়িক পত্রিকা থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কিছু কিছু বক্তব্য পরপর সাজিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

একটু আগে থেকেই শুরু করছি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে। কি ভাবে সেই চমকপ্রদ ঘটনাগুলো সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল দেখে নাও।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদল কর্তৃক সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত : রেল লাইন উৎপাটিত ও তার ছিন্ন : ৭ জন বিদ্রোহীর গুলিতে নিহত : কলিকাতা হইতে বহু সৈন্য প্রেরণ।

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—বাংলা সরকার এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—গভর্নমেণ্ট অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে, একশতজন বিদ্রোহী দলবদ্ধ হইয়া ১৮।১৯ শে এপ্রিল

রাত্রিতে চট্টগ্রাম রেলের ও পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। পূর্ণ বিবরণ এখনও কিছুই জানা যায় নাই। যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, একজন সার্জেণ্ট মেজর, একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ৪ জন ভারতীয়কে বিদ্রোহীরা গুলি মারিয়া খুন করিয়াছে।

অন্য খবরে জানা যায় যে সকল সিভিলিয়ান রেল কর্মচারী, স্ত্রীলোক ও শিশুকে জেটিতে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ ও অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে একদল ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল আজ সকালে চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়াছে। তাহারা রবিবার ২০শে এপ্রিল সকালে চট্টগ্রাম পৌঁছিবে। পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেলও ঐ সঙ্গে গিয়াছেন।

টেলিগ্রাফ চলাচলে বাধা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরে লাইন ঠিক করা হয়। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে ৪০ মাইল দূরে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করা হইয়াছিল। রেল লাইন বন্ধ হইয়াছে। তবে যাত্রী ও মালপত্র অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বিদ্রোহীরাই রেল লাইনচ্যুত করিয়াছে কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বর্ণনাঃ ৭ জন নিহত

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল : চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গত রাত্রির দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গতকল্য রাত্রি ১০ টার দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বে কোনরূপভাবে সতর্ক করা হয় নাই। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্কজিলিয়ারী ফোর্স ও পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে।

অর্কজিলিয়ারী ফোর্সের নিকট ৯০টি রাইফেল ও ২০০টি লুইসগান ছিল। আক্রমণকারীরা পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে। ৬০টির অধিক এখন আর ব্যবহার করা চলে না। আক্রমণকারীদের সঙ্গে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও বহু রিভলবার ছিল। আক্রমণকারীদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন—তাহাদের সংখ্যা একশত বলিয়া অনুমিত হয়। সকলেই চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সশস্ত্র পুলিশ তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

মোট মৃতের সংখ্যা এইরূপ :

২ জন শ্বেতাঙ্গ, ২ জন কনেষ্টবল ও ৩জন ট্যাক্সিচালক। তাহা ছাড়া কয়েকজন আহত। শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও শিশুদের ষ্টীমারে চড়াইয়া দিয়া

তাহাদের পুরুষগণ কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ৩০ মাইল দূরে রেলের লাইন খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল সৈন্যদল তথায় গিয়া পেঁছিলে অবস্থা ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়।

গভর্ণরের প্রত্যাবর্তন

কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল : বাংলার গভর্ণর একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ২টি সভা করিবার পর গত রাত্রিতে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাত্রা করিয়াছিলেন। শিলিগুড়িতে ই. বি. রেলের কর্মচারীদের নিকট হইতে চট্টগ্রামে হাঙ্গামার খবর পাইয়া তিনি তখনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। আজ বিকালে তিনি কলিকাতা ফিরিয়াছেন।

চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় বড়লাটের চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লী, ১৯শে এপ্রিল : আজ বড়লাটের কার্যকরী কাউন্সিলের এক জরুরী সভায় চট্টগ্রামে হাঙ্গামা, বাঙ্গলার ও অন্যান্য স্থানের অবস্থা, পুলিশ ও মিলিটারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। চট্টগ্রামের হাঙ্গামা বিস্তৃতি লাভ করে নাই বলিয়াই মনে হয়। দেশের সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। [বঙ্গবাণী : ২০-৪-৩০]

পাহাড়ে জঙ্গলে ৮ ঘণ্টাকাল ব্যর্থ অন্বেষণ : পুলিশ ইন্সপেক্টার জেনারেলের রিপোর্ট

২০শে তারিখে বাঙ্গলার পুলিশ ইন্সপেক্টার জেনারেল চট্টগ্রাম হইতে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন :—

চট্টগ্রামের উত্তরের পাহাড়গুলি ৮ ঘণ্টাকাল অন্বেষণের পর এইমাত্র ফিরিলাম। একেবারে পার্বত্যদেশ, তায় গভীর জঙ্গল, খোঁজ করা বড় সহজ নয়। ডাকাত দলকে ধরিতে পারি নাই। পুলিশের চেষ্টায় ব্যাজ, ব্যাণ্ডেজ, পেট্রল প্রভৃতির কাগজের মোড়কের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয়, তাহারা এই দিক দিয়াই গিয়াছে। কাল সকালে পাহাড়ে পুনরায় খোঁজ করিব। রাত্রে আর কোন গোলযোগ হয় নাই। আক্রমণকারীদের এখনও পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরে ৯ বার গুলি বর্ষণ

গত শুক্রবার রাত্রে একদল লোক সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীগণ টেলিফোন এবং কলিকাতা ও ঢাকা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয় এবং ধুম ও জোরারগঞ্জের মধ্যবর্তী রেল লাইন ভাঙ্গিয়া দেয়। ফলে একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

......সংবাদ পাওয়া মাত্রই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু পথেই আক্রমণকারীগণ তাঁহার মোটর আক্রমণ করে। তাহার মোটরের উপর নাকি ৯ বার গুলি ছোড়া হইয়াছিল। একজন কনস্টেবল নিহত ও চালক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করেন।

যতদূর জানা যায়, ২জন শ্বেতাঙ্গ ও ১জন ভারতীয় নিহত হইয়াছে। অনেক লোক আহত অবস্থায় সেণ্ট্রাল হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল ও রেলওয়ে হাসপাতালে আছে। শহরের কয়েকটি স্থানে কয়েকখানি মোটর পাওয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীদল এইগুলি ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করে। সে রাত্রে শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা ও শিশুদের পাহাড়তলী কারখানায় নিরাপদে রাখা হয়। আক্রমণকারীগণ নির্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্যন্ত তাহাদের পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

শহরে গুর্খা সৈন্য

এই কাণ্ডে শহরে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। রাত্রি ৯ টার পর হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত কাহাকেও বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় নাই।

নানাস্থান হইতে একদল গুর্খা সৈন্য আনা হইয়াছে। রাত্রে শহরে সশস্ত্র পাহারা বসানো হইয়াছে। গতকল্য টেলিগ্রাফ লাইন সংস্কার করা হইয়াছে এবং টেলিফোন লাইনও আংশিকভাবে সংস্কার করা হইয়াছে।

বহু লোকের বাড়ি খানাতল্লাস করা হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বন্দুক পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ কোনরূপ সংবাদ সরবরাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের একজনের মুখ পুড়িয়া গিয়াছে এবং আরও একজনের ক্ষতচিহ্ন আছে। [বঙ্গবাণী : ২২-৪-৩০]

পাহাড়ে খানাতল্লাসের আয়োজন : স্পেশাল ট্রেনে সৈন্য প্রেরণ

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে অনেকগুলি বাড়ি খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে খানাতল্লাসের জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনে একদল সৈন্য হাটহাজারী যাত্রা করিয়াছে।

......আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার জানাইয়াছেন, রাত্রি ৯-৩৭ মিনিটে মেল ট্রেন ছাড়ে, তাহাতে চট্টগ্রাম হইতে কোন যাত্রী লওয়া হইবে না। রাত্রির গাড়িগুলি ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে যায়। এখনো টেলিফোন লাইন সম্পূর্ণ সারানো হয় নাই। নতুন এক্সচেঞ্জ বসাইতে বহু টাকা ব্যয় হইবে।

বিপ্লবপন্থীদের কার্য কেবল শহর ও রেল লাইনেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

ঐ রাত্রে বহু গ্রামে বিপ্লবী ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছিল।

[বঙ্গবাণী : ২৩-৪-৩০]

সৈন্যদলের ব্যর্থ অনুসন্ধান

ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী নিকটবর্তী পাহাড়তলী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান পায় নাই। গুর্খা সেনাদল সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে মেশিনগান লইয়া পাহাড়গুলি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছে। বিদ্রোহীরা বিশেষ বিচারবুদ্ধি সহকারে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিল বলিয়া শোনা যাইতেছে। প্রকাশ, তাহাদের মধ্যে একদল ড্রাইভারদিগকে ক্লোরোফরম যোগে অজ্ঞান করিয়া কতকগুলি মোটর হস্তগত করে এবং তাহাদিগকে সেই অবস্থায় তাহাদের ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখে।

তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যের পোষাক পরিধান করিয়াছিল এবং অন্যান্য সকলের পরিধানে খাঁকি হ্যাফপ্যাণ্ট ছিল। জলের কলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেশিনগান চালাইয়া বিদ্রোহীদিগকে দূরে রাখিতে শ্বেতাঙ্গদিগকে সাহায্য করেন।

······পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, ইষ্টার্ন, ফ্রন্টিয়ার সেনাদল চট্টগ্রামের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে একদল বিদ্রোহীকে ঘিরিয়াছে!

বিদ্রোহীদের সহিত খণ্ডযুদ্ধ : অনুমান ১২জন নিহত

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানাইয়াছেন, অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৪জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রধানদলের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

একদল পাহাড়ের এক সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছে। গত ২২শে তারিখে ইহাদের সহিত সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স ও ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস দলের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুমান ১২জন আক্রমণকারী নিহত হইয়াছে। সরকারী সৈন্যদলের কেহ নিহত হয় নাই।

২৩শে প্রত্যুষে ফেনীতে একখানি ট্রেনে ৪জনকে চট্টগ্রাম কাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় এবং খানাতল্লাসের জন্য অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাস্টারের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। খানাতল্লাস আরম্ভ হইলে তাহারা রিভলবার বাহির করিয়া ১জন পুলিশ দারোগা, ২জন কনষ্টেবল, একজন টিকিট কালেক্টার ও ১জন চৌকিদারকে আহত করিয়া পলায়ন করে। পুলিশ একটি রিভলবার পাইয়াছে।

১০ জন বিদ্রোহী নিহত

চট্টগ্রাম, ২৩শে এপ্রিল :—পরবর্তী বিবরণে প্রকাশ, পাহাড়ে সৈন্যদলের

সহিত সংগ্রামে ১০ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ এখনও শহরে আনা হয় নাই। কেবল একজন আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

সৈন্যদল অন্যান্য বিদ্রোহীদের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। তাহারা আরও দূর অঞ্চলে সরিয়া পড়িতেছে। আরও একদল সৈন্য আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সন্দেহজনক স্থানে কড়া পাহারা চলিতেছে। চট্টগ্রাম নাজির হাট লাইনে যাত্রী লওয়া হইতেছে না। একখানি মেশিনগান নাকি ঘটনাস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া ৪০খানি ট্যাক্সিও আনা হইয়াছে।

বহু যুবক গ্রেপ্তার

পুলিশ চন্দনপুরার মোক্তার চন্দ্রকুমার সেনের বাড়ি হইতে তাঁহার পুত্র শ্রীমান হিমাংশু সেনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীমান জে. এম. সেন স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। তাহার মুখ ও শরীরের বিভিন্ন স্থান পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তৎসঙ্গে বাবু চন্দ্রকুমার দস্তিদারের পুত্র অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তামাকুমাণ্ডুতে উকীল রজনীরঞ্জন বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

শনিবার বৈকালে সদর ঘাটের বাবু সারদাপ্রসন্ন গুহের পুত্র শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু গুহকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গতকল্য রবিবার আর ২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া বেজায় গুজব। অপরাহ্নে যোগেন্দ্র (মনা) গুপ্ত মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গুর্খা আমদানী

গতকল্য রবিবার শহরে গুর্খা সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। সংবাদ লইয়া জানা গেল, প্রায় ১৫০জন গুর্খা স্পেশাল ট্রেনে ঢাকা হইতে আমদানী করা হইয়াছে। পরের গাড়ীতে আরও ৩০জন আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল। [বঙ্গবাণী : ২৪-৪-৩০]

রেঙ্গুন মেল আটক

গত শনিবার বেলা ১২ টায় রেঙ্গুন মেল প্যাসেঞ্জার লইয়া চট্টগ্রাম জেটীতে আসে, কিন্তু ঐ দিন ষ্টীমার জেটীতে ভিড়ান হয় নাই। পরদিন রবিবার বেলা ৭।৮ টার সময় ষ্টীমার জেটীতে ভিড়ান হয়। [দৈনিক জ্যোতি]

বিলোনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ

কুমিল্লা, ২৪শে এপ্রিল : বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরা স্বাধীন-

রাজ্য হইতে প্রায় একশত পুলিশ বিলোনিয়া মহকুমার পাহাড়ের দিকে চট্টগ্রামের ব্যাপারে লিপ্ত বিদ্রোহীগণকে ধরার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

[বঙ্গবাণী : ২৭-৪-৩০]

এখনও মফঃস্বলে সন্ধান

চট্টগ্রাম, ২৬শে এপ্রিল :—ক্যাপ্টেন জনষ্টনের নেতৃত্বে আসাম রাইফেলের ২টি প্লেটুন আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও জেলার নানাস্থানে পুলিশ কাজ করিতেছে। আর নূতন কোন সংবাদ নাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তার

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২৬ শে এপ্রিল কলিকাতায় বাঙ্গলা সরকারের নিকট খবর দিয়াছে,—অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আসাম রাইফেলের দুটি প্লেটুন আজ সকালে চট্টগ্রামে আসিয়াছে।

চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় ২১জন ধৃত
বি. এ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বন্ধ

এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম হাঙ্গামা সম্বন্ধে ২১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাত্র ১৬জন—তিনজন বি. এ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার অনুমোদন লাভ করেন নাই; যদিও তাঁহাদের প্রিন্সিপাল চট্টগ্রামের কমিশনারের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, জেলের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক।

সাব ইন্সপেক্টার যতীন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কয়েকজন কনষ্টেবল—যাহারা সম্প্রতি গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত হইয়াছিল—ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছে! বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্যন্ত অপরাধীদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

[বঙ্গবাণী : ২৮-৪-৩০]

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তারের ধুম

চট্টগ্রাম ২৯ শে এপ্রিল, আক্রমণকারীদের প্রথম দলের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের গতিবিধিও অজ্ঞাত। গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস চলিতেছে। রাত্রি ৯ টার পর রাস্তায় বাহির হওয়া সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে।

আক্রমণকারীদের সন্ধানার্থ বিমানপোতে.

চট্টগ্রাম ৩০শে এপ্রিল :—পাহাড় অঞ্চলে ঘুরিয়া আক্রমণকারীদের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অদ্য একটি বিমানপোত আসিয়াছে। আর একটি বালককে দগ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; সে অদ্য জেলা হাস-

পাতালে মারা গিয়াছে। ইহাকে লইয়া এখনও পর্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা ১৭ হইল।

চট্টগ্রাম পোর্ট‌ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ লিসম্যান বলেন, বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম ক্লাব ও ইয়োরোপীয় নাগরিকগণকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। জনৈক নিহত বিদ্রোহীর পকেটে চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাবের নক্সা ছিল। সুর্মা-ভ্যালী লাইট হর্স সৈন্যদল প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও গুর্খা সৈন্যদল শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। [বঙ্গবাণী : ১-৫-৩০]

চট্টগ্রামে খানাতল্লাস

চট্টগ্রাম, ১লা জুলাই :— গতকাল শহরে বহুসংখ্যক বাড়িতে খানাতল্লাস হইয়াছে। ১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সুবোধচন্দ্র চৌধুরী, সহায়রাম দাস ও মোক্তার চন্দ্রকুমার সেনের একটি পুত্র মহকুমা হাকিমের নিকট একরার করিয়াছে।

অস্ত্রাগার লুঠের মামলা মুলতুবী

চট্টগ্রাম, ২রা জুলাই :— পুলিশ এখনও কাগজপত্র তৈয়ার করিতে না পারায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা ১৬ই জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। ট্রাইবিউনালের সদস্যগণের নাম এখনও জানা যায় নাই।

অনন্ত সিং গত রবিবার কলিকাতায় পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া আর কোন পলাতক আসামীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আজ সকালে চট্টগ্রাম শহরের উপর একখানি উড়োজাহাজ ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। এখনও সাঁজোয়া গাড়ি পাহারা দেয়।

প্রসিদ্ধ উকিল রঞ্জনলাল সেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র রজত সেন কালার পোলের নিকট নিহত হন। এই মামলা জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংএর পিতা গোপাল-বাবুকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই মামলার পলাতক আসামী শ্রীমান আনন্দ গুপ্তের পিতা মনাবাবুকেও জামিনে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অনন্ত-বাবু স্বয়ং ধরা দিয়াছেন। অপর আসামীদের জন্য গভর্ণমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যহ খানাতল্লাস হইতেছে। ফকীর সেন নামক জনৈক আসামী রাজসাক্ষী হইবে বলিয়া প্রকাশ।

[বঙ্গবাণী : ১০-৭-৩০]

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

আগামী ১৬ই জুলাই জেলের ভিতর একটি বিশেষ আদালতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রকাশ, এই আদালতে থাকিবেন চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ জে. ইউনি; অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রায়বাহাদুর

দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ এবং পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর আব্দুলে হাই। সরকার পক্ষে থাকিবে প্রায় ৩৫০ জন। সরকারী কৌঁসুলী খানবাহাদুর আব্দাস সত্তার সরকার পক্ষে মামলা চালাইবেন। জেলের মধ্যেই বিচারকার্য চলিবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলাঃ আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল

হাজতে আবদ্ধ আসামীগণ :—

নিম্নলিখিত আসামীগণকে হাজতে রাখা হইয়াছে। অনন্ত সিং, ধীরেন্দ্র দস্তিদার, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ বিশ্বাস, সহায়রাম দাস, নিতাইপদ ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, অশ্বিনী চৌধুরী, সুখেন্দু দস্তিদার, হেরম্ব বল, শান্তি নাগ, ফকির সেন, নন্দ সিং, রণধীর দাশগুপ্ত, ননীগোপাল দেব, আশুতোষ ভট্টাচার্য, মলিন ঘোষ, লালমোহন সেন, অনিলবন্ধু দাস এবং সুবোধ রায়।

নিম্নলিখিত আসামীগণ জামীনে মুক্ত আছেন :—শ্রীপতি চৌধুরী, বিনয়কুমার সেন, অর্ধেন্দু গুহ, গোপাল সিং, (উকিল), যোগেন্দ্র—ওরফে মোনা গুপ্ত, রঞ্জনলাল সেন, অনিল রক্ষিত, সুবোধ বল এবং মধু বসু।

ফেরারী আসামীগণ :—নিম্নলিখিত ফেরারী আসামীগণের বিরুদ্ধেও চার্জসীট দাখিল করা হইয়াছে :

আনন্দ গুপ্ত, সরোজকান্তি গুহ, হেমেন্দ্র দস্তিদার, জীবন ঘোষ, লোকনাথ বল, নির্মলচন্দ্র সেন, কালীপদ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র দে, কৃষ্ণ চৌধুরী, সূর্যকুমার সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, হরিপদ মহাজন, বিনোদ দত্ত, ভবতোষ ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর দস্তিদার, দীপ্তিমেধা চৌধুরী, ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, নারায়ণ সেন, সীতারাম বিশ্বাস, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, সুরেশ দেব, বিনোদ চৌধুরী।

নিহতগণের তালিকা : চট্টগ্রাম হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী রামগড় রোডের নিকটবর্তী জালালাবাদ পার্বত্য অঞ্চলে ২২শে এপ্রিলের সংঘর্ষে নিম্নলিখিত গণ মারা গিয়াছে :—

নরেশচন্দ্র রায় (ময়মনসিং) ত্রিপুরা সেন (ঢাকা) বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (কুমিল্লা) হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিনবিকাশ ঘোষ ও শশাঙ্ক দত্ত। এতদ্ব্যতীত অপর একজনকে সনাক্ত করা যায় নাই।

অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদে আহত হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। অমরেন্দ্র নন্দী সদরঘাটে (চট্টগ্রাম) আত্মহত্যা করে।

৭ই মে কোলগাঁওয়ে (কালার পোল) নিম্নলিখিত কয়জন মারা যায় :

রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায় (ফরিদপুর) মনোরঞ্জন সেন (চট্টগ্রাম)। জালালাবাদ ও কোলগাঁওয়ে যে ১৫ জন মারা যায়, তাহাদের ফটো রাখিয়া তাহাদের শব পরে পোড়ান হয়।

এই মামলায় প্রায় ৩৪৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইবে। তন্মধ্যে পুলিশ লাইনের ৯ জন, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ভলাণ্টিয়ার্স রাইফেল সেনাবাহিনীর ১১ জন এবং টেলিফোন অফিসের ৬ জনের সাক্ষ্য লওয়া হইবে।

বিচারালয়ের ব্যবস্থা

ঠিক বেলা ১২ টার সময় জজগণ আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আসামীর পক্ষ হইতে ৪৬জন ব্যবহারাজীব উপস্থিত হন। আসামীদিগকে বিভিন্ন দলে কড়া পাহারায় বিচারালয়ে আনয়ন করা হয়। আসামী ফকীর সেন এপ্রুভার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাকে অপরাপর আসামীদের হইতে স্বতন্ত্র রাখা হয়।

অনন্ত সিং জজদিগকে বলে, মামলার শুনানীতে সে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নহে ; সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেও চাহেনা। অনিলবন্ধুও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না।

মিঃ এন. আর দাশগুপ্ত ব্যবহারাজীবগণ কর্তৃক বিচার গৃহের প্রবেশদ্বারে টিকেট প্রদর্শনের ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—উহা অবমাননাকর। উহা দ্বারা বিচারালয় অভিনয় গৃহে পরিণত হয়। তিনি জানান যে, আগামীকল্য হইতে তিনি টিকেট দেখাইবেন না।

জজগণ বলেন, ব্যবহারাজীবদের নির্বিঘ্নতার জন্য উহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যাঁহারা ভালরূপে পরিচিত তাঁহাদের টিকেট না দেখাইলেও চলিবে।

প্রথমে সরকার পক্ষের উকীল দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আক্রমণের পূর্ববর্তী বিবরণ, আক্রমণের ইতিবৃত্ত এবং আক্রমণকারীদিগের নেতা অনন্ত সিংএর আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয় বিবৃত করেন। তিনি বলেন—পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যানের নিকট অনন্ত সিং যে চিঠি দিয়াছিল, তাহা হইতেই তাহার অপরাধ প্রমাণিত হয়। উক্ত পত্রে অনন্ত সিং বলিয়াছিল যে, সে ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করিতেছে, কিন্তু সরকারী উকিল বলেন যে, আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাহার উপায় ছিল না।

লালমোহন সেন, ফকীর সেন, অনিলবন্ধু দাস ও সুবোধ চৌধুরী :— ইহারা স্বীকারোক্তি করিয়া অপরের সহিত নিজদিগকে জড়াইয়াছে। কিন্তু সুবোধ চৌধুরী আদালতে বলে—'আমি পুলিশের নিকট কোন এজাহার করি নাই। সরকারী উকীল যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। আমি পরে আমার

বক্তব্য বলিব। পুলিশ আমার উপর নির্যাতন করিয়াছিল।

[বঙ্গবাণী : ২৯-৭-৩০]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠের জের

চট্টগ্রাম, ২৯শে জুলাই :— অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী আবার আরম্ভ হয়।

আসামী ফকীর সেনকে অপর আসামীদের নিকট হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল। ফকীর সেন প্রার্থনা করে যে, তাহাকে অপর আসামীদের নিকট যাইতে অনুমতি দেওয়া হউক। ফকীর সেন স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। তাহার পক্ষ সমর্থনার্থ কোন ব্যবহারাজীবও নিযুক্ত হয় নাই।

ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট বলেন,—সে অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহাকে পৃথক কাঠগড়ায় রাখা হইয়াছে। ফকীর কিন্তু জিদ করিতে থাকে এবং আসামীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ মুখার্জীকে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অনুরোধ করে। ফকীর পরে ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়া দেয় এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মিঃ মুখার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করে।

আসামী অনন্ত সিং বিচারকদিগকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন, যে সকল সাক্ষীর এখনও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই, তাহারা সনাক্তের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে তাহাদের প্রতি উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কোন সাক্ষী বিচার কক্ষের নিকট আসিতে পারিবে না বলিয়া আদালত কড়া হুকুম দেন।

সোমবারের শুনানীর বিবরণ

চট্টগ্রাম, ২৮শে জুলাই :—অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালে রিজার্ভ পুলিশের সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীব নাগের এজাহার গৃহীত হয়। এই সাবইন্সপেক্টারই ১৮ই এপ্রিল তারিখে থানায় ঘটনার প্রথম সংবাদ দিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন, বন্দেমাতরম ধ্বনি ও বন্দুকের আওয়াজে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বদেশী বিদ্রোহীগণ কর্তৃক পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রান্ত হইয়াছে।

তিনি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সংবাদ দেন ও শহর কোতোয়ালীতে গমন করেন। তথা হইতে রাত্রি প্রায় পৌনে একটার সময় পুলিশ লাইনে প্রত্যাবর্তন করেন। তখনও বিদ্রোহীদিগকে তিনি পুলিশ অস্ত্রাগারে দেখিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা চলিয়া গেলে তিনি সদলে অস্ত্রাগারে যান এবং দেখেন যে অস্ত্রাগারের দরজা ভগ্ন। দুইটি কাঠের বাক্সে যে সকল রিভলবার ছিল তাহা নাই এবং একজন প্রহরী গুলির আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অস্ত্রাগারে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল।

অস্ত্রাগারের বাহিরে বিভিন্ন এটাচিকেসে ও মোটর গাড়ী সমূহে বহু বন্দুক, রিভলবার, বোমা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্রোহীদল কর্তৃক লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রের এক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। দেখা যায় যে, প্রায় ৫৬টি বন্দুক, ২টি ওয়েবলি রিভলবার ও প্রায় ৩২৫০ কোটা বারুদ অপহৃত হইয়াছে। [বঙ্গবাণী : ২৯-৭-৩০]

১৬ই সেপ্টেম্বরের বিবরণ

বেলা প্রায় পোনে ১২টার সময় কমিশনারগণ তাহাদের আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অনন্ত সিং, লালমোহন সেন এবং ফকীর সেনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। গণেশ ঘোষ এবং লোকনাথ বলের (ইতিমধ্যে চন্দননগরে ধৃত) পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে. কে. ঘোষাল দাঁড়াইয়াছিলেন শ্রীপতি চৌধুরী, যোগেন্দ্র গুপ্ত এবং অনন্ত গুপ্তের পক্ষে। বাকী আসামীদের পক্ষে ছিলেন স্থানীয় উকিলগণ।

তারপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, সঞ্জীবচন্দ্র নাগকে জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল তারিখ রাত্রিতে জ্যোৎস্না ছিল, না অন্ধকার?

উঃ—অন্ধকার।

প্রঃ—পুলিশ লাইনে যারা এসেছিল তাদের কাউকে চিনতে পেরেছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—তাদের কি পোষাক ছিল তা নজরে পড়েছিল?

উঃ—না।

প্রঃ—তাদের কাছে কি অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাও বলতে পারেন না আপনি?

উঃ—না, আমি দেখিনি।

প্রঃ—আপনি বলেছেন, বন্দেমাতরম চীৎকার শুনে আপনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, তারা সব বিপ্লবী। তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, বিপ্লবীরাই কেবল বন্দেমাতরম চীৎকার করে?

উঃ—না তা আমি বলতে পারিনে।

কৌঁসুলী শ্রীশ বসু অতঃপর সাক্ষীকে আরও জেরা করেন।

প্রঃ—অস্ত্রাগারের সম্মুখে কোন আলো ছিল কি?

উঃ—ছিল, মোটর গাড়ীর হেড লাইট আর টর্চ লাইট।

প্রঃ—তা হলে সেখানে আপনার কোন পরিচিত লোক থাকলে আপনি তাকে চিনতে পারতেন না?

উঃ—আলো খুব জ্বলজ্বল করছিল, নইলে হয় তো চিনতে পারতাম।

প্রঃ—ঐ সব আলো দিয়ে যদি লোকগুলোকে ফোকাস করা যেতো এবং ওদের মধ্যে কেউ যদি আপনার পরিচিত থাকতো তাহলে তাকে আপনি চিনতে পারতেন নিশ্চয়?

উঃ—আলোগুলো বড্ড জ্বলজ্বল করছিল—চোখে ধাঁ ধাঁ লাগল।

ইহার পর সরকারী সাক্ষী শশীভূষণ দাশগুপ্তকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু জেরা করেন।

প্রঃ—পরদিন জালালাবাদে যখন (নিহতদের) ফটো তুলতে গিয়েছিলেন, তখন কি কেউ এসেছিল আপনার কাছে?

উঃ—একজন কনেষ্টবল এসেছিল। বলল—পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ডেকেছেন।

প্রঃ—ফটো তুলতে আপনার কতক্ষণ লেগেছিল?

উঃ—আড়াই ঘণ্টা।

রঞ্জন সেন চট্টগ্রাম আদালতের একজন উকিল। তিনিও এই মামলার আসামী। সাক্ষীকে তিনিও জেরা করেন।

প্রঃ—লর্ড রোনাল্ডসে যখন বাংলার লাট ছিলেন, তখন তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন—মনে আছে?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—তিনি চট্টগ্রামে এলে তখনকার কমিশনার মিঃ কে. সি. দে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে তাকে একটি পার্টি দিয়েছিলেন। এটা কি সেই ফটো? (ফটো দেখিয়ে) এখানে রঞ্জন সেনের ছবি দেখতে পাচ্ছেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—মিঃ ক্লেটনকে জানেন?

উঃ—হ্যাঁ, তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ছিলেন।

প্রঃ—বিলেত যাবার আগে তিনি সস্ত্রীক রঞ্জন সেনের সঙ্গে ফটো তুলেছিলেন জানেন?

উঃ—হ্যাঁ জানি [বঙ্গবাণী : ২২-৯-৩০]

চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রাইবিউনাল

কলকাতা, ৪ঠা অক্টোবর: অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৪ ধারার ১ এবং ২ উপধারা মতে সকাউন্সিল গভর্ণর বাহাদুর গত ৯ই জুলাই ৯৯৭২, ৯৯৭৩ ও ৯৯৭৪ নং নোটিশ অনুযায়ী আসামীদের বিচারার্থ (১) চট্টগ্রামের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে. ইউনি. আই. সি. এস (২) অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর (৩) পাবনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর খান বাহাদুর মৌলভী এ. এইচ. এম. আব্দুল হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যেহেতু কমিশনার রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুরের সুদীর্ঘকাল

অনুপস্থিত থাকার সম্ভাবনা—সেইহেতু উক্ত আইনের দশ ধারার ৪ নিয়মের খ উপনিয়ম মতে সপারিষদ গভর্ণর অবসরপ্রাপ্ত জিলা এবং সেশন জজ রায় নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বাহাদুরকে আসামীদের বিচারার্থ রায়বাহাদুর দুর্গা প্রসাদ ঘোষের (যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন) স্থলে নিয়োগ করা হইল।

[**বঙ্গবাণী** : ৫-১০-৩০]

অম্বিকা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার

অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম পলাতক আসামী। ইহার নামে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এক সরকারী হুলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। অদ্য ভোর ৪॥ ঘটিকার সময় পুলিশ ইঁহাকে কচুই গ্রামে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রাম চট্টগ্রাম পটিয়া থানার এলাকাধীন।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র হোড়ের বাড়িতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক প্রফুল্ল দে ও ষোড়শ বর্ষীয় বালক বিপিন চৌধুরী এবং গৃহস্বামী হরিশ্চন্দ্র হোড়কেও গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রামে আনয়ন করা হইয়াছে এবং হাজতে রাখা হইয়াছে। [বঙ্গবাণী : ১১-১০-৩০]

১৮ই সেপ্টেম্বরের শুনানী

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ফরিয়াদী পক্ষের ১৪ এবং ১৫ নং সাক্ষী হীরালাল হিমানী এবং প্রভুদাসকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কোনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। শুধু শ্রীযুক্ত ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন যে, সনাক্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে জেলে নিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারে না।

টেলিগ্রাফ অপারেটারের সাক্ষ্য

ফরিয়াদী পক্ষের ২০ নং সাক্ষী আহমদউল্লা (টেলিগ্রাফ অপারেটার) সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল।

১৮ই রাত্রি ৮টা হইতে পরদিন ভোর ৮টা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ অফিসের ভার আমার উপর ছিল। ৯-৪৫ টার সময় দরজা পিছনে রাখিয়া আমি বসিয়া থাকি। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ৬।৭ জন ব্যক্তি আসিয়া অতর্কিতে আমার হাত পা বাঁধিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। আমি তাহাদের কাহাকেও দেখি নাই। আমার মনে হয়, ৬।৭ জন হইবে। তাহারা আমার নাকের নিকট কি একটা ধরে এবং আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। পরে কি ঘটিল তাহা আমি বলিতে পারি না।

যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন দেখিতে পাই যে, এক্সচেঞ্জ রুমের দক্ষিণভাগে আমি পড়িয়া আছি। ভয়ে আমি কাঁপিতে থাকি এবং চিৎকার করি, কিন্তু কেহই তথায় আসে না। তখন অফিসের পূর্বভাগে অবস্থিত জোনাব আলির বাসায় আমি যাই এবং তাহাকে এক্সচেঞ্জের নিকট নিয়া আসি।

তথায় আসিয়া দেখিতে পাই যে, ২।৩ জন লোক আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছে। পরে আরও লোক আসিয়া হাজির হয়। তখন আমাকে থানায় লইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন—এক ব্যক্তি আমার মুখ চাপিয়া ধরে, এক ব্যক্তি চক্ষু বাঁধে এবং অপর এক ব্যক্তি হাত ধরিয়া রাখে। কয়জনে আমার হাত ধরিয়া রাখে তাহা আমি বলিতে পারি না। [বঙ্গবাণী : ১৩-১০-৩০]

আদালতে অন্যতম আসামী অম্বিকা চক্রবর্তী

চট্টগ্রাম, ১৩ই অক্টোবর :— পূজার ছুটির পর অদ্য নূতন কমিশনার সহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বিশেষ আদালতের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু অদ্য পুলিশের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জেরা করেন। সরকারী উকিল আদালতে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, অন্যতম ফেরারী আসামী অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী ধৃত হইয়াছে। এই আসামীকে অন্যান্য আসামীর সহিত যোগ করিয়া নূতনভাবে মামলা চালাইবার জন্য আজ আর কোন আবেদন করা হয় নাই। [বঙ্গবাণী : ১৪-১০-৩০]

ফরিয়াদী পক্ষের ১৩ নং সাক্ষী আলি আহমেদকে (ট্যাক্সি চালক আহমদ রহমনের সহকারী) শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

শ্রীযুক্ত বসু :—আপনি ঐ দিকে (সরকারী কৌঁসুলির দিকে) তাকাইয়া কি দেখিতেছেন ?

প্রেসিডেণ্ট ইউনি : সাক্ষী তাহার ইচ্ছামত নিশ্চয়ই সকলের দিকে তাকাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত বসু : তা ঠিক, কিন্তু কৌঁসুলীর নিকট হইতে কোন নির্দেশ পাইতে পারেন না।

সরকারী কৌঁসুলী : ইহা অত্যন্ত অন্যায়।

প্রেসিডেণ্ট : ঐরূপ কিছু ঘটিলে আমাকে জানাইবেন।

শ্রীযুক্ত বসু : কিন্তু চোখের ইসারা আপনাকে দেখাইবার পরই যে শেষ হইয়া যায়।

প্রেসিডেণ্ট : আচ্ছা আমি লক্ষ্য রাখিব।

শ্রীযুক্ত বসু : 'কিন্তু আপনি যখন লিখিতেছেন, তখন উহা কি প্রকারে সম্ভব ?

পুলিশ সুপারিন্টেন্টের সাক্ষ্য

অতঃপর ২১ নং সাক্ষী মিঃ জে. আর. জনসন (চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট) সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন :

১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীব নাগ এবং কনষ্টেবল জরাসন্ধ বড়ুয়া রাত্রি প্রায় ১০-৩০টার সময় বাংলোয় আসিয়া আমাকে জানায় যে, পুলিশ লাইন স্বদেশীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। আমি তখন টেলিফোন করিতে যাই কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া সিদ্ধান্ত করি যে লাইন কাটিয়া গিয়াছে।

আমি সঞ্জীব নাগকে কোতোয়ালী পুলিশ থানায় এবং কনষ্টেবল জরাসন্ধকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করি। ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার এবং আমি আমার গাড়ীতে করিয়া এ. এফ. আই, হেড কোয়ার্টার্স অস্ত্রাগার অভিমুখে যাই। অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, সমগ্র জায়গাটি প্রজ্বলিত হইয়া আছে। তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আমি বরাবর পাহাড়তলী অভিমুখে অগ্রসর হই। পথে দেখি যে, তিনজন ইউরোপীয়ান দৌড়াইতেছেন। তন্মধ্যে সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ণও ছিলেন। তিনি আমাকে জানান যে, এ. এফ. আই অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল নিহত হইয়াছেন।

তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের চাবি কাহার নিকট রহিয়াছে। চাবি ব্যবাক্কের নিকট রহিয়াছে—তিনি এই কথা বলিলে আমি তাহাকে ব্যবাক্কের বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলি। তৎপর আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া এবং তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলি যে, প্রতিবেশীগণকে জাগাইয়া অস্ত্রাগারের দরজা খুলিতে হইবে।

আমরা মিঃ ফ্রান্সিসের বাংলোয় গমন করি এবং তথা হইতে মিঃ ফ্রান্সিস সহ পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে উপস্থিত হই। ইতিমধ্যে আমি মেসার্স টমাস ওয়েস্ট টারাস প্রোভান এবং ফ্রীম্যানকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করি এবং বলি যে, তাহাদের পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে যাইতে হইবে। মিঃ ফ্রান্সিসের গাড়ীতে একটি লুইসগান নেওয়া হয়। আমার গাড়ীতে ৩/৪জন রাইফেলধারী গমন করেন। আমরা এ. এফ. আই অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, আক্রমণকারীদল চলিয়া গিয়াছে। আমি তখন ঘটনাস্থল অনুসন্ধান করি এবং দেখি যে, একটি গাড়ীর চালকের মাথার খুলি উড়িয়া গিয়াছে এবং উক্ত গাড়ীরই পশ্চাতের আসনে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

জনৈক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকেও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ী নিকটেই ছিল। তখন গাড়ীর চালক মাটির উপর মুখ রাখিয়া গোঙাইতেছিল এবং গাড়ীর মধ্যে সার্জেণ্ট মেজর ফেরেলের মৃতদেহ দেখিতে পাই।

মিঃ ফারমার এবং আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আমাদের অবিলম্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, কোতোয়ালী পুলিশ থানা এবং পুলিশ লাইন ইত্যাদি পরিদর্শন করা আবশ্যক। তৎপর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গমন করি এবং তথায় সকলই ঠিক রহিয়াছে দেখিতে পাই। কোতোয়ালী পুলিশ থানায় যাইয়া দেখি যে, তাহারা ইতিমধ্যেই এ সংবাদ পাইয়াছে। ইহার পর আমি ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে যাই এবং তথাকার গ্যারেজে আমার গাড়ীখানা রাখিয়া দিই।

পরে লুইসগান সহ আমরা ওয়াটার ওয়ার্কসের দিকে অগ্রসর হই। আমি দেখিতে পাই যে জনৈক ব্যক্তি আমাদের দিকে আসিতেছে। ঐ ব্যক্তি অগ্রসর হইলে তাহাকে সঞ্জীব নাগ বলিয়া চিনিতে পারি। পুলিশ লাইনের উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে লুইসগান সহ আমি অগ্রসর হই। লুইসগানটি তথায় রাখা হইলে পর অস্ত্রাগারের নিকটে যাহাদিগকে ঘুরিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ৩/৪ বার গুলি ছোঁড়া হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে তাহারাও আমাদের দিকে গুলি চালায়।

আমরা যে স্থানে আশ্রয় নিয়াছিলাম তাহা মোটেই নিরাপদজনক নয় দেখিয়া আরও সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় নিবার জন্য আমি চেষ্টা করি। এই সময় আমাকে বলা হয় যে, আমাদের বারুদ বেশী নাই, মোটে দুই ড্রাম আছে।

মিঃ ফারমার আমাকে আরও কিছু বারুদ আনিবার জন্য বলেন। অতঃপর আমি পুনরায় ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের গ্যারেজে যাইয়া আমার গাড়ীখানা আনয়ন করি এবং এ. এফ. আই. অস্ত্রাগারে যাইয়া আরও কিছু বারুদ সংগ্রহ করিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসএ প্রত্যাবর্তন করি।

অস্ত্রাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাই যে, মিঃ ফারমার তাঁহার দলবলসহ ওয়াটার ওয়ার্কস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরের ছাদে আশ্রয় নিয়াছেন। তথা হইতে নামিয়া অক্সিলিয়ারী ফোর্সের ২০/২৫ জন সদস্যকে আমরা দেখিতে পাই। তখন আমরা দুইটি দল গঠন করিয়া বস্তির মধ্য দিয়া লাইনের দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু তখন আক্রমণকারীগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি অনুমান ৩টা হইবে।

আমরা অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, অস্ত্রাগারে তখনও আগুন রহিয়াছে। কাপড়ের দোকানের পাশের রাস্তায়ই একখানা মোটর গাড়ী পড়িয়াছিল। ঐ গাড়ীর পিছনে একগাছা দড়িও ছিল। অস্ত্রাগারের নিম্নে একখানা শিভ্রোলেট এবং একখানা বেবি অষ্টিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। শিভ্রোলেট গাড়ীখানায় বহুসংখ্যক পুলিশ রাইফেল এবং অষ্টিনখানাতে অল্প

সংখ্যক রাইফেল বন্দুক ছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে পর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পরিত্যক্ত জিনিস সমূহের একটা তালিকা করিতে বলা হয়। কাপড়ের দোকানে যাইয়া দেখি যে, তথায় কি একটা জিনিস পড়িয়া আছে। পরে দেখি—উহা একটি বোমা। রাস্তার উপরেও একটি বোমা পাওয়া যায়।

ভোর ৬-৩০ টার সময় টেলিফোন অফিসে গমন করি। তথায় দেখি যে, এক্সচেঞ্জ বোর্ড এবং তার সকল পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তথায় টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট মিঃ সুটএর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ৮-৩০টার সময় পুলিশ লাইনে যাই এবং কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ঘটনার বিস্তৃত অনুসন্ধানের ভার দিই। সার্জেণ্ট মসেড ও আরও ৪০ জন পুলিশ কর্মচারীকে আক্রমণকারীদের অনুসন্ধানার্থ পাহাড়ের দিকে প্রেরণ করি।

১৯শে এপ্রিল দ্বিপ্রহরে আমি গণেশ ঘোষের বাটিতে যাই এবং গোয়েন্দা-বিভাগের সারদা ভট্টাচার্যকে ঐ বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে বলা হয়। তথায় প্রায় ১৫/২০ মিনিট আমি অপেক্ষা করি। আমি সারদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কিছু পাইয়াছেন কিনা?

তিনি আমাকে ৪/৫টি বন্দুক দেখান, এতদ্ব্যতীত অনেক কাগজপত্রও পাওয়া যায়। একটি প্রয়োজনীয় দলিলও ঐ কাগজপত্রের মধ্যে ছিল। উহা লোক সংগ্রহ করিবার তালিকা।

অপরাহ্ণ ৪-৩০ টার সময় আমরা সংবাদ পাই যে, আক্রমণকারীদের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়া ঐ দিকে আমরা অগ্রসর হই। যখন আমরা ফিরিতেছিলাম, তখন জনৈক কনেষ্টবল সংবাদ প্রদান করে যে, নিকটবর্তী কোনও এক বাসায় একজন আহত বালক রহিয়াছে। আমরা তখন ঐ বাটীতে প্রবেশ করি এবং একটি কম্বলের নীচ হইতে বালককে বাহির করি। বালকটির বক্ষ হস্তপদ প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আহত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে চুপ করিয়া থাকে। সে তাহার নাম সুধাংশু অথবা হিমাংশু সেন বলে। হিমাংশুকে আমি হাসপাতালে নিয়া যাইবার জন্য বলি।

২০শে এপ্রিল আমি আরও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীসহ নাগরখানা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত গমন করি। ঐ স্থানে যে লোকজন ছিল তাহার চিহ্ন তখনও তথায় ছিল। ২১শে তারিখ এমন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। অপরাহ্ণ ৩টার সময় সাবইন্সপেক্টার মহিদর আলী সংবাদ আনয়ন করে যে, হাট হাজারী রাস্তার পার্শ্বে মসজিদের নিকট পাহাড়ে বিদ্রোহীদের দেখা গিয়াছে।

২২শে এপ্রিল আমি এই মর্মে আদেশ পাই যে, জনৈক ফটোগ্রাফার

মহকুমা হাকিম এবং সিভিল সার্জন সহ পাহাড়ের দিকে যাইতে হইবে। ঐ পাহাড়ের নাম জালালাবাদ পাহাড়। তথায় যাইয়া আমি মিঃ লুইস এবং ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসএর একটি দল এবং সাবইন্সপেক্টার হেম গুপ্তকে দেখিতে পাই।

আমি রাস্তার উপর দশটি মৃতদেহ দেখিতে পাই। তথায় একজন আহতও ছিল। তাহার জবানবন্দী মহকুমা হাকিম গ্রহণ করিয়াছেন। সে তাহার নাম মতিলাল কানুনগু বলিয়াছে। সে একটার সময় মারা যায় এবং ফটোগ্রাফার তাহার ফটো তুলিয়া রাখে।

মিঃ লুইস এবং হেম গুপ্তের নিকট জানিতে পারি যে, আরো একটি বালকও গুরুতর আহত হইয়াছে। ট্রেনে তাহাকে চট্টগ্রামে নেওয়া হয়। ফটো তুলিবার সময় মতি কানুনগু মারা যান। হেমবাবু আমাকে জানান যে, নরেশ রায়ের নিকট ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের একটি নক্সা পাওয়া যায়। অপরাহ্ন ৩-৩০ টার সময় আমি পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করি।

২৩ শে সকাল বেলা ১০-৩০ টার সময় কোতোয়ালী থানাতে আমি যখন কাজ করিতে থাকি, তখন একজন কনেষ্টবল দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জানায় যে, একজন বিদ্রোহী তাহাকে রিভলবার প্রদর্শন করিয়া ভয় দেখাইতেছে। আমি তখনই উপস্থিত হইয়া পুলিশ কর্মচারীগণকে ঐ স্থান ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ করি।

আলকারণ লেন দিয়া আমরা অগ্রসর হইবার সময় দেখিতে পাই যে, কালভার্টের নিম্ন হইতে আমার প্রতি কেহ একটি পিস্তল লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। আমি তখন দুইবার গুলি চালাই এবং বালকটি আহত হয়। কালভার্টের নিম্ন হইতে তাহাকে আনয়ন করা হইলে তাহাকে অমরেন্দ্র নন্দী বলিয়া চেনা যায়। তখনই ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান হয়।

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষ্য শেষ হইবার পূর্বেই আদালতের কার্য সেদিনকার মত শেষ হইয়া যায়। [বঙ্গবাণী : ১৫-১০-৩০]

শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর জেরা

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রি হইতে পরদিবস ভোর পর্যন্ত আপনি কি আক্রমণকারীদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন ?

উঃ—না।

প্রঃ—সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীববাবু কাহাকেও সনাক্ত করিয়াছেন কিনা তাহা কি খোঁজ করিয়াছিলেন ?

উঃ—না।

প্রঃ—জরাসন্ধ বড়ুয়া কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা কি খোঁজ করিয়াছিলেন ?

উঃ—না।

প্রঃ—তাহা হইলে সঞ্জীববাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়ার পর হইতে তৎপরদিবস সকাল ৮-৩০ টার মধ্যে এমন কাহারও সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই—যে নাকি কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছে?

উঃ—আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই।

প্রঃ—সনাক্ত করিয়াছে বলিয়া ঐ সময়ের মধ্যে কেহ আপনার নিকট বলেও নাই?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনি হিমাংশুকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ, তাহাকে শুধু দণ্ডীভূত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

প্রঃ—সে কি বলিল?

উঃ—কোন উত্তর প্রদান করিল না।

এই সময় প্রেসিডেণ্ট সাক্ষীর প্রতি কতিপয় কাগজপত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, গণেশ ঘোষের বাড়ীতে ঐ সকল কাগজপত্রই কি সারদাবাবু তাহাকে দেখাইয়াছিলেন? সাক্ষী সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বসু—ঐ সকল কাগজ কি আপনি হস্তে নিয়াছিলেন?

উঃ—না, সারদাবাবু হাতে করিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, কাগজগুলি খুবই দরকারী—যেহেতু কাগজে অনেক লোকের নাম রহিয়াছে। আমি ঐ কাগজগুলি অত্যন্ত সাবধানে রাখিয়া দিবার জন্য বলি। [বঙ্গবাণী : ১৬-১০-৩০]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. আর. উইলকিনসন সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে যখন আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, তখন বারান্দায় কতিপয় ব্যক্তির পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগরিত হই এবং বাহিরে আসিয়া একজন পুলিশ কনেষ্টবল এবং টেলিগ্রাফ পিয়নকে দেখিতে পাই। পুলিশ কনেষ্টবল বলে যে, পুলিশ লাইন স্বদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে প্রেরণ করিয়াছে।

আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া কনেষ্টবল জরাসন্ধ বড়ুয়া সহ আমার গাড়ীতে করিয়া অগ্রসর হই। আমার ভৃত্য কনেষ্টবলটি আমার নিকট বন্দুক ও এক প্যাকেট কার্তুজ দিয়া দেয়। পিকাডেলি সার্কাসের নিকট ক্যাপ্টেন টেট, মিঃ লজ, অপর একজন ইয়োরোপীয়ান ও কতিপয় মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয়।

আমি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলোয় যাই এবং জানিতে পারি, তিনি

এ. এফ. আই. অস্ত্রাগার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। তৎপর আমি পুনরায় ক্যাপ্টেন টেটের নিকট যাই। ঐ সময় রেলওয়ে ষ্টেশনের দিক হইতে অপর একখানি মোটর আসিয়া হাজির হয়। ঐ গাড়ীতে কতিপয় মহিলা ছিলেন। আমরা মহিলাগণকে ঐ গাড়ীতে করিয়াই রেলওয়ে এজেণ্টের বাংলোতে পাঠাইয়া দিই।

অতঃপর ক্যাপ্টেন টেট এবং আমি এ. এফ. আই অস্ত্রাগার অভিমুখে অগ্রসর হই। আমার চালক গাড়ী চালাইতেছিল। পিছনের আসনে আমি এবং আমার পার্শ্বে জরাসন্ধ বড়ুয়া ছিল। মিঃ টেটের গাড়ীতে লজ, ক্যারেল এবং হোয়াইট ছিলেন। অস্ত্রাগারের নিকট উপস্থিত হইলে পর আমাদের গাড়ীর গতি রোধ করা হয়।

আমি তাহার উত্তরে "বন্ধু" বলিয়া গাড়ী চালাইতে থাকি। এই সময় অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে থাকে এবং 'ফিরিয়া যাও' এ শব্দ শুনিতে পাই। আমার গাড়ীর চালক আহত এবং জরাসন্ধ বড়ুয়া নিহত হয়। টেটের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা জেটির দিকে যাই, পরে পুনরায় অস্ত্রাগারে আগমন করি। আমরা তখন দেখিতে পাই যে, অস্ত্রাগারে এখনও আগুন জ্বলিতেছে এবং কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান তথায় সমবেত হইয়াছেন।

পরে পুলিশ লাইন হইতে মিঃ জনসন আগমন করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সময় আক্রমণকারীগণ চলিয়া গিয়াছিল।

আমরা হেড কোয়ার্টার্সে ৩টার সময় যাই। তথায় বহু মৃতদেহ দেখি। অতঃপর আমার গাড়ীর চালককে পাহাড়তলী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখি যে, আমার বন্দুক এবং কার্তুজের প্যাকেটটি হারাইয়া গিয়াছে। ৬-৩০ কিম্বা ৭টার সময় আমি আমার বাংলোতে ফিরিয়া যাই।

২২শে এপ্রিল মিঃ ফারমার এবং অন্যান্যের সহিত বিদ্রোহীদল পাহাড়ের কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করি। এ. এফ. আই এবং ই. বি. এফ রাইফেল্‌স্ বাহিনীর সৈন্যগণকে তথায় প্রেরণ করিতে আমি এই শর্তে রাজী হই যে, সন্ধ্যার পূর্বেই তাহারা শহরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। এই বন্দোবস্ত শহর রক্ষার্থে করা হয়।

অনন্ত সিংকে যখন চট্টগ্রামে আনয়ন করা হয়, তখন আমি জেল দরজায় ছিলাম। যখন তাহাকে জেলের মধ্যে লওয়া হয়, তখন আমি 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি শুনিতে পাই। আমি জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, মামলায় বিচারাধীন আসামীগণ ওরূপ ধ্বনি করিয়াছে। তাহারা এই বলিয়াছে যে, 'আমাদের দলপতি আসিয়াছেন।'

শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর জেরা

প্রঃ—অনন্ত সিং কোন ক্লাবের ব্যায়াম শিক্ষক তাহা আপনি জানেন ?

উঃ—হ্যাঁ, শুনিয়াছি।

প্রঃ—তাহার বেতন সম্পর্কে কিছু জানেন ?

উঃ—সে কোনও প্রকার ভাতা পাইত কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যেখানে সে কাজ করিত সেই প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইত।

প্রঃ—এই সমস্ত ক্লাব মাঝে মাঝে যে শারীরিক শক্তি প্রদর্শনী করিয়া থাকে তাহা আপনি জানেন ?

উঃ—আমি তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোথাও দেখি নাই।

প্রঃ—১৮ই তারিখের ঘটনার পূর্বে কোনও প্রকার সশস্ত্র বিদ্রোহ বা ঐ রূপ কিছু ঘটিতে পারে বলিয়া কখনও কি আপনার মনে জাগে নাই ?

উঃ—বিপ্লবীদের আক্রমণ ঘটিতে পারে বলিয়া আমার ধারণা ছিল।

প্রঃ—ঐ সন্দেহের জন্য কোনও প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল কি ?

উঃ—আমি উহার উত্তর দিতে অস্বীকার করি।

প্রঃ—আপনি সে অধিকার পাইতে পারেন না।

উঃ—আমি বিস্তৃত বলিতে পারি না।

প্রঃ—আমি এখনও তাহা জানিতে চাহি না।

উঃ—কতকাংশে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বৈকি।

প্রঃ—পূর্ববারের জেরায় আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তেজিত পুলিশকর্মচারীগণ দ্বারা এই আক্রমণ হইয়াছে কিনা, তখন আপনি বলিয়াছেন—'না'। এখনও কি তাই বলেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, পুলিশ বাহিনী তাহাদের বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বাঙ্গালা সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল, উহা আমি মে মাসে জানিতে পারি। ঐ আবেদন সরকারের হস্তগত হইয়াছে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। [বঙ্গবাণী : ১৯-১০-৩০]

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত

১৭ই অক্টোবর শুক্রবার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামীদের কৌঁসুলীদের মধ্যে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত উপস্থিত থাকেন। প্রেসিডেণ্ট কামিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোনও আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন কিনা। উত্তরে কামিনীবাবু জানান যে, তিনি আসামী গোলাপ সিংএর পক্ষ সমর্থন করিবেন; কিন্তু সর্বদা

উপস্থিত থাকিয়া মামলার তদ্বির করিতে পারিবেন না। তবে যখনই দরকার হইবে, তখনই তিনি উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে অন্য কোন কৌঁসুলী আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন। [বঙ্গবাণী : ২৫-১০-৩০]

অতঃপর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্ণকে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আপনি পাহাড়তলীর দিকেই গমন করেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—প্রথম যখন আপনি পাহাড়তলীতে যান তখন সময় কত?

উঃ—রাত্রি ১১-১৫ মিনিট হইবে।

প্রঃ—প্রকৃত পক্ষে আক্রমণকারীদের কাহাকেও আপনি দেখেন নাই?

উঃ—না, শুধু টর্চ হাতে তাহাদিগকে ইতঃস্তত ঘুরিতে দেখিয়াছি।

প্রঃ—উক্ত রাত্রিতে কেহই আক্রমণকারীদের দেখিয়াছে বলিয়া আপনাকে বলেন নাই?

উঃ—না।

ষ্টেশন মাষ্টারের সাক্ষ্য

১৮ই এপ্রিল ধুম স্টেশনে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত কে. সি. রায় রিলিভিং স্টেশন মাষ্টারের কাজ করেন। তিনি বলেন যে, লাকসাম হইতে চট্টগ্রামে যে বোলতার ট্রেন যায় তাহা ৯-৩৫ টার সময় ধুম ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যায়।

কিছু সময় পরই মিরসরাই হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে,—ট্রেনখানা কোথায়? তদুত্তরে তিনি জানান যে, ট্রেনখানা ধুম ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার অল্প সময় পরেই ট্রেনের এঞ্জিনের একজন খালাসী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলে যে, ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া উক্ত সংবাদ লাকসাম ও চট্টগ্রাম ষ্টেশনে প্রেরণ করেন।

আকবর আলীর সাক্ষ্য

ফরিয়াদী পক্ষের ৩৯ নং সাক্ষী আকবর আলী বলে যে, সে অস্ত্রাগারের একজন প্রহরী। ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ছিল।

রাত্রি ১০ টার সময় তাহার পাহারা বদল হয়। অতঃপর বারান্দার একটি খাটিয়ার উপর সে শয়ন করে। কিছু সময় পর পৃষ্ঠদেশে গুরুতর আঘাত পাইয়া সে জাগরিত হয়। সে দেখিতে পায় যে, ঐ সময়কার প্রহরী কিষেনবক্স নীচে পড়িয়া আছে। অপর প্রহরী গোলাম জিলানের কি অবস্থা হয় তাহা সে দেখে নাই।

অতঃপর সে ডবলমুরিং পর্যন্ত চলিয়া যায়। তথায় সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া থাকে। ভোর ৪ টার সময় ডবলমুরিংএ ক্যাপ্টেন টেটকে সে দেখিতে পায়। পরে সে দুই দিবস পর্যন্ত জাহাজে তথাকার খালাসীগণ সহ বাস করে। অতঃপর বাগদাদশা আসিয়া তাহাকে অস্ত্রাগারে লইয়া যায়। বাগদাদশা বর্তমানে তাহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া তাহার জন্মস্থান পাঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু অতঃপর সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—কয়টার সময় তুমি শয়ন করিতে যাও?

উঃ—১০টার সময়—পাহারা শেষ হইবার পরেই।

প্রঃ—তাহার কতক্ষণ পরে তোমার ঘুম আসে?

উঃ—২।৩ মিনিট পরেই।

প্রঃ—পাহারা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যদি ঘুমাইয়া পড়, তাহা হইলে যখন পাহাড়া দিতেছিল, তখন কি ঝিমাইতেছিলে?

উঃ—না।

প্রঃ—ডবলমুরিং থেকে পরদিন কেন ফিরিয়া আস নাই? খুব ভয় পাইয়াছিলে?

উঃ—না, ভয় পাই নাই, তবে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসার পথ জানিতাম না।

প্রঃ—তুমি ডবলমুরিং যাইতে পারিলে অথচ ফিরিয়া আসিবার পথ বাহির করিতে পার নাই?

উঃ—আমি পথ জানিতাম না।

শীতলপ্রসাদ দুবের সাক্ষ্য

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী কনেষ্টবল শীতলপ্রসাদ দুবে বলে যে, গত ১৮ই এপ্রিল রাত্রে সে পুলিশ ব্যারাকে ছিল। রাত্রি সওয়া দশটার সময় অস্ত্রাগারের নিকট 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি হইতে থাকে। ইহা শুনিয়া সে অস্ত্রাগার অভিমুখে যায় এবং অস্ত্রাগার হইতে ২০।২৫ হাত উত্তরে পৌঁছিয়া দেখে যে, খাকি সার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরিহিত ৫০।৬০ জন লোক অস্ত্রাগার ঘেরাও করিতেছে।

তাহাদের নিকট টর্চ লাইট ছিল এবং তাহারা গুলি চালাইতেছিল। একটি গুলি আসিয়া সাক্ষীর বাম করতলে লাগে এবং সে ছুটিয়া পুলিশ হাসপাতালে যায়। পুলিশ হাসপাতাল হইতে তাহাকে পরে জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দুই মাস চিকিৎসার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রে পুলিশ ব্যারাকে কতজন কনেষ্টবল ছিল?

উঃ—৬০।৭০ জন।

শ্রীযুক্ত জে. কে. ঘোষাল জিজ্ঞাসা করেন—যে সাবইন্সপেক্টার তোমার জবানবন্দী লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে তুমি কি বল নাই ৬০।৭০ জন ছিল ?

উঃ—বলিয়াছিলাম।

প্রঃ—তিনি কি উহা লিপিবন্ধ করেন নাই ?

উঃ—জানি না।

প্রঃ—তুমি কি তাহাকে বল নাই যে, যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বন্দেমাতরম বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল ?

উঃ—বলিয়াছিলাম।

প্রঃ—কিন্তু উহাও কি লিপিবন্ধ হয় নাই ?

উঃ—জানি না। [বঙ্গবাণী : ২৮-১০-৩০]

গডফ্রের সাক্ষ্য

ফরিয়াদী পক্ষের ৪৮নং সাক্ষী চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ অফিসের এস. ডি. ও. মিঃ ডবলিউ. ই. গডফ্রে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন যে; ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত তিনি রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে ছিলেন। পরে তিনি মেজর ফ্যারেলের স্ত্রী মিসেস ফ্যারেলসহ মেজর ফ্যারেলের বাংলোতে যান। বাংলোটি অস্ত্রাগারের সীমানার মধ্যে। তিনি গাড়ীতে করিয়াই গিয়াছিলেন। মেজর ফ্যারেল তখনও ইনষ্টিটিউটে ছিলেন। কখন মেজর প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

মিসেস ফ্যারেলকে বাংলোতে রাখিয়া যখন তিনি ফিরিতেছিলেন, তখন ক্রশরোডে ২।৩ খানা মোটর দেখিতে পান। গাড়ীতে যাহারা ছিল তাহাদের খাকি পোষাক ও মুখমণ্ডল সাদা ছিল। একখানা সবুজ রংয়ের প্রকাণ্ড শিভ্রোলেট গাড়ী দেওয়ান হাটের দিক হইতে আসিয়া তাহার দক্ষিণ ভাগে প্রায় তাহার গাড়ীর উপরই আসিয়া পড়ে। তিনি তাহার পথে অগ্রসর হন।

মিঃ ব্রিসের বাংলো অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আলোবিহীন অবস্থায় একখানা গাড়ী তিনি দেখিতে পান। ঐ গাড়ীখানা তখন হঠাৎ চলিয়া যায়। গাড়ীর মধ্যে কে ছিল তাহা তিনি দেখেন নাই। তখন রাত্রি ৯টা ২০ মিঃ হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার বাটী চলিয়া যান।

রাত্রি ১০টার সময় যখন তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার জানালায় একটি বুলেট আসিয়া পড়ে। উহা কোন প্রকার পটকা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন এবং নিদ্রা যান। দুপুর রাত্রিতে টেলিফোন ইন্সপেক্টার জনাব আলী তাহাকে জাগরিত করিয়া বলে যে, কতিপয় অজ্ঞাতব্যক্তি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পোড়াইয়া দিয়াছে।

তখনই তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং দেখিতে পান যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ তখনও জ্বলিতেছে। তিনি তার সারাই করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হন। অতঃপর রাত্রি ২টার সময় তিনি তাহার বাটীতে গমন করেন। যখন তিনি একখানা ভাড়াটে গাড়ী করিয়া তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন পুলিশ লাইন হইতে কতিপয় বুলেট তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যায়।

সকালবেলা তিনি জানিতে পারেন যে, জোরারগঞ্জের নিকটে তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে নাঙ্গলকোটেও তার কাটিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পান। [বঙ্গবাণী : ২৯-১০-৩০

মিঃ উইটনের সাক্ষ্য

সাক্ষী মিঃ ই. পি. উইটন চট্টগ্রামস্থিত বুলক ব্রাদার্সের একজন সহকর্মী। তিনি বলেন যে ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০টার পর তিনি চট্টগ্রাম ক্লাবে কিছুক্ষণ ছিলেন। এই সময় মিঃ লেজ আসিয়া তাহাকে বলেন যে, এ. এফ. আই. হেডকোয়ার্টার্সে যাইতে হইবে। তাহারা যখন অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন পথিমধ্যে ক্যাপ্টেন টেটের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়।

ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ীতে করিয়াই তখন তাহারা অগ্রস হইতে থাকেন। ক্রশরোডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর দুইখানা গাড়ীতে করিয়া তাহারা এ. এফ. আই অস্ত্রাগারে উপস্থিত হন। অস্ত্রাগার হইতে প্রায় ২০ হাত দূরে হইতে তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইতে থাকে। তখন আশ্রয় লাভের জন্য গাড়ীর পশ্চাতে তিনি গমন করেন, কিন্তু একটি বুলেট আসিয়া তাহার মস্তকের বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি ব্রিজের দিকে দৌড়াইয়া যান।

সাক্ষীকে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—জেল ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ীতে করিয়া একটি বন্দুক নিয়াছিলেন কি ?

উঃ—আমার স্মরণ হয় না।

প্রঃ—তিনি কি আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, অস্ত্রাগার আক্রান্ত হইয়াছে ?

উঃ—না, বলেন নাই।

প্রঃ—ক্যাপ্টেন টেট বলিয়াছিলেন ?

উঃ—না, বলেন নাই। [বঙ্গবাণী : ৩০-১০-৩০]

ডি. এস. পি-র সাক্ষ্য

ফরিয়াদী পক্ষের ৫২ নং সাক্ষী ডি. এস. পি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মল্লিক অতঃপর সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামে ৬ই এপ্রিল

(১৯৩০) কার্যভার গ্রহণ করার পর হইতে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত জেলার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল।

যখন তিনি কাজে যোগদান করেন তখন একজন ইন্সপেক্টার, ৩ জন সাব-ইন্সপেক্টার, ৬ জন সহকারী সাবইন্সপেক্টার, ৪ জন হেড কনেস্টবল এবং ১২।১৩ জন কনেস্টবল ছিল। রেলওয়ে স্টেশন, সভা সমিতির উপর লক্ষ্য রাখাই তাহাদের কাজ।

নভেম্বরের শেষ ভাগে তাহারা এই আদেশ পান যে, ছয়জন ভূতপূর্ব রাজবন্দীর উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের নাম শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল এবং চারুবিকাশ দত্ত। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা গুপ্তচরের সংখ্যা বাড়াইয়া দেন। বিশেষ কোন সংবাদ থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট জানাইবার আদেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষীকে অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—আপনি জেলার গুপ্তচর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে ভূতপূর্ব রাজবন্দীদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—অস্ত্রাগার আক্রমণের পূর্বে কেহ কি আপনার নিকট ঐরূপ কোন রিপোর্ট করিয়াছিলেন?

উঃ—আমার স্মরণ হয় না।

প্রঃ—আপনি শুধু 'আমার স্মরণ হয় না' বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। হ্যাঁ কিম্বা না বলিবেন। আচ্ছা, আপনি আপনার কোনও গুপ্তচর অথবা তাহাদের ঊর্ধ্বতন কোনও কর্মচারী হইতে এইরূপ কোনও রিপোর্ট পাইয়াছিলেন কি যে, গণেশবাবু অথবা অনন্তবাবু—কিম্বা লোকনাথবাবু আক্রমণের জন্য কোনও প্রকার আয়োজন করিতেছেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—তাহারা যে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন কি?

উঃ—হ্যাঁ, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষ কলিকাতা হইতে যে অস্ত্র আনয়ন করিতেছেন তাহা তিনি শুনিয়াছেন। এই সংবাদ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফতে আসে। এবং তাহা খুব সম্ভব জানুয়ারী মাসে।

প্রঃ—এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়ার পর ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে কোনদিন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন কি?

উঃ—না।

প্রঃ—রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ী একটি বোমা ফাটিয়াছিল জানেন কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—ঐ সম্পর্কে বর্তমান আসামীদের কারও বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন কি ?

উঃ—না।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রির অন্ধকার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?

উঃ—খুবই অন্ধকার ছিল।

প্রঃ—ঘটনার পরে কোতোয়ালী হইতে যাইয়া আপনি কি করিলেন ? ঘুমাইতেছিলেন কি ?

উঃ—না বস্তীতে বসিয়া আমি লক্ষ্য রাখিতেছিলাম।

প্রঃ—আক্রমণকারীদের প্রতি একবারও গুলি চালাইয়াছিলেন ?

উঃ—না, যখন আমরা লাইনের দিকে অগ্রসর হই, তখন আমাদের প্রতি গুলি বর্ষিত হয়। সুতরাং আমরা পিছনে ফিরিয়া যাই এবং বাড়ির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করি।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি পুলিশবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ একবারও গুলি চালাইতে পারিলেন না—ইহা কি হাস্যকর ব্যাপার নহে ?

উঃ—আমরা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাই নাই। রাত্রির অন্ধকারে কিছু না দেখিয়া গুলি চালান অবিবেচকের কাজ হইত।

অতঃপর সাক্ষীকে কালার পুলের ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে পর শ্রীযুক্ত জে. কে. ঘোষাল পুনরায় সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসুর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, যখন ফণী নন্দীকে গ্রেপ্তার করিয়া শিকলে বাঁধিয়া আপনার সকাশে আনয়ন করা হয়, তখন সে উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। আপনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?

উঃ—না, আমি ঐ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করি নাই।

প্রঃ—আপনি একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী। 'আমি তদন্ত করি নাই'—এই কথা বলিলে আপনার পক্ষে অন্যায় করা হয়।

[বঙ্গবাণী ২-১১-৩০]

দারোগা হেমচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষ্য

এইদিন ফরিয়াদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী দারোগা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুপ্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকা হইতে ১৯শে এপ্রিল অপরাহ্নে তিনি চট্টগ্রাম আগমন করেন। কোতোয়ালীতে যাওয়ার পরই সংবাদ পাইয়া তিনি কতিপয় সার্জেন্ট, ডি. আই. জি এবং এস. পি এবং একদল পুলিশসহ দেব

পাহাড়ে গমন করেন। তথায় আসামী মনা গুপ্তের বাটী এবং সমগ্র পাহাড়টি তল্লাসী করেন।

৫ই মে তিনি মোহরায় আসামী ফকির সেনকে গ্রেপ্তার করেন। ৭ই মে রাত্রি প্রায় ৮-৩০ টার সময় তিনি সংবাদ পান যে, কতিপয় সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি নদী পার হইয়া ওপারে যাইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি আরও কতিপয় পুলিশকর্মচারী সহ সেই দিকে গমন করেন।

নদী পার হইয়া তাহারা দেখিতে পান যে, প্রায় ছয়জন লোক চলিয়া যাইতেছে। তখন তাহারা (পুলিশবাহিনী) সাহায্য পাইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পলায়নকারীরা অদৃশ্য হইয়া যায়।

কালার পুলের ঘটনা

সাক্ষী বলেন যে; পরে তাহারা কালার পুল অভিমুখে গমন করেন। যখন তিনি সদলবলে কালার পুল অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন কিছু দূরে তাহারা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পান। কালার পুলে যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, ইতিমধ্যেই ডি. আই. জি এবং কর্ণেল স্মিথ তথায় পেঁাছিয়াছেন এবং আসামী সুবোধ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কনেষ্টবল প্রসন্ন বড়ুয়া গুরুতর-ভাবে আহত হইয়াছিল।

সমিরপুর অভিমুখে চারিজন আসামী গিয়াছে শুনিয়া ডি. আই. জি কতিপয় গুর্খা সৈন্য সহ সেইদিকে গমন করেন। যখন তাঁহারা একটি পুকুরের নিকট দিয়া যাইতে থাকেন, তখন তাহাদের প্রতি গুলি বর্ষিত হয়। ৪।৫ মিনিট উভয় পক্ষ গুলি চালাইবার পর বিদ্রোহী পক্ষ চুপ করে। তৎপর ঘটনাস্থলে যাইয়া তাহারা দেখিতে পান যে, ৩ জন যুবক নিহত হইয়াছে এবং একজন আহত অবস্থায় রহিয়াছে।

নিহত তিনজনের নাম মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন এবং স্বদেশ রায়। আহত দেবপ্রসাদকে তিনি (সাক্ষী) জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে কিনা। দেবপ্রসাদ উত্তরে বলেন যে, 'এই কি মিঃ লোম্যান! তাহা হইলে তাহাকে আমি গুলি করিতে ইচ্ছা করি।' অতঃপর সে তাহার দক্ষিণহস্ত দেখাইয়া বলে যে, 'এই হাত জখম বলিয়া, নচেৎ আমায় জীবিত ধরিতে পারিতে না।'

এই সময় শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষী মিঃ লোম্যান সম্বন্ধে উল্লেখ করায় তাহা নথিভুক্ত করিতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, 'যদি মিঃ লোম্যান এখানে উপস্থিত থাকিত তবে তাহাকে গুলি করিতাম'—এই জবানবন্দীর কোন কারণ থাকিতে পারে না।

খান বাহাদুর আব্দুল হাই—কিন্তু এই ইচ্ছা কি খারাপ নহে?

শ্রীযুক্ত বসু : হাঁ; যদি মিঃ লোম্যান তথায় থাকিতেন।

[বংগবাণী : ৫-১১-৩০]

হেম গুপ্তকে জেরা

আসামী পক্ষের কৌশুলী শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—২২শে এপ্রিল অপরাহ্নে আপনারা সদলবলে জালালাবাদ পাহাড় অভিমুখে অগ্রসর হন। আচ্ছা, কতিপয় রাজদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনারা কি পুলিশবাহিনী হিসাবে যান, না যুদ্ধার্থ সামরিক বাহিনী হিসাবে যান?

উঃ—আমার মতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়া পুলিশ কর্মচারীগণই তথায় যান।

প্রঃ—বিদ্রোহীরা যখন পর্বতের চূড়া হইতে গুলি বর্ষণ করে, তখন আপনারা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন?

উঃ—পাহাড়ের পাদদেশ হইতে প্রায় ৫০ ফুট দূরে একটি খাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

প্রঃ—আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনারা গুলি চালাইয়াছিলেন?

উঃ—আমার সাথের পুলিশ গুলি চালায়।

প্রঃ—গুলি চালাইবার আদেশ কে প্রদান করেন?

উঃ—ক্যাপ্টেন টেট্।

প্রঃ—তিনি তো পুলিশ কর্মচারী নহেন? আপনি বলিতে পারেন তিনি কাহার আদেশক্রমে গুলি চালাইবার হুকুম দেন?

উঃ—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

প্রঃ—আপনারা অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদের ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—কিম্বা পাহাড়টিকে ঘিরিয়া বিদ্রোহীদের ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? [বংগবাণী : ৯-১১-৩০]

উঃ—না।

আরও জেরা

প্রঃ—আপনি ফকির সেনকে তাহার পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লঞ্চে করিয়া আনিয়াছিলেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—লঞ্চের উপর আপনি ফকিরের নিকট হইতে একটি জবানবন্দী বাহির করিবার জন্য তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনি কি তাহাকে বলেন নাই—'বলাবি-বলাবি, যখন উরচার (পীড়ন) হবে, তখন বলাবি।'

উঃ—না, আমি তাহা বলি নাই।

প্রঃ—যে সময় সে হাজতে ছিল, সে সময় আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিতেন?

উঃ—মাঝে মাঝে।

প্রঃ—আপনি কি জানেন যে, তাহাকে জালালাবাদে নিহত ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ দেখান হইয়াছিল?

উঃ—আমি জানি না।

প্রঃ—যখন ফকিরের পরিবারের লোকেরা কোতোয়ালীতে তাহার সহিত দেখা করেন, তখন জনৈক কর্মচারী ফকিরকে বলিয়াছিল যে, সে যদি একটি জবানবন্দী না দেয়, তবে তাহার পরিবারের লোকদের উপর উৎপীড়ন করা হইবে,—তখন কি আপনি কাছে ছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনার জ্ঞাতসারে কি ফকিরকে বলা হইয়াছিল যে, যদি তিনি একটি জবানবন্দী দেন, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে আর কোর্টে উহার পুনরুক্তি করিতে হইবে না?

উঃ—না, আমি এরূপ কিছু জানি না। [বঙ্গবাণী: ১১-১১-৩০]

ফেণী ষ্টেশনের ঘটনা

সরকারী পক্ষের সাক্ষী ফেণীর পুলিশ ইন্সপেক্টার ফজল বসির তাহার সাক্ষ্যে বলেন—তিনি সাবইন্সপেক্টার যতীন্দ্র রায় এবং কয়েকজন কনেষ্টবল সহ গত ২২শে এপ্রিল রাত্রে ফেণী রেল ষ্টেশনে ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ভাটিয়ারীর ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পান যে, চারটি সন্দিগ্ধ রকমের যুবক ৩ নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছে। উক্ত ট্রেনখানি রাত্রি প্রায় একটায় ফেণী ষ্টেশনে আসে।

তাহারা তখন উক্ত যুবকদের খোঁজে ট্রেনের নিকট গমন করেন। গার্ড তাহাদিগকে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া দিয়া বলেন যে, যুবকগণ ঐ কামরায় ভ্রমণ করিতেছে। সাব ইন্সপেক্টার যতীনবাবু তাহাদিগকে নামিতে বলেন। কিন্তু তাহারা যতীনবাবুকে অনুরোধ করিয়া বলে, তাহারা যদি নামে তবে ট্রেন ফেল করিবে।

তারপর তাহাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে সাক্ষী ছাড়া সাবইন্সপেক্টার যতীনবাবু, একজন হাবিলদার, ৪।৫ জন কনেষ্টবল এবং কয়েকজন রেল কর্মচারী ছিলেন। যুবকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় যে,

সে পায়খানায় যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া যায়। হাবিলদার এবং দুইজন কনেস্টবল তাহার সংগে যায়।

সাবইন্সপেক্টার যখন একজন যুবকের দেহ খানাতল্লাশ করিতে যায়, তখন অপর একজন সাক্ষীর দিকে গুলি ছোঁড়ে। তারপর আর একটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। সাক্ষী তারপর লাফাইয়া বাহির হন। নিকটে একজন টিকেট কালেক্টার ছিল, তাহার আংগুলে গুলি লাগে। ইহার পর তিনি চারটে এবং বাহির হইতে ২।৩টি গুলির শব্দ শুনিতে পান। গুলি ছোঁড়ার পর ঘরের মধ্যের এবং বাহিরের যুবকগণ দৌড়াইয়া পালায়।

পরে তিনি দেখিতে পান সাবইন্সপেক্টার যতীন রায়, কনেস্টবল মণীন্দ্র পাল এবং ইয়াকুব আলি আহত হইয়াছে। মণীন্দ্র একজন আততায়ীর হাত হইতে একটি গুলি ভরা ছয়নলা রিভলবার কাড়িয়া লইয়াছিল।

পাবলিক প্রসিকিউটার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ঐ সব যুবকদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন কিনা। সাক্ষী বলেন—তিনি দুইবার—একবার জুলাই মাসে, আর একবার অক্টোবর মাসে সনাক্তকরণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই তিনি কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন নাই।

পাবলিক প্রসিকিউটার তখন সাক্ষীকে ডকের উপর আসামীদের মধ্য হইতে কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন কিনা সে বিষয় চেষ্টা করিতে বলেন আসামী পক্ষের মিঃ বসু ইহাতে আপত্তি করেন।

কৌঁশুলী জে. কে. ঘোষাল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—যুবকেরা কি পোষাক পরিয়াছিল তাহা কি আপনার মনে আছে?

উঃ—তাহাদের পরনে ধুতি ছিল। একজনের গায়ে চাদর এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়—অন্যান্যদের গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ছিল।

প্রঃ—কেহ যদি বলে যে, তাহাদের গায়ে কালো কোট ছিল, তবে তাহা ভুল হইবে?

উঃ—হাঁ, যতদূর আমার স্মরণ আছে।

জে. কে. ঘোষাল (আদালতের প্রতি): আমার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কারণ—সাবইন্সপেক্টার যতীন রায় জবানবন্দী দিয়াছেন যে, তাহাদের দুইজনের গায়ে কালো কোট ছিল।

ক্যাপ্টেন টেট্-এর সাক্ষ্য

এই দিবস ফরিয়াদী পক্ষে ক্যাপ্টেন টেট্ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০ টার সময় তাহার প্রহরী তাহাকে জাগরিত

করিয়া বলে যে, স্বদেশীয়া পুলিশ লাইন এবং অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়াছে।

মেসার্স স্টুটার এবং লজএর বাটী যে পাহাড়ে অবস্থিত তাহার বাটীও সে স্থানেই অবস্থিত। তাহার স্ত্রীকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য তিনি স্ত্রীকে নিয়া গাড়ীতে করিয়া ক্লাবের দিকে যাইতে থাকেন। তিনি মিসেস লজ এবং তাহার স্ত্রীকে এজেণ্টের বাংলো অভিমুখে প্রেরণ করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ অস্ত্রাগার অভিমুখে অগ্রসর হন। সাথে সাথেই তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইতে থাকে। তাহার গাড়ীর জানালার স্ক্রীনের মধ্য দিয়া ৪।৫ টি বুলেট প্রবেশ করে।

তাহারা তখন রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই তাহারা জেটীস্থিত অস্ত্রাগারে যাইবার নিমিত্ত একখানা এঞ্জিনের জন্য আদেশ প্রদান করেন। জেটিতে গমন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট উইলকিনসন একটি জাহাজে উঠিয়া বিনা তারে এই সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন।

ইত্যবসরে সাক্ষী অস্ত্রাগার হইতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র বাহির করেন। পরে তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইয়া এ. এফ. আই হেড কোয়াটার অভিমুখে গমন করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অস্ত্রাগার তখনও জ্বলিতেছিল। সাক্ষী বলেন যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া প্রায় ৪৭৫০০ টাকার ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

[বঙ্গবাণী : ১২-১১-৩০]

সুরেশ দস্তিদারের সাক্ষ্য

৬৯ নং সাক্ষী স্থানীয় এক দর্জির দোকানের কাটার সুরেশ দস্তিদার সাক্ষ্য প্রদান করে। সাক্ষী বলে যে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী খাকী রংয়ের ২টি ড্রিল কোট সে গণেশ ঘোষকে দেয়। ড্রিল কোটের অর্ডার শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষই দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ দোকানে শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংকে নিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এর মাপও লিখিয়া নেওয়া হয়।

এই সময় শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিবার জন্য সাক্ষীকে বলা হয়। ডকে আসামীগণকে দেখিয়া সাক্ষী বলে যে, ওথায় গণেশ ঘোষ নাই। সাক্ষীকে তখন ডকের আরও নিকটে যাইয়া দেখিতে বলা হয়। কিন্তু সাক্ষী বলে যে, আসামীদের মধ্যে সে গণেশ ঘোষকে দেখিতে পাইতেছে না।

প্রেসিডেণ্ট ঃ—তাঁহাকে তুমি পূর্বে জানিতে ?

উঃ—হাঁ।

প্রেসিডেণ্ট ঃ—এবং এখন তুমি তাহাকে এখানে দেখিতেছ না ?

উঃ—আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমি আসামীদিগকে আরও ভাল করিয়া দেখিতে চাই।

আসামীগণকে অতঃপর বারান্দায় সারিবন্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। সাক্ষী অনন্ত সিংকে সনাক্ত করিতে সক্ষম হয় কিন্তু গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিতে পারে না। সাক্ষী বলে যে, আসামীদের মধ্যে গণেশ ঘোষ নাই।

প্রেসিডেন্ট :—পূর্বেও তুমি গণেশ ঘোষকে জানিতে ?

উঃ—হাঁ।

প্রেসিডেন্ট :—সে কোথায় থাকিত ?

উঃ—সদর ঘাটে তাহার কাপড়ের দোকান ছিল এবং ঐ দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় আমি তাহাকে দোকান ঘরের মধ্যে দেখিয়াছি।

প্রেসিডেন্ট :—সেই দোকান দেখাইয়া দিতে পার ?

উঃ—হাঁ।

শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর রক্ত বমন

(সিউড়ী জেলে স্থানান্তরিত)

সিউড়ী, ২১শে নভেম্বর, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠের মামলার আসামী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ চক্রবর্তীকে এখানে আনিয়া স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে। তাঁহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তাঁহাকে অবজারভেসন ওয়ার্ডে রাখা হইয়াছে। শোনা যায়, থুথুর সঙ্গে তাঁহার দুইবার রক্ত উঠিয়াছিল। [বঙ্গবাণী: ২২-১১-৩০]

গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টারের সাক্ষ্য

সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টার সারদা ভট্টাচার্য বলেন যে, ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে তিনি তাহার বাসাতেই ছিলেন। ১০টা কিম্বা ১১টার মধ্যে একটা কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে জানায় যে, পুলিশ লাইন আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, আক্রমণকারীরা আসিয়া তাহার বাটী আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং তিনি বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার নিকট একটি ও তাহার প্রহরীর নিকট একটি রিভলবার ছিল। তাহারা উভয়েই বাড়ী পাহারা দিতে থাকেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—পরদিন আপনি যখন গণেশবাবুর বাটী খানাতল্লাসী করিতে যান, তখন সাক্ষী হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নব নন্দীকে কি আপনি নিয়া যান ?

উঃ—তিনি অল্পসময় তথায় ছিলেন, পরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

প্রঃ—আপনার খানাতল্লাসীর কার্যপ্রণালী অনুমোদন করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়াই কি তিনি চলিয়া যান ?

উঃ—না।

প্রঃ—রাত্রে কনেষ্টবলের মুখে খবর শুনিয়াই কি আপনার সন্দেহ হইল উহা গণেশ ঘোষের কাজ ?

উঃ—সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষের দলের কাজ বলিয়া সন্দেহ হয়।

প্রঃ—গণেশ ঘোষকেই যদি আপনার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা হইলে তখনই কেন তাহার বাড়ীতে যাইয়া খানাতল্লাসী করেন নাই ? (সাক্ষী উত্তরদানে-বিরত থাকেন)

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন, আপনার বাড়ী আক্রান্ত হইবার ভয়ে আপনার ভৃত্যসহ আপনি পাহারা দিতেছিলেন। কিন্তু যদি সমস্ত পুলিশ কর্মচারীই ঐ রাত্রিতে স্ব স্ব বাড়ী পাহারা দিতেন, তাহা হইলে চট্টগ্রামের কি অবস্থা দাঁড়াইত বলিতে পারেন ?

উঃ—আমি জানি না।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন যে, বাড়ীর বাহির না হইয়া উহা পাহারা দেওয়াতেই আপনার কর্তব্য শেষ হইয়াছিল ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তাই বলুন। চট্টগ্রাম পুলিশের কতদূর কর্তব্যজ্ঞান আছে তাহা আমাদের জানা দরকার। আচ্ছা, আপনার বাড়ী হইতে কোতোয়ালী কতদূরে ?

উঃ—খুব নিকটেই।

প্রঃ—আপনার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য তথায় সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?

উঃ—আমি তাহাদের সাহায্য চাই নাই।

প্রঃ—আপনাদের গুপ্তচর বিভাগের কার্য যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, অস্ত্রাগার আক্রমণ দ্বারা তাহা বোঝা যায় না কি ?

উঃ—না।

অতঃপর কৌঁসুলী সাক্ষীকে একটি কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলেন—আপনি খানাতল্লাসী তালিকায় ইহাকে বোমা তৈয়ারী করিবার যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—কিন্তু আপনি শুনিয়া বোধহয় আশ্চর্য হইবেন যে, গণেশ ঘোষের পিতা তামাক রাখিবার জন্য এই বাক্সটি ব্যবহার করিতেন।

[বঙ্গবাণী : ২৪-১১-৩০]

চাঁদপুর গুলি বর্ষণের বিস্তৃত বিবরণ

২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে প্রথমেই সরকারী কৌঁসুলী আদালতকে জানান যে, এই

মামলার রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তী নামক দুইজন ফেরারী আসামীকে চাঁদপুরের নিকটবর্তী এক জায়গায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উক্ত আসামীদ্বয় চাঁদপুরের রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টারকে গুলি মারিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের নিকট রিভলবার বোমা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ঐ রিভলবারই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে খোয়া গিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই ঐ আসামীদ্বয় ফেরার অবস্থায় থাকে। এক্ষণে এই আসামী দুইজনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী এবং পুলিশ ইন্সপেক্টারকে হত্যার দরুন বিচারার্থ কুমিল্লা নেওয়া হইবে।

[বঙ্গবাণী : ৮-১১-৩০]

ফেণীতে গুলি মারার আরও নূতন সংবাদ

ইয়াকুব আলী পূর্বে ফেণী পুলিশ থানায় কনেষ্টবল রূপে চাকুরী করিত। ২২শে এপ্রিল রাত্রিতে ফেণী স্টেশনে গুলি দুর্ঘটনায় তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তজ্জন্য বর্তমানে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইলে সে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিয়া বলে যে, উক্ত আসামীই ফেণী ষ্টেশনে মলমূত্র ত্যাগ করিবার অছিলায় বাহিরে গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আনন্দবাবুকে দেখাইয়া বলে যে, সে তাহাকে এবং কনেষ্টবল মণীন্দ্র পালকে গুলি করিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংকে দেখাইয়া বলে যে, সেই প্রথম গুলি চালায়।

প্রেসিডেন্টের আপত্তি

আদালতের বারান্দায় যখন সনাক্তকরণ হইতেছিল এবং সাক্ষীর মন্তব্য প্রেসিডেন্ট লিখিয়া লইতেছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট জুনিয়ার কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত পুলিন দত্তকে বলেন যে, তিনি যাহা লিখিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত দত্তের তাহা দেখা উচিত নহে। শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, তিনি কিছুই দেখেন নাই, শুধু পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সনাক্তকরণ ব্যাপার শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু যখন সাক্ষীকে জেরা করিতে যাইবেন, তখন আসামীদের কাঠগড়া হইতে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিং তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। আদালতের অনুমতি নিয়া শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাদের নিকট যান। তখন প্রেসিডেন্ট ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ বলেন যে, তাঁহাদের কৌঁসুলীকে রীতিমত অপমান করা হইয়াছে এবং তাঁহারা কিছুতেই উহা সহ্য করিবেন না।

প্রেসিডেন্ট ঃ—আমার লেখা জুনিয়ার কৌঁসুলীকে উঁকি মারিয়া দেখিতে কিছুতেই আমি অনুমোদন করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত দত্ত ঃ—কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে, আমি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম মাত্র এবং হঠাৎ আমার চক্ষু লেখার উপর পড়িয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট ঃ—আচ্ছা, আমি এই উত্তরেই সন্তুষ্ট রহিলাম।

শ্রীযুক্ত বসু ঃ—আমার মনে হয়, সমগ্র বিষয়টি ভুলবশতঃই উদ্ভব হইয়াছে। (অনন্তবাবু ও গণেশবাবুর প্রতি) এ বিষয় নিয়া আর অধিক গণ্ডগোল করা সংগত নহে। মামলার কার্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল।

অতঃপর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী ভূতপূর্ব কনেষ্টবল মণীন্দ্র পালকে মিঃ জে. কে. ঘোষাল জেরা করেন।

প্রঃ—সনাক্তকরণের জন্য তুমি চট্টগ্রাম জেলে গিয়াছিলে?

উঃ—হ্যাঁ, ঐ সময় সেখানে ইন্সপেক্টারও ছিলেন।

প্রঃ—সেখানে কাহাকেও সনাক্ত করিয়াছিলে?

উঃ—না, আমি সনাক্ত করিতে পারি নাই। [বংগবাণী : ১৮-১২-৩০]

চট্টগ্রাম শহরময় ভীষণ চাঞ্চল্য

চট্টগ্রামে কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আদালত গৃহসমূহের নিকট ভূগর্ভ হইতে পুলিশ চারিটি বাক্স খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। ঐগুলি ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত মাটির নীচ দিয়া প্রায় ৫০ ফুট দূর পর্যন্ত গিয়াছিল। বাক্সগুলি ডিনামাইট পূর্ণ বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। ঐগুলি খোলা হয় নাই—শীলমোহর করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর এক স্থানে একটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ অনুরূপ তিনটি বাক্স পাইয়াছে। প্রত্যুষে নিবারণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি একটি টিন বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ধৃত হয়। উহার বাড়ী কুমিল্লায়। প্রকাশ, তাহারই এজাহারের ফলে নল পাড়ায় একটি বাড়ী খানাতল্লাস কালে অনুরূপ আরও তিনটি টিন পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে আদালতের বাড়ীসমূহের নিকট কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরও চারটি টিন পাওয়া যায়। ঐগুলির চারিদিকে ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রায় ৫০ ফুট পর্যন্ত গিয়াছিল।

টিনগুলি যখন ১৫ ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকাতল হইতে উত্তোলিত করা হয়, তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তথায় ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারকারী স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনারগণ পরে ঐ স্থান পরিদর্শন করেন।

[বংগবাণী : ৫-৬-৩০]

হিন্দু যুবকগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি

চট্টগ্রাম, ৮ই জুন। অদ্য অপরাহ্নে ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকদিগের উপর সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। উপরোক্ত বয়সের যুবকগণ এবং ছাত্রগণ সর্বদা লাল দীঘি ও নদীর তীরে অপরাহ্নে বেড়াইতে যান। তাহারা দ্রুতপদে রাত্রি ৭ ঘটিকার মধ্যে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে উপরোক্ত স্থান সমূহ ও রাস্তাঘাট হইতে হিন্দু ভদ্রলোকগণ চলিয়া যাওয়ায় শহর মরুভূমির ন্যায় দেখা যাইতেছে।

[বঙ্গবাণী : ৯-৬-৩১]

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

চট্টগ্রাম, ১লা অক্টোবর : নূতন স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে গত সোমবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। সোমবার আরম্ভ করিয়া মঙ্গলবারের জলযোগের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী উকিল রায় বাহাদুর রমণী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা হইতে আগত) তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করতঃ মামলার বিবরণ কমিশনারগণের সমক্ষে উপস্থিত করেন।

এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ না হইতেই কমিশনারগণ রায় প্রদাণ করিয়াছেন। মঙ্গলবার সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইবার পর প্রথম সরকারী সাক্ষী এস. ডি. ও. মিঃ রায় সাক্ষ্য দেন ও বলেন, তিনি নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেন আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে কি রকম চার্জ হইতে পারে সরকারী উকিল তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেসিডেণ্ট সকল আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। অতঃপর ৭ জন আসামী শ্রীঅর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, সুশীল সেন, প্রভাত দত্ত ও অনিল রক্ষিত উক্ত ধারায় আপনাদিগকে দোষী বলিয়া এবং অপর ৪জন হৃদয় দাস, চন্দ্রকুমার বসু, নিশি দে ও আশুতোষ দে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করে।

অতঃপর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ সেন (অবশ্য অন্য দুইজন কমিশনারের সম্মতিক্রমে) নিশি দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসুকে বেকসুর খালাস দেন ও অপর ৮ জনের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেনকে ৩ বৎসর, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মল্লিককে দুই বৎসর এবং অনিল রক্ষিত ও প্রভাত দত্তকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রেসিডেণ্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে কারাগারে বি শ্রেণীভুক্ত রাজবন্দীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এক্ষণে শুধু একজন আসামী হৃদয় দাসের বিরুদ্ধে এই স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মামলা চলিতেছে।

[বঙ্গবাণী : ৬-১০-৩১]

পুলিশ ইন্সপেক্টার হত্যার বিচার

চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী হরিপদ ভট্টাচার্যের বিচার গত সোমবার হইতে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ সুকুমার বসুর আদালতে আরম্ভ হইয়াছে। কোর্ট গৃহে ও বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। সরকার পক্ষে রায়বাহাদুর কামিনীকুমার দাশ ও আসামী পক্ষে এ্যাডভোকেট অন্নদাচরণ দত্ত, জ্ঞানদাচরণ দত্ত, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, রমাপ্রসন্ন সিংহ ও আরও কয়েকজন উপস্থিত হইতেছেন।

প্রথমে সরকারী সাক্ষী দারোগা সিদ্দিক দেওয়ান স্বচক্ষে খানবাহাদুরকে আসামী কর্তৃক গুলি করার ঘটনা ও তৎপর স্বহস্তে আসামীকে ধৃত করার ব্যাপার বর্ণনা করিলে আসামীর উকিল অন্নদাবাবু সাক্ষীকে প্রায় ২ দিন জেরা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে—আসামীর নিকট যে রিভলবার পাওয়া যায়, তাহা হইতেই যে গুলি করা হইয়াছিল, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন। অন্নদাবাবু এই ব্যক্তিকেও বহুক্ষণ ধরিয়া জেরা করিয়াছেন। এই চাঞ্চল্যকর মামলার খবর জানিবার জন্য শহরের লোকের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ নেলসন চট্টগ্রাম হাঙ্গামার তদন্তে ব্যাপৃত আছেন। এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহাদের অনেকেই, এমনকি মহকুমা হাকিম মিঃ রায় ও সিনিয়ার ডেপুটি মিঃ নন্দীও সাক্ষ্যে বলিয়াছেন,—হিন্দু দোকানপাট ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সময় পুলিশ নিশ্চেষ্ট ছিল। এমন কি থানার সামনেই মিঃ নন্দীর মাথায় জখম করা হয়। অথচ দোষী ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য পুলিশ অগ্রসর হয় নাই।

[বংগবাণী : ৬-১০-৩১]

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

সরকারী পক্ষের সওয়াল

চট্টগ্রাম, ৩০শে নভেম্বর :—গত দুই সপ্তাহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলিপুর হইতে আগত) সরকার পক্ষের সওয়াল করিতেছেন। তাহা এখনও চলিতেছে। আসামীরা কিভাবে ভূতপূর্ব রাজবন্দী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল (বর্তমান আসামীদের মধ্যে), অম্বিকা চক্রবর্তী, সূর্য সেন (পলাতক) ও নির্মল সেন (পলাতক) —এই ছয়জন ব্যক্তির নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক ভীতিপ্রদ ষড়যন্ত্রের দল গড়িয়া তোলে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া পরিশেষে ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) রাত্রে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের ও রেলওয়ে

অক্সিলিয়ারী সৈন্যের অস্ত্রাগার ঘর লুণ্ঠন করে ও প্রায় ৮জন (প্রহরী ও অন্যান্য) লোকের প্রাণ নাশ করে, টেলিফোন অফিসের তার প্রভৃতি অগ্নিতে বিনষ্ট করে, ধুম ও লাঙ্গলকোট ষ্টেশনে রেললাইন উৎপাটন করে, ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলে এবং তৎপরে ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশ ও মিলিটারী লুণ্ঠনকারীদের সন্ধানে ও গ্রেপ্তারে যাওয়ায়, তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে।

সেই রাত্রে আবার কয়েকজন ফেণী ষ্টেশনে ১ জন দারোগা ও ২ জন কনেষ্টবলকে গুলি করিয়া পলায়ন করে ও ৬ই মে রজনী যোগে কালার পুল অঞ্চলে ৬ জন সশস্ত্র আসামী পুলিশ ও গ্রামবাসী কর্তৃক তাড়িত হইয়া ৩ জন গ্রামবাসী ও ১ জন কনেষ্টবলকে হত্যা করে। এইসব যে এই আসামীদের দ্বারা গঠিত একই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য কার্য, তাহা ইতিমধ্যেই সরকারী উকিল প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তৎপর রায়বাহাদুর সাক্ষ্য আলোচনা করিয়া আরও বলিয়াছেন যে, ঘটনার পরদিন হইতে এই দলের কাহাকেও শহরে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, এবং যে মাত্র ১ জনকে পাওয়া গেল, তাহার সর্বাঙ্গ অগ্নিতে পুড়িয়া যাওয়ায় জখমদৃষ্টে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ লাইনে যখন অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন সেখানেই এই জখম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে মৃত্যুর পূর্বে যে বিবৃতি দিয়াছে তাহাতে পূর্বরাত্রে তাহাদের দলের কার্যাবলী বিষয়ে কিছু বিবরণ প্রকাশ পায়।

৫ জন আসামীর স্বীকারোক্তি কি ভাবে উক্ত ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে, তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে রায়বাহাদুর সওয়াল করিতেছেন।

[বঙ্গবাণী : ৩-১২-৩১]

আসামী পক্ষের সওয়াল

চট্টগ্রাম, ১১ই ডিসেম্বর :—অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী উঠিলে আসামী পক্ষের এ্যাডভোকেট মিঃ সন্তোষকুমার বসু তাঁহার সওয়ালে বলেন যে, হত্যার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অস্ত্রাগারে হানা দিবার সময় যে দুইখানি মোটরগাড়ী জোর করিয়া লওয়া হইয়াছিল, আক্রমণকারীদের যদি মতলব থাকিত, তাহারা সেই ড্রাইভারদ্বয়কে গুলি করিয়া হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু একজন ড্রাইভারকে হাত পা বাঁধিয়া একটা ঘরের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং অপর ব্যক্তিকে ক্লোরফর্ম করিয়া কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

টেলিগ্রাফ অফিসে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তথাকার কর্মচারীগণকেও ঐরূপ করা হইয়াছিল। উক্ত কর্মচারীদের সাক্ষ্য বিপজ্জনক হইবে—ইহা জানিয়াও আক্রমণকারীরা তাহাদের হত্যা করে নাই।

হিমাংশু সেনকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন আগুনে দগ্ধ হইয়া জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। সে নিজেকে অপরাপরের সহিত জড়িত করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করে। মিঃ বসু বলেন, তাহার বিবৃতি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

সহায়রাম দাস ও ফকির সেনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে মিঃ বসু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্ররোচনায় ফেলিয়া এবং মুক্তির লোভ দেখাইয়া ভীষণ আতংকের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের নিকট হইতে উহা আদায় করা হইয়াছিল। তাহারা অব্যবহিত কাল পরেই তাহাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। যাহাতে তাহারা উহা না করে, সেজন্য মহকুমা হাকিম যথেষ্ট উদ্বেগ দেখাইয়াছিলেন।

ফকির সেনের প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তির উপরই ফরিয়াদী পক্ষ তাহাদের সমগ্র মামলা দাঁড় করাইয়াছেন। ফকির সেনকে কয়েক দফায় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রের ডাকবাংলোয় লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পিতা মাতাকেও আনিয়া যাহাতে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার না করে সে চেষ্টা করা হয়। মিঃ বসু এই সম্পর্কে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণের উপর তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে, এইসব প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন যে, পাহাড়ের নিকট চট্টগ্রাম হইতে সাজোয়া গাড়িতে প্রেরিত সেনাদলের সংগে আসামীদের লড়াই হয়। ফকির সেনকে তথায় লইয়া গেলে সে জঙ্গলের ভিতর পতিত একটি রিভলবার তুলিয়া লইয়া গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। মিঃ বসু বলেন, যদি সত্য সত্যই ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা স্বীকারোক্তি পরীক্ষা করিবার চোট সহ্য করা ফকিরের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলিয়াছেন যে, জেলের ভিতরে আসামীদিগকে সনাক্ত করিবার সময় ফকির সেনকে একটি বোরখায় ঢাকিয়া আসামীদিগকে সনাক্ত করিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সময় ফকির হঠাৎ বোরখার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলে—"এই যে আমি তোমাদেরই ভীরু বন্ধু। তোমাদের সকলকে ফাঁসি দিতে যাইতেছি।" মিঃ বসু বলেন, "ভীরু"—এই কথাটি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাহার নিকট স্বীকারোক্তি পাইবার জন্য তাহাকে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। আসলে পুলিশই তাহাকে মূল কাহিনীর তথ্য জোগাইয়াছিল।

আসামী সুবোধ বিশ্বাস সম্বন্ধে কৌসুলী বলেন, লুণ্ঠনের পর দিবস গণেশ ঘোষের বাড়ীতে যখন খানাতল্লাসী হয়, তখন ঐ বাড়ীর নিকটেই

রাস্তায় একশিশি ঔষধ হস্তে সুবোধকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুবোধ তখন মাত্র জ্বর এবং বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে সারিয়া উঠিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী এক ডিসপেন্সারীতে ঔষধ ক্রয় করিতে যায়। পুলিশের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার অভিযোগে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে। গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা ইহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

লালমোহন সেনের নাম অনুসন্ধানকারী পুলিশ কর্মচারীদের তালিকায় দৃষ্ট হয় নাই বা যাহাদিগকে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকায় তাহার নাম ছিল না। সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে, লালমোহন কলিকাতায় পুলিশ কর্মচারীর নিকট মিথ্যা নামে পরিচয় দিয়াছিল। উহা তাহার পক্ষে ঠিকই হইয়াছিল। কারণ, সে কোনরূপ দোষ না করিয়া থাকিলেও পুলিশের চর সর্বদা তাহাকে অনুসরণ করিত ও চোখে চোখে রাখিত।

তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ যে, স্বীয় স্বীকারোক্তি সে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মক্কেলগণকে শুধু সন্দেহের বশে মামলায় জড়িত করা হইয়াছে, কিন্তু অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বা ষড়যন্ত্রের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বিদ্রোহীদের তালিকা ও প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া সমালোচনা করেন এবং তাঁহার মক্কেলদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

পূর্ণ এগার দিন ধরিয়া শ্রীযুক্ত বসু আসামীদের পক্ষে বক্তৃতা করিয়া অদ্য তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু অদ্য রাত্রে কলিকাতায় রওনা হইবেন। আর ছয়জন আসামীর পক্ষে কৌঁসুলী কামিনীকান্ত ঘোষাল অদ্য তাঁহার সওয়াল জবাব আরম্ভ করেন। [বঙ্গবাণী : ২২-১২-৩১]

শ্রীযুক্ত শাসমলের সওয়াল আরম্ভ

চট্টগ্রাম, ১১ই জানুয়ারী—প্রধান আসামী অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের পক্ষে কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত শাসমল সওয়াল আরম্ভ করেন। আসামী ননী দেবের কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার করার পর শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীকে তাহার কৌঁসুলী নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত শাসমল তাঁহার বক্তৃতার উদ্বোধনে বলেন যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মামলার সাক্ষ্য তিনি গোড়া হইতে না শুনিতে পারায় তাহাকে খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সরকার পক্ষ হিমাংশুর বিবৃতিকে মৃত্যুকালীন ঘোষণা রূপে দাখিল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি হিমাংশুর বিবৃতির ত্রুটিগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলেন, ঐ বিবৃতি স্বেচ্ছাপ্রদত্ত নহে। হিমাংশুর সর্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় সে অত্যন্ত শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। ঐ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায়

অনন্ত সিং প্রভৃতি বারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজনের সশ্রম কারাদণ্ড : পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত।

চট্টগ্রাম, ১লা মার্চ : সুদীর্ঘ ১৯ মাসকাল বিচার চলিবার পর আজ চট্টগ্রামের লোমহর্ষক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবনিকাপাত হইল। বিচারকগণ নিম্নলিখিত ১২ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন : (১) অনন্ত সিং (২) গণেশ ঘোষ (৩) লোকনাথ বল (৪) আনন্দ গুপ্ত (৫) ফণী নন্দী (৬) সুবোধ চৌধুরী (৭) সহায়রাম দাশ (৮) ফকীর সেন (৯) লালমোহন সেন (১০) সুখেন্দু দস্তিদার (১১) সুবোধ রায় এবং (১২) রণধীর দাশগুপ্ত।

আসামী অনিল দাশকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং (২) নন্দলাল সিংকে দুই বৎসর সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ফ্রী প্রেসের বিবরণে প্রকাশ, আসামী অনিল দাশকে তিন বৎসর বোরষ্টাল স্কুলে আটক রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। (১) নিতাই ঘোষ (২) শান্তি নাগ (৩) অশ্বিনী চৌধুরী (৪) ননী দেব (৫) মলিন ঘোষ (৬) শ্রীপতি চৌধুরী (৭) মধুসূদন গুহ (৮) সুবোধ বিশ্বাস (৯) সুবোধ মিত্র (১০) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী (১১) সুকুমার ভৌমিক (১২) সুবোধ বল (১৩) হেরম্বলাল বল (১৪) বিজয় সেন (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং (১৬) বীরেন্দ্র দস্তিদার। কিন্তু মুক্তি পাইবার পর ইহাদিগকে পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দণ্ডিত আসামীগণকে দ্বিপ্রহরের সময় চট্টগ্রাম হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিচারকগণ সমস্ত আসামীকেই জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রায় ৪ মাস কাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে তদন্ত চলে। ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিম খাঁ ই প্রধানতঃ এই তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি পরিশেষে ৫৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে (মৃত ১৯ জন বাদে) চার্জ সিট দাখিল করেন। তন্মধ্যে ৩২ জন ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয় এবং ২৪ জন ফেরার হয়।

১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসে স্যার চার্লস টেগার্ট কলিকাতার একদল পুলিশ লইয়া চন্দননগরে ৪ জন ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তন্মধ্যে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে বিচারার্থ স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট পাঠান হয়। (অপর আসামী জীবন

ঘোষাল চন্দননগরেই মারা যান) আসামীদের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) আবার নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারকালে অন্যান্য ফেরারী আসামীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যা সম্পর্কে চাঁদপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। এই হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণের ফাঁসী এবং কালীপদর যাবজ্জীন দীপান্তর দণ্ড হয়।

এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আরও একটি শাখা গজায়। চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডে এই সম্পর্কে আসামী হরিপদ ভট্টাচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। অন্যান্য ফেরারীদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীকে এবং সম্প্রতি আরও একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের পরে বিচার হইবে। ইহাদের ছাড়া এখন আরও ১৭ জন আসামী ফেরার আছে। ইহাদের ধরিবার জন্য ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

মোট ৩৫ জন আসামীকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই জনের (অর্ধেন্দু গুহ এবং অনিল রক্ষিত) বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। তাহাদিগকে পরে এখানে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত করা হয়।

আরও তিনজন আসামী— রঞ্জন লাল সেন, গোলাপ লাল সিং (উভয়েই উকিল) এবং যোগেন্দ্র—ওরফে মনা গুপ্তকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই মামলায় ৫১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। ইহাদের সাক্ষ্য প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠার টাইপকরা কাগজে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তদন্তকারী ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিম খাঁর জবানবন্দীতেই প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা গিয়াছে। উক্ত ইন্সপেক্টার প্রায় ৪ মাসকাল জবানবন্দী দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া সরকার পক্ষ প্রায় ১২০০ একজিবিট দাখিল করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, মাস্কেট, বেআইনী-ভাবে আমদানী করা অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-গুলি-বারুদ, একটি লুইস বন্দুক, ৪ খানা মোটর গাড়ী, খাকি পোষাক, জলপূর্ণ বোতল ও অন্যান্য নানা প্রকার জিনিস, বিপ্লবী ইস্তাহার, বিপ্লবী সংগ্রহ তালিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জিনিস কতক বিভিন্ন স্থানে এবং কতক অন্যতম প্রধান আসামী গণেশ ঘোষের গৃহে পাওয়া যায়।

কমিশনারগণ বলিয়াছেন: ফকির সেন, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাশগুপ্ত সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অল্প বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত স্কুলের ছাত্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন,

কিন্তু আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা তাঁহাদের কর্তব্য।

[বঙ্গবাণী : ২-৩-৩২]

'প্রশ্ন নয়কো পারা না পারার
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বার ভাঙা আজ পণ
এতদিন ধরে শুনেছি কেবল শিকলের ঝন্‌ঝন্‌।'
—কবি সুকান্ত

শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে বন্দীরা সবাই চলে গেলেন লৌহ কপাটের অন্তরালে। তা বলে মাষ্টারদা কিন্তু থেমে গেলেন না মল্লিকা। পুরনো সহকর্মীদের মধ্যে প্রায় সবাই তখন কারারুদ্ধ। আঁকড়ে ধরার মত কেউ নেই কাছে কিনারে। আছে শুধু সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নির্মল সেন, প্রীতিলতা আর গুটিকয়েক বিশ্বস্ত কিশোর মাত্র। তবু তাঁরও সেই একই কথা—'দ্বার ভাঙা আজ পণ।'

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন অনুষ্ঠিত হল ধলঘাট সংঘর্ষ।

এবারও মাষ্টারদা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হলেন প্রীতিলতাকে নিয়ে। হারিয়ে গেলেন অপূর্ব সেন এবং যুব বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছায়াসঙ্গী নির্মল সেন। তবে তার আগে চরম শাস্তি দিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ক্যামেরনকে। এক গুলিতেই শেষ। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

সেনাদলের ক্যাপ্টেন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত

'দার্জিলিং, ১৪ই জুন—এইখানে এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ও ২ জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট ২টি রিভলবার ও গুলি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।'

[আনন্দবাজার : ১৫-৬-৩২]

আহত ব্রিটিশ সিংহ তখন মরিয়া। আসল নায়ক সূর্য সেন কোথায়। তাঁকে যে চাইই। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা :

সূর্য সেনকে ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্যে বিপ্লবীদের নেতা বলিয়া কথিত সূর্য সেনকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে বা এমন সংবাদ

দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ১৩ই জুন তারিখ পটিয়ার বিপ্লবীদের সহিত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হইয়াছে, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পরিচালক।'

[আনন্দবাজার : ৩-৭-৩২]

দুশ্চিন্তা মাস্টারদার স্নেহধন্যা প্রীতিলতার জন্যও কিছু কম ছিল না। এ মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। সূর্য সেনের নির্দেশে কোথায় যে সে আত্মগোপন করে রয়েছে কে জানে। ওকে বাইরে রাখাটা মোটেই নিরাপদ নয়। যে করে হোক, ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।

চট্টগ্রামের পলাতকা

ধরিবার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা

'চট্টগ্রাম ১২ই জুলাই—চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।'

[আনন্দবাজার : ১৩-৭-৩২]

২৪শে সেপ্টেম্বর আঘাত হানলেন অগ্নিযুগের বীরাঙ্গনা সেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে শোনাচ্ছি।

বোমা, রিভলবার ও রাইফেল

প্রীতি সম্মেলনে ইউরোপীয়ানদিগকে আক্রমণ

'চট্টগ্রাম, ২৫শে সেপ্টেম্বর—গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিকভাবে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিত একজন নারীও ছিল।

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধা ইউরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টার ম্যাকডোনাল্ড, সার্জেন্ট উইলিস এবং অপর ছয়জন ইউরোপীয়ান আহত হন।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোষাকে সজ্জিত ২০ বৎসর বয়স্কা এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ক্লাব হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিল। ইহার বক্ষস্থলে গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার বি. এ. বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদারের

কন্যা। তাঁহার পকেটে রিভলবার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।' [আনন্দবাজার ২৬-৯-৩২]

প্রাণাধিক সহকর্মীদের বিয়োগব্যথা যে সেদিন মাস্টারদার মনে কি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সে সব কিছুই তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন 'বিজয়া' নামে একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন একান্ত স্নেহের পাত্রী প্রীতিলতার আত্মবিসর্জনের ঠিক পনেরো দিন পরে। সেদিন ছিল বিজয়া।

'আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে! কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ—এবারকার বিজয়া যেন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান!

জীবনে যা দেখিনি, এমন কত অভিনব জিনিস নিয়েই বিজয়া এল আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এল।

গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব, অভূতপূর্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল।

আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনেও পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য—একান্ত দুর্ভাগ্য যে, এমন প্রাণমাতানো আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এল। এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম—আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে।

আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করেনি, একটু সংকোচ করেনি। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে—তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে।

নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন,

রামকৃষ্ণ, ভোলা সবার কথাই আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই না হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তার সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি —কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে?

মা, আনন্দময়ী মা আমার, আজ তোমার বিসর্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি?

পনের বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভালমন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম, আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি।

দুর্বলতা কি আসতে চায় নি? কত রকমের দুর্বলতা আসতে চেয়েছে কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়িনি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি, দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক।

এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশী—সব দেশেই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসেনি।

মা, তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙে দিও, আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি, তাহলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে শক্তিমান করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন দুর্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোনদিন এক চুলও না সরি।

আমি যেন বড় নিষ্ঠুর ছিলাম। কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে।

হয়তো তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙা ক্রন্দন, মর্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন। কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির

হয়ে উঠেছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তার কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে।

বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! এসব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে।

আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি?

যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি এই আশায় যে, এ সকল পবিত্র শ্মশানস্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে।

যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 'তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না', তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল।

সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে।

সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজ বিজয়ার দিনে, সে দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না। চাপতে গেলে উঠে দুকূল ছাপিয়ে।

সে যে আমার আনন্দের উৎস—নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল—সুন্দর পবিত্র

মহান ছিল। তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি, আর কোন মানুষের মধ্যে আমি তত গুণ দেখিনি।

তার অন্তরের সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল ; তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি, তার সরলতা বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না।

সর্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস সে যেভাবে বজায় রেখেছিল, তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়।

এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত কিছু উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম। প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাইনি।

এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সেদিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে। যে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে হারাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও—যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে আমি গৌরব অনুভব করি।

তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি। আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষ ত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস না।

তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবৎভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি ; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি।

এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনদিন ইতস্ততঃ

করিনি, মনে করতাম, তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিসও নাই।

শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস, সেখানে থেকেই আমার সব দোষ ত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা।

শেষ মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস। তোর দাদা যেন শান্তি পায়, তার ব্যবস্থা তুই করে দে।

তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষ ত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমার স্নেহের সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি।

আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ বিসম্বাদ, দোষ ত্রুটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে।

এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান্ ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদান তোকে আরো সুন্দর, আরো মহনীয় করে তুলেছে।

বরদায়ী মা আমার—আমায় আশীর্বাদ কর, যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ দেখেছি, তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।'

[চট্টগ্রাম : বিপ্লবের বহ্নিশিখা : শচীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত]

সহকর্মীদের কি ভালই না বাসতেন মাষ্টারদা। বস্তুত তিনি ছিলেন তাদের কাছে একাধারে বন্ধু ও স্নেহপ্রবণ পিতা। সহকর্মীরাও ছিলেন ঠিক তেমনিই। আসুক আঘাত, আসুক মৃত্যু, কোন দুঃখ নেই। শুধু শেষ বিদায়ের আগে মাষ্টারদাকে একবার দেখে যেতে চাই। একটিবার প্রণাম করে যেতে চাই।

এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা থেকে অন্যতম সহকর্মী শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল দত্তের লেখনী থেকে কিছুটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

"ইংরেজী ১৯৩০ সন।

আষাঢ় মাসের একটি সন্ধ্যা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

গুয়াতলী গ্রামের ৺রসিক চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীর দোতলার একটি কামরায় আমি বসে আছি। ঐ বাড়ীতে আমি প্রাইভেট টিউটর এবং পটীয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আমি উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করছি, কখন বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। বিকেলে একটি ছেলে এসে বলে গেছে, রাত ঠিক বারোটার সময় ফুটুদার (৺তারকেশ্বর দস্তিদার) সঙ্গে দেখা করতে হবে। স্থান, তিন মাইল দূরে চক্রশালা গ্রামের এক দীঘির পাড়ের বটতলা।

এক সময় নীচের শেষ আলো নিভে গেল। রাত তখন প্রায় ন'টা। আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার জন্য।

অন্ধকার রাত্রি। টর্চ ও ছাতাটি পাশেই রয়েছে। মন দুশ্চিন্তায় ভরা। রিভলভারের গুলিতে আহত বীরেন্দ্রকে (৺বীরেন্দ্র দে) চক্রশালা গ্রামের এক বাড়ীতে এনে রাখা হয়েছে। ফুটুদা তাকে দেখাশোনা করেন। চিকিৎসার তেমন সুব্যবস্থা নেই। তাই ফুটুদার সঙ্গে দেখা করার গুরুত্বটুকু মনকে চঞ্চল করে তুলেছে।

ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। দশটা বাজতেই ল্যাম্প নিভিয়ে দিলাম। তারপর জানালার বাঁশের বেড়াটি একপাশে সরিয়ে দিয়ে লম্বা ও শক্ত সুতা দিয়ে বাঁধা টর্চ ও ছাতাটি আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে দিলাম। তারপর ঘরের চালার বাঁশের খুঁটিটি ডানহাতে জড়িয়ে ধরে বামহাতে জানালার বেড়াটি আবার ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

জলকাদায় ভর্তি গ্রামের পথ ও মাঠের কাদা ভেঙ্গে যখন নির্দিষ্ট বটতলায় এলাম, তখন রাত সাড়ে এগারটা। বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়ছে। অন্ধকার নিঝুম রাত। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আবছা দেখা গেল বাঁশতলা দিয়ে কে একজন এগিয়ে আসছে। আমি আশায় উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে নিচ্ছি ফুটুদা না হয়ে অন্য লোক হলে কী জবাব দেব। মূর্তিটি আরো এগিয়ে এল।

হ্যাঁ ছাতা মাথায় ফুটুদাই এসেছেন। বললেন, "এসেছ ভাই? কোন ভয়-টয় পাওনি তো?"

আমি হেসে বললুম, "ভয় পাব কেন?"

তারপর যেতে যেতে ফুটুদার কাছে শুনলুম, বীরেন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে। আর যখন জ্ঞান থাকে, তখনই মাষ্টারদাকে একবার দেখতে চায়।

জালালাবাদ যুদ্ধের পর বিপ্লবীরা গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিয়েছেন। এক রাত্রে বীরেন্দ্রের স্বগ্রাম সুচিয়ায় একটি ছেলেকে রিভলভারের

ব্যবহার দেখাবার সময় ঐ ছেলেটির হাত থেকে হঠাৎ গুলি ছুটে যায়। 'ওয়েবলি' রিভলবারের বেশ বড় সীসার বুলেটটি বীরেন্দ্রের ডান উরু ভেদ করে চলে যায় মাটির নীচে। চক্ষের পলকে এই ঘটনা ঘটে যায়।

একে তো আত্মগোপন অবস্থা, তার উপর এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা একটি অজ পাড়াগাঁয়ে। ভাটিখাইন গ্রামের পরেশ দাস ছিল বীরেন্দ্রের সংগে।

পরদিন পরেশ একটি পাল্কী করে তাকে নিয়ে আসে চক্রশালা গ্রামের এই আশ্রয়ে। সে সময় নির্মলদা, ফুটুদা ও আরো দু'জন বিপ্লবী (এখন নাম ভুলে গেছি) আত্মগোপন করে ছিলেন ভাটিখাইন গ্রামের মহিমচন্দ্র দাসের পরিত্যক্ত বাড়ীর দোতলার একটি অন্ধকার ঘরে। তাঁদের তত্ত্বাবধান করতেন পাশের বাড়ীর সুধীন দাশ, গয়োতলী গ্রামের জ্যোৎস্না চৌধুরী ও আমি। পরেশের কাছে খবর পেয়ে নির্মলদা ফুটুদাকে পাঠিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকে সেবাশুশ্রূষা করতে।

কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম। দেখলাম বাড়ীর মালিক দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছেন। এই বাড়ীর মালিকের কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট যত্ন ও সাহায্য পেয়েছিলাম।

ঘরের ভিতর একটি ল্যাম্প আলো কমিয়ে একপাশে রাখা হয়েছে। মেঝের উপর পাটি পেতে একটি শয্যার উপরে বীরেন্দ্রকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমরা খুব সাবধানের সহিত ঢুকছিলাম যাতে তার তন্দ্রা না ভাংগে।

তবুও সে টের পেল। চাপা সুরে বলে উঠল, "সোনা ভাই, আপনি এসেছেন? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?"

ফুটুদা জবাব দিলেন, "এই যে ভাই, আমি "প্রফেসার"কে আনতে গিয়েছিলাম। 'প্রফেসার" তোমাকে দেখতে এসেছে।"

"প্রফেসার" নির্মলদার দেওয়া আমার ছদ্মনাম। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার প্রয়োজনে দলের বহু ছেলের এরকম বিভিন্ন ছদ্মনাম ছিল।

আমি বীরেন্দ্রের পাশে গিয়ে বসতেই সে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একেবারে বুকের উপর নিয়ে গেল। অসহ্য তার যন্ত্রণা। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে গেছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। উরুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডান পাটা ফুলে কলাগাছের মত মোটা হয়ে গেছে। এপাশ ওপাশ ফিরতে পারে না। দিনরাত শুধু চিৎ হয়ে ছাড়া অন্যভাবে শুতে পারে না। পায়খানা প্রস্রাবের সময় কী ভীষণ কষ্টই না তাকে ভোগ করতে হয়।

আমি তাড়াতাড়ি তার বুকের উপর থেকে উঠে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলুম।

"ভাই, আমি আর বাঁচব না।' আমার ডানহাতটি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "মাষ্টারদাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়, ভাই, আমাকে

একটিবার মাষ্টারদাকে এনে দেখাতে পার ?"

আমি ফটুদার মুখের দিকে চাইলাম। তিনি বললেন, "হ্যাঁ আজ দু' দিন পর্যন্ত সে শুধু মাষ্টারদাকে দেখতে চাইছে। ঐজন্যই তোমাকে আজ ডেকে এনেছি।"

আমি তখন তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "কেন তুমি মরবে ভাই ? তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?"

সে আস্তে আস্তে বলল, "না ভাই, মরতে আমার একটুও ভয় নেই।" তারপর আমার মাথাটি তার কানের কাছে নিয়ে চুপি চুপি বলল "ভাই, সোনা ভাই আমার রিভলভারটি লুকিয়ে রেখেছেন। কত অনুনয় করে বলছি, কিছুতেই দিচ্ছেন না। ভাই, তুমি আমার বুকে একটি গুলি করতে পারবে ? লক্ষ্মী ভাইটি, একটি গুলি করে দাও ভাই।"

আমার দু'চোখ ফেটে কান্না এসে গেল। চোখ মুছে বললুম, "ছি, ছি ভাই, ও কি কথা ? তোমার এ যন্ত্রণা শিগ্‌গির কমে যাবে। তুমি নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবে। আর যদি সত্যিই তোমাকে সারিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমিই তোমার বুকে গুলি করে তোমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করে দেবো। এত অধৈর্য হয়ো না ভাই, বিপ্লবীর মনোবল বজায় রাখতে চেষ্টা কর। আমি নিশ্চয় মাষ্টারদাকে এনে তোমাকে দেখাব।

মাষ্টারদাকে দেখলে তোমার কষ্ট অর্ধেক কমে যাবে। তিনি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তোমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে। তুমি অত উতলা হয়ো না ভাই।"

"আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর মাষ্টারদাকে আমাকে দেখাবে।" বলেই আমার একটি হাত তার বুকের উপর তুলে নিল।

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভাই, আমি নিশ্চয় মাষ্টারদাকে এনে তোমাকে দেখাব। তুমি আত্মহারা হয়ো না ভাই। ধৈর্য ধর। আগামীকাল রাত্রেই তুমি মাষ্টারদাকে দেখতে পাবে। এখন একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর। অনেকক্ষণ কথা বলেছ। বেশী কথা বললে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাবে।"

তখন সে একটু শান্ত হল। সত্যিই সে খুবই ক্লান্ত হয়েছিল। মাথাটি একপাশে কাৎ করে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল।

তারপর ফটুদা আমাকে নিয়ে বারান্দায় এলেন। আমি বললাম, "বীরেন তো বাঁচবে বলে মনে হয় না।"

ফটুদা বললেন, "আমারও সে ভয় হচ্ছে। ক্ষতটি সেপটিক হয়ে গেছে অথচ ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তুমি কাল সকালেই শ্রীপুর গিয়ে খবর নেবে মাষ্টারদা কোথায় আছেন। তারপর তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে সব কথা বলে একবার সঙ্গে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। বর্তমান অবস্থায়

তাঁর উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজন। তুমি আর দেরী করো না। রাত দুটো বেজে গেছে।"

ফুটুদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আবার পথে নামলাম। বৃষ্টি তখন থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। আষাঢ়ে বৃষ্টির ক্ষণেক বিরতি মাত্র।

নির্মলদাকে তাঁদের খবরটা দেওয়া প্রয়োজন। তাই, আবার সেই জল কাদা আর মাঠ পেরিয়ে ভাটিখাইন গ্রামে নির্মলদাদের আশ্রয়স্থলে যখন পোঁছুলাম, তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

বাড়ীর সীমানায় এসে টর্চ জ্বালানো বন্ধ করে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ঘরের সিঁড়ির গোড়ায় এলুম। কেউ কোথাও জেগে নেই। ঝিঁঝিঁর একটানা সুর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

জীর্ণ পুরানো বাড়ী। সিঁড়িতে কোন রেলিং নেই। অন্ধকারে দেওয়াল ধরে ধরে কোন রকমে দোতলায় উঠে দরজায় মৃদু মৃদু টোকা দিলুম। প্রায় দু' মিনিট কেটে গেল। ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না। আবার একটু জোরে টোকা দিয়ে চাপা স্বরে উচ্চারণ করলাম, "প্রফেসার।"

অমনি দরজা খুলে গেল। আমি ভিতরে প্রবেশ করতেই আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নির্মলদাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেলেন, "খবর কী।"

আমি বীরেনের সব অবস্থা তাঁকে বললুম এবং ফুটুদা যে মাষ্টারদাকে নিয়ে আসতে বলেছেন তাও বললুম। তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ হল, কীভাবে মাষ্টারদাকে নিয়ে আসতে হবে।

গুয়াতলী থেকে শ্রীপুর গ্রাম প্রায় বার মাইল পথ। এই পথ আমাকে হেঁটেই যেতে হবে।

ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে আটটা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। স্থানে স্থানে বেশ কর্দমময়। একটু জোরে পা চালালে পিছলে পড়ার ভয়।

এই দীর্ঘ পথ হেঁটে কাপড় জামায় কাদা মেখে শ্রীপুরে মণিদার (মণীন্দ্র মজুমদার) বাড়ী যখন পেঁছিলাম, তখন দুপুর একটা বেজে গেছে।

মণিদা বাড়ীতেই ছিলেন। বাড়ীতে তাকে থাকতেই হত, কারণ ঐ বাড়ীটাই ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রস্থল এবং মণিদার মাধ্যমেই সমস্ত রকম খবরের আদান-প্রদান হত। আর খাওয়ার জন্য কোন চিন্তাই ছিল না। খাবার মণিদার বাড়ীতে সারাদিনই যেন তৈরী হয়ে থাকত। দূরদূরান্তর থেকে বিপ্লবীরা এসে ঐ বাড়ীতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর করে কাজ সেরে আবার স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলে চলে যেত।

এরকম একটা আশ্রয়স্থল পৃথিবীর কোন বিপ্লবীরা কোথাও পেয়েছে কিনা সন্দেহ। মণিদার পিতা-মাতা, কাকা-কাকীমা থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর কাদামাটি খড়কুটোগুলো পর্যন্ত যেন বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক।

আমার কাছে সমস্ত শুনে মণিদা বললেন, "তুমি খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি মাস্টারদার কাছে খবর পাঠাচ্ছি।"

বিকেল পাঁচটার সময় মাস্টারদার কাছ থেকে খবর এল। মাস্টারদা তখন ছিলেন কর্ণফুলী নদীর উত্তর পারে। কোয়েপাড়া গ্রামের এক বাড়ীতে।

একটু অন্ধকার হতেই মণিদা আমাকে নিয়ে নদীর পারে গেলেন। একটি সাম্পানে করে নদী পার হলাম। নদীর পার থেকে অল্প দূরেই মাস্টারদার আশ্রয়স্থল।

পায়ে ধরে প্রণাম করতেই মাস্টারদা আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বীরেন্দ্রের সব খবর আমার কাছ থেকে শুনলেন। নির্মলদা ও সকলের খবর নিলেন। তিনি তৈরী হয়েই ছিলেন। তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলে তিনি মণিদাকে একটু আড়ালে নিয়ে কী সব নির্দেশ দিলেন।

তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা যখন নদীর পারে এলাম, তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজেছে। সাম্পান মণিদা ঠিক করেই রেখেছিলেন। সাম্পানে একটিও কথাবার্তা হল না। নীরবে নদী পার হয়ে এলাম।

এপারে এসে কোন্ ঘাটে নেমেছিলাম এখন ঠিক মনে নেই। পটীয়া হতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তাটি উত্তরমুখী ধলঘাট, সারোয়াতলী, কানুনগো পাড়া হয়ে শ্রীপুরে হরচন্দ্র মুনসেফের ঘাট (অধুনালুপ্ত) পর্যন্ত গিয়েছে, ঐ রাস্তা ধরে আমি ও মাস্টারদা যাত্রা শুরু করলুম। আমি আগে মাস্টারদা পিছনে।

একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। টর্চ হাতে আছে, কিন্তু পারতপক্ষে জ্বালাচ্ছিনে। যতটুকু দ্রুত হাঁটা সম্ভব, হাঁটতে চেষ্টা করছি। কদাচিৎ দু' একটা কথাবার্তা হচ্ছে। বর্ষার অন্ধকার রাত্রি। পথ একেবারে নির্জন।

সারোয়াতলী কালাইয়া হাটের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আমরা ছাতা মাথায় দিলাম। দোকান তখনও খোলা ছিল। কিন্তু আমাদের কেউ লক্ষ্য করল না।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরেই আমরা চলছিলাম। ধলঘাট ও ডেঙ্গাপাড়া গ্রাম পেরিয়ে খানমোহনা গ্রামে এসে আমাদের রাস্তা পরিবর্তন করতে হল। কারণ, এ রাস্তা ধরে গেলে আমাদের যেতে হবে পটীয়া থানার সামনে দিয়ে।

রাস্তার ঠিক পাশেই থানা। তাই গ্রাম্য সরু রাস্তা ধরে আমরা কেলিশহর গ্রামের দিকে চললাম। ভট্টাচার্যের হাটে এসে মাঠে নেমে আলের পথ ধরে চলতে লাগলাম দক্ষিণদিকে।

আউশ ধান উঠে গেছে। খালি মাঠ জলে ভর্তি।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পূর্বদিকে পাহাড়ের সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত। পশ্চিমে ছায়াঘেরা ঘুমন্ত গ্রাম। মাঝে মাঝে দূর হতে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।

নিস্তব্ধ প্রকৃতির স্তব্ধতা ভংগ করে মাঠের জলকাদা ভেংগে চলছি দুটি অসমবয়সী মানব সন্তান। রাত তখন এগারোটা। মাষ্টারদা আগে, আমি পিছনে। শ্রান্তিতে পা দুটি ভেংগে পড়ছে। সামনে এগুতে চাইছে না।

আলের একটি ভাঙা স্থান মাষ্টারদা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেলেন। আমিও লাফ দিলাম। ওপাশে পড়তেই বাম পাটা পিছলে গেল। 'মাগো' বলে আমি আলের উপর বসে পড়লুম। বাম হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে।

মাষ্টারদা তাড়াতাড়ি আমাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চোট লেগেছে?"

আমি বাম হাঁটু দেখিয়ে দিলাম। দু' হাতে জল নিয়ে মাষ্টারদা আমার হাঁটুটি তিন-চার বার ভিজিয়ে দিলেন। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। মাষ্টারদা বললেন, "আমার গায়ে ভার রেখে দাঁড়া।" উপুড় হয়ে বসে বাম পা'টা মালিশ করে দিতে লাগলেন; আমি তাঁর কাঁধের উপর দু' হাত রেখে উপুড় হয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল। আমি একটু সুস্থ বোধ করলাম।

মাষ্টারদা জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁটতে পারবি? নাকি কোলে করে নিয়ে যাব?"

আমি বললাম, "না, না, না, আমি হাঁটতে পারব। আপনি আগে আগে যান।"

এ-ই আমার মাষ্টারদা। তাঁর স্নেহ ও আদরযত্ন আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি যদি সেইদিন হাঁটতে না পারতাম, তাহলে তিনি আরো দুই মাইল পথ আমাকে কোলে করেই নিয়ে যেতেন। তাঁর এই যত্ন ও সেবা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে।

হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা, পা ফেলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যতই দেরী হচ্ছে, ততই দুশ্চিন্তায় মন ভরে উঠছে। আশ্রয়ে পৌঁছতে দেরী হলে অসুবিধা হবে, কারণ ওখান থেকে আবার বীরেনকে দেখতে যেতে হবে।

বীরেনের কথা মনে আসতেই তার কাছে আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে

গেল। যেমন করেই হোক, আজ রাতে মাষ্টারদাকে তাকে দেখাতেই হবে।

এই কথা মনে হতেই জোরে জোরে পা ফেলার চেষ্টা করলুম। এবং কিছুদূর যাবার পর প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে পারলুম। হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা, কিন্তু মনের দুশ্চিন্তার চাপে হাঁটুর ব্যথা চাপা পড়ে গেল।

সামনে শ্রীমতী নদী। হেঁটে পার হতে হবে। বৃষ্টি হওয়াতে জল বেড়ে গেছে। স্রোতের টানও খুব। জল আমার কোমর পর্যন্ত হয়ে গেল। আমি কাপড় কোমরে তুলে আগে আগে পার হয়ে গেলাম। মাষ্টারদাও পিছনে পিছনে পার হয়ে এলেন। তারপর মিনিট দশেক হাঁটার পর স্বভাবিক রাস্তায় এসে গেলাম। থানাকে এড়াতে গিয়েই আমাদের প্রায় দু' মাইল রাস্তা বেশী হাঁটতে হল।

তারপর নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে এসে পেঁছিলাম। রাত তখন বারোটা। নির্মলদা তাঁরা কেউ ওখানে তখন ছিলেন না।

খবর নিয়ে জানলাম, সন্ধ্যার সময় ফুটুদা লোক পাঠিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে গেছেন। কথা ছিল মাষ্টারদা এলে সবাই একসঙ্গে বীরেন্দ্রকে দেখতে যাব। কিন্তু মাষ্টারদা নিশ্চয় আসবেন একথা জানা সত্ত্বেও তাঁরা মাষ্টারদাকে ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

মাষ্টারদাও অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। আমার মনেও ভয় এসে গেল। বীরেন্দ্র নিশ্চয় বেঁচে নেই। নতুবা মাষ্টারদাকে ফেলে সবাই চলে গেলেন কেন?

প্রায় অর্ধঘন্টা কেটে গেল। কোন সিদ্ধান্তেই আসা গেল না। অবশেষে মাষ্টারদা বললেন, "বীরেনের আশ্রয়স্থলে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসতে পারবি ব্যাপারটা কী?"

আমার মনে তখন রীতিমত ভয় এসে গেছে। বীরেন্দ্র নিশ্চয় মারা গেছে। এত রাত্রে এই দীর্ঘ পথ একা একা যেতে হবে ভেবে ভূতের ভয়ে আমার দেহ ছম ছম করে উঠল।

গতরাত্রে এই পথে আমি একাকী যাওয়া আসা করেছি, কিন্তু তেমন ভয় হয়নি। আজ বীরেন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়াতেই ভয়ে আমার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। কিন্তু মাষ্টারদার জিজ্ঞাসাই আদেশ, তা জানতাম বলেই জবাব দিলাম, "পারব।"

"কিন্তু তোর হাঁটুর ব্যথা কমেছে তো? দেখি, "মাষ্টারদা বললেন। হাঁটুর কাপড় সরিয়ে দেখলাম হাঁটুটি বেশ ফুলে উঠেছে। "হাঁটতে পারবি তো?" আবার জবাব দিলাম, "পারব।"

ঘড়ি দেখে মাষ্টারদা বললেন, "একটা বেজেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।"

টর্চটা নিয়ে বের হয়ে পড়লুম। তিন ব্যাটারীর টর্চ। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। ভয়ের চোটে হাঁটুর ব্যথাটাও যেন অনুভব হচ্ছে না। আমি জোরে পা চালালুম।

একটু দূরেই একটি বাঁশঝাড়ে ঢাকা পুকুর, নাম "ভোঁয়াইয়ার পুকুর।" একপারে ঘন গাছপালা আর দুইপারে ঘন বাঁশঝাড় ও বটগাছ। গোঁদের উপর বিস্ফোটের মত পুকুরের দক্ষিণপারে একটি কালীবাড়ী, প্রতি অমাবস্যায় রাতে ওখানে কালীপূজো হয় এবং পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। সব মিলে একটা বিভীষিকা যেন।

পুকুরটির পার দিয়েই পথ। দিনের বেলাও অন্ধকার থাকে। ভয়ের কিম্বদন্তী আছে এ পুকুর সম্বন্ধে। অনেকে নাকি ভয় পেয়েছে এ পুকুরে। কাছাকাছি এসে ভয়ে চুল আমার খাড়া হয়ে উঠল। টর্চ জ্বালিয়েই রেখেছি। বহুদূর পর্যন্ত আলো হয়ে গেছে।

আমার শুধু মনে হচ্ছে, আমি বীরেন্দ্রকে মাষ্টারদাকে দেখাতে পারি নি, তাই তার প্রেতাত্মা আমাকে সাজা দেবার জন্য আমার আশেপাশে ঘুরছে।

এত ভয়ের মধ্যেও কিন্তু পা চালানো বন্ধ করতে পারলাম না। শুধু মনে জাগছে, মাষ্টারদা অপেক্ষা করে আছেন। কর্তব্যে ত্রুটি হলে শাস্তি অনিবার্য। মনে মনে আওড়াচ্ছি 'বিপ্লবীদের ভূতের ভয় থাকা অন্যায়।" কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপ্লবীর মনের মধ্যেই যে ভূতের বাসা তৈরী করে রেখেছে। তাই বিপ্লবের মন্ত্র ওখানে শুধু মাথা কুটেই মরছে, ফল হচ্ছে না কিছুই।

পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে ভিতরের পারে প্রবেশ করলুম। তিন ব্যাটারী টর্চের আলোয় পুকুরের ভিতরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভয়ে কিন্তু গলা বুক আমার তখন শুকিয়ে উঠেছে। আমার বামে বাঁশঝাড়, সামনে বাঁশঝাড়, মাথার উপর বাঁশঝাড়, ডাইনে পুকুরের কাজল কালো জল, রাস্তা অত্যন্ত সরু। ভয় যেন অক্টোপাসের মত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

চাপা স্বরে বললুম, "ভাই বীরেন, আমাকে ক্ষমা কর : আমার কোন দোষ নেই, তুমি তো দেখছ। আমি মাষ্টারদাকে এনেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না ভাই।"

পুকুরের উত্তর ও পূর্বপার ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, অর্থাৎ অগ্নিকোণ দিয়ে রাস্তাটি বের হয়ে গেছে। অগ্নিকোণে একটি বিরাট বট গাছের শাখা-প্রশাখা কালীবাড়ীটিকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, সমস্ত ভয় নাকি অগ্নিকোণে, তার উপর আবার বিরাট বটগাছ। দুনিয়ার সমস্ত ভয় ওখানে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে থাকে।

এই অগ্নিকোণে এসে পা আমার আর চলে না। কিন্তু মাষ্টারদা অপেক্ষা করে আছেন, একথা মনে হতেই একপা-দু'পা করে ভয়ের ঐ স্থানটি পার হয়ে এলাম। খোলা রাস্তায় আসতেই বুকটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। এতক্ষণ যেন বুকের উপর একটা বিরাট পাথর চাপা ছিল। হাঁটুর ব্যথা একটুও অনুভব করিনি।

খানিকটা রাস্তা বেয়ে গিয়ে ; তার পরের পথ মাঠের বুকের উপর দিয়ে : ধানের জমি। আলের উপর দিয়ে পথ।

দীঘির পূর্বপার দিয়ে মাঠে নামলাম। অন্ধকার রাতে খোলা জায়গায় একটা স্বাভাবিক আলো থাকে। টর্চ বন্ধ করে আলোর উপর দিয়ে পূব দিকে চলতে চলতে নানারকম ভয়ের কথা মনে পড়ছিল। এই মাঠেও নাকি খুব ভয়।

মাঠের পূর্বদিকে মুসলমানদের কবরস্থান। আপাদমস্তক সাদা পোষাকে আবৃত লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা খোন্দকার সাহেবদের প্রেতাত্মারা নাকি এই মাঠের উপর দিয়ে চলাফেরা করেন।

ভয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে আমি মাথা নীচু করে চলছি। হঠাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। মনে হল একটি লোক দু'হাত দু'পাশে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর যায় কোথা। আপাদমস্তক আমার ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল, শিরশির করে সমস্ত রক্ত মাথার দিকে ধাবিত হল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু টর্চের ফোকাস অতদূর পেঁছিল না।

তিন-চার বার ডাক দিয়ে বললাম, "কে, কে, কে ওখানে ?" কেউ সাড়া দিল না।

এবার আমি নিঃসন্দেহ হলাম, বীরেন আর বেঁচে নেই। ঐ আবছা মূর্তিটা তারই প্রেতাত্মা, আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে।

আরো কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোন সাড়া না পেয়ে ভয়ে জোরে জোরে ছুটিতে লাগলাম। বাকি সরু অন্ধকার গ্রাম্য পথটুকু যে আমি কেমন করে অতিক্রম করেছি, আমি নিজেই জানিনে।

সেই আশ্রয়স্থানের কাছে পেঁছিতেই দেখি অন্ধকারে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরো একটু কাছে যেতেই চিনতে পারলুম, ঐ বাড়ীর মালিক। আমাকে দেখেই তিনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন, "কাকে দেখতে এসেছেন বাবু ? সে তো আর নেই। তাকে তো রাখতে পারলুম না।" বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমারও বুক ভেঙ্গে কান্না এল। আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমার কেবলই মনে হতে লাগল, তার শেষ আশা তো আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। এ সাধ আর কোনদিনই পূর্ণ হবে না।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাকে ছুঁয়ে, তার বুকে হাত দিয়ে, তার আশা পূর্ণ করব। আমার প্রতিজ্ঞা তো রক্ষা করতে পারলুম না। কিন্তু আমি এর জন্য কতটুকু দায়ী? আমার কর্তব্যে তো আমি অবহেলা করিনি। বৃথা সময় একটুও তো নষ্ট করিনি। মাষ্টারদাকে তো আমি নিয়ে এসেছি। তার জীবনীশক্তিই তো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, শুধু সামান্য কয়েকটি ঘণ্টার জন্য মাষ্টারদাকে শেষ দেখা দেখতে দিল না।

হায় রে! সর্বত্যাগী বিপ্লবী, এই তো তোমার পুরস্কার। অকালে ঝরে গেলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন কারো চোখের এক ফোঁটা অশ্রু ঝরল না তোমার জন্য। জানল না কেউ কোথায় তোমার শেষ বিশ্রামস্থল। কেউ করল না প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মার সদগতির জন্য। বিপ্লবী বন্ধুরা তাদের কঠোর কর্তব্যই করে গেল। আর কিছুই তোমার প্রাপ্য নয় তাদের কাছে। কারণ, তারাও তোমারই পথের পথিক। তোমারই মত তারাও সর্বত্যাগী, সর্বহারা। তারাও হয়ত তোমারই মত একদিন এভাবেই বিদায় নেবে পৃথিবীর বুক থেকে। তাই, হে বন্ধু, বিদায়, সদগতি হোক তোমার আত্মার। যুগে যুগে বার বার ফিরে এসো এ পৃথিবীর বুকে। এভাবেই আবার অত্যাচারীতের, উৎপীড়িতের জন্য জীবন উৎসর্গ করে যেও—এ-ই তোমার একজন নগণ্য বিপ্লবী বন্ধুর বিপ্লবী প্রার্থনা তোমার চির-বিদায়ে। তোমার অন্তিম বাসনা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। সেজন্য আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

বাড়ীর মালিকের কাছে শুনলাম, বীরেন সন্ধ্যার সময় মারা গেছে। সবাই মিলে তার মৃতদেহ নিয়ে গেছে শ্রীরাই পাহাড়ের দিকে।

কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলাম ওবাড়ী থেকে। রাস্তায় এসে ভাবতে লাগলাম, এখন কী করি। এ খবর মাষ্টারদাকে দিতেই হবে। কিন্তু যাব কেমন করে? ভয় আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আসার সময় তবুও খানিকটা সন্দেহ ছিল বীরেন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে। কিন্তু এখন তো নিঃসন্দেহ।

আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। রাত্রির এই স্তব্ধতা অসহ্য। একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না কোন দিক থেকে। একটা অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি হল আমার মধ্যে। বন্ধুর জন্য চোখের জল ঝরছে, আর বন্ধুর প্রেতাত্মার ভয়ে চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠছে।

মৃত সন্তানের শোকে মায়ের বুকফাটা কান্নার সময় ছেলের প্রেতাত্মা যদি সামনে এসে বলে উঠে, "মা, আমি এসেছি"; তখন মায়ের অবস্থা কীরূপ হয়,

শোকের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা জানার সুযোগ হয় নি কোনদিন। কিন্তু আজ আমার এ দুর্বলতা দেখে মনে হচ্ছে, শোকের চেয়ে ভয়ের শক্তিই অধিক।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গ্রামের ভেতরের রাস্তাটুকু যেন এক নিশ্বাসেই পার হয়ে এলাম। সামনে আবার সেই মাঠ। আলোর পথে চলতে চলতে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম ঐ মূর্তিটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

আশ্চর্য! মূর্তিটি ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার মনের অবস্থা যে কীরূপ তা অবর্ণনীয়। কথায় বলে, "অল্প শোকে কাতর, অতি শোকে পাথর।"

আমিও যেন অতি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। একটা মরিয়া ভাব যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল ভিতর থেকে। আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কয়েকবার ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ?"

কোন জবাব নেই। তখন আমার মনে হল, মরি তো মরব কিন্তু দেখতে হবে এটা কী। তখন টর্চটা জ্বালিয়ে ধরে বেগে দৌড়ে গেলাম মূর্তিটার দিকে। কাছে যেতেই চোখের সামনে যা দেখলাম, তাতে মনে হল এ পৃথিবীতে ভয়ডর বলে কিছুই নেই। আমার শরীরের উপর থেকে যেন দু মণ বোঝা নেমে গেল নিমেষে। শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল শোলার মত।

কী দেখলাম! দেখলাম, ভূতও নয়, প্রেতও নয়, মানুষও নয়। সরু একটা বাঁশের কঞ্চি খাড়া করে পুঁতে তার আগায় আর একটা হাত দুই লম্বা কঞ্চি "ক্রুশ" চিহ্নের মত বেঁধে একটা ছেঁড়া ময়লা হাফসার্ট তাতে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুঁটির মাথায় ছোট একটি মাটির হাঁড়ি রাখা হয়েছে উপুড় করে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটি লোক দু'হাত দু'পাশে টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে চষা জমির উপর ছড়ানো রয়েছে অংকুরিত ধান।

বুঝলাম, পাখীদের হাত থেকে ধানগুলিকে রক্ষা করার জন্যই এ নকল প্রহরীর ব্যবস্থা। কিন্তু এ নকল প্রহরী যে রাতের বেলায় পথিকের জন্য কিরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে, তা বোধ হয় কৃষক বন্ধুর কল্পনায় আসেনি। তার উচিত ছিল সন্ধ্যার সময় ঐ প্রহরী বেচারাকে সারাদিন খাটুনির পর একটু বিশ্রামের জন্য কোথাও সরিয়ে রাখা।

তা করত যদি, তাহলে আজ রাতে ঐ বেচারাকে আমার হাতে এ দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত না। কারণ, ঐ বেটা আমাকে এভাবে ভয় দেখানোর জন্য আমার হল রাগ। একটানে খুঁটিটা তুলে ফেলে মুচড়িয়ে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে সার্টটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। হাঁড়িটাকে ভাঙলাম আছাড় মেরে।

এভাবে প্রহরীর ভবলীলা সাঙ্গ করে বীরদর্পে আমি রওনা হলাম। শরীর আমার হাল্কা, মনে আনন্দ, যে আনন্দ হত দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের এক একটা দেশ জয় করার পর। বাস্তবিকই ঐদিন হতে ভয় আমার অন্তর হতে চিরনির্বাসিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী জীবনে আমি কত রাত একলা কত পথে যাতায়াত করেছি। চাকুরি জীবনে যখন ফরেস্টার ছিলাম, তখন পাহাড়ে পাহাড়ে হরিণ ও বন্য শূকর শিকারের জন্য কত সন্ধ্যার অন্ধকারে ছড়ার ধারে, ধানক্ষেতের পাশে ওৎ পেতে থাকতাম। হাতে থাকত টর্চ ও দোনলা বন্দুক। কিন্তু ভয় কোনদিন ভয়ে আমার কাছেও ঘেঁসেনি।

বন্দুকের ভয়ে নয় আমার মনের জোরের ভয়ে। কারণ, ভয়ের কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ত ঐ বেচারা ধানক্ষেতের প্রহরীকে, হাসিতে ভরে উঠত মন, মনে হত পৃথিবীতে ভয় বলে কিছুই নেই। এই বৃদ্ধ বয়সের জীর্ণ শরীরেও ভয় আমার কাছে ঘেঁসে না কোনদিন।

যে হতভাগ্য নিরীহ প্রহরীকে আমি নির্মমভাবে হত্যা করেছি কাপুরুষের মত, আমার এই ভয়মুক্তির জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারছি নে।

মন অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেল। মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। আশ্চর্য, যাবার সময় যে 'ভৌরাইয়ার পুকুরের' পথ ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পার হয়েছিলাম, সে পুকুরের কাছে এসে মনে হল, টর্চ না জেবলেই পুকুরের রাস্তা পার হব। দেখি, ভয় কী এবং কেমন। অন্ধকারেই পুকুরের রাস্তা পার হয়ে এলাম। কোনরূপ চাঞ্চল্য এল না মনে। বরঞ্চ একটা কৌতূহল যেন মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আশ্রয়স্থানে এসে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজছে। ভোর হতে আর দেরী নেই। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দরজায় আস্তে টোকা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম 'প্রফেসার'। অমনি দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মাষ্টারদা একটুও ঘুমান নি। সব শুনে তিনি চুপ করেই রইলেন।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন ৮টা বেজে গেছে। মাষ্টারদা আগেই জেগেছেন। আমার হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। অনেকটা জায়গা ফুলে গেছে।

সেদিন দিনের বেলা আর কোথাও যাওয়া হল না। সারাদিন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই নির্মলদা, ফুটুদা ও অন্যান্যরা ফিরে এলেন। তাঁদের কাছে শুনলাম, বীরেন্দ্রের মৃতদেহ শ্রীমাই পাহাড়ে সমাহিত

করা রয়েছে। শ্রীমতী নদীর পারে।

সদা হাস্যমাখা মুখ, চঞ্চল বালকটি ঘুমিয়ে পড়ল চিরতরে। অকালে ঝরে পড়ল একটি অর্ধস্ফুট কুসুম শ্রীমাই পাহাড়ের বুকে। বিপ্লবী বন্ধুদের কাছ থেকে বীরেন্দ্র হারিয়ে গেল শ্রীমাই পাহাড়ে।

ছেলের আসার পথ চেয়ে চেয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার পিতামাতাও বিদায় নিয়েছে এ পৃথিবীর কাছ থেকে। বীরেন্দ্রের দেহ মিশে গেছে শ্রীমাই পাহাড়ের মাটিতে। বৃষ্টির জল সে মাটি ধুয়ে নিয়ে ফেলেছে হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ শ্রীমতী নদীতে। সে জলে স্নান করে পবিত্র হয়েছে শত শত তীর্থযাত্রী। তার দেহধোয়া জলে অবগাহন করে পবিত্র হয়েছে তারই দেশবাসী। তার দেহধোয়া জল শ্রীমতী নদী বয়ে নিয়ে গেছে শঙ্খ নদীর বুকে। শঙ্খ নদী সে জল মিশিয়ে দিয়েছে মহাসাগরের বিশাল হৃদয়ে। বিপ্লবী বীরেন্দ্র মিশে গেছে মহাসাগরের বিশাল বুকে।

বন্ধু, তুমি আজ কত বিরাট, কত মহান, তোমার মহত্ব দিয়ে ক্ষমা কর তোমার এই ক্ষুদ্র বন্ধুকে, যে তোমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। আজ আমি আবার ক্ষমা চাইছি, আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

এ মরজগতে মাস্টারদাকে তুমি শেষ দেখা দেখে যেতে পার নি, কিন্তু মাস্টারদার দেহে তো তুমি মিশে রয়েছ। মাস্টারদার পূতদেহ সমাহিত করা হয়েছে সমুদ্রের বুকে। তাঁর দেহের অণুপরমাণু মিশে গেছে বিশাল বারিধিনীরে। তাঁর দেহের পরমাণুর সাথে তোমার দেহের পরমাণুর হয়েছে মহামিলন মহাসাগরের মহান হৃদয়ে। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার বিপ্লব সাধনা।"

মাস্টরাদা ধরা পড়লেন পরের বছর ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। ধরা পড়লেন এক গ্রাম্য লম্পট জমিদার নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে গত রাত্রে পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে গৈরালা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার প্রধান আসামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্য সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন [আনন্দবাজার : ১৮-২-৩৩]

খবর শুনে সেদিন হায় হায় করে উঠেছিল দেশের মানুষ। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও গত তিন বছরে যার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি, তাকে কিনা ধরা পড়তে হল ঘৃণ্য এক স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। এর চাইতে লজ্জার ব্যাপার আর কি

হতে পারে।

কি বিচিত্র এই সংসার মল্লিকা। এক ভাই নেত্র সেনের কাছে মাষ্টারদার চাইতেও দশ হাজার টাকার মূল্য বেশী। আর এক ভাই ব্রজেন সেন মাষ্টারদার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নন।

উল্লেখযোগ্য, এই ব্রজেন সেনই মাষ্টারদাকে এ গাঁয়ের গুপ্ত আস্তানায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। কে জানত যে তার ফলে এত বড় একটা বিপর্যয় নেমে আসবে মাষ্টারদার জীবনে। তিনি নিজেই কি তা ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন।

সেদিন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন মাষ্টারদা প্রমুখ কয়েকজনই উপস্থিত ছিলেন সেই গুপ্ত আস্তানায়। কিন্তু ধরা পড়েছিলেন মাত্র দুজন। মাষ্টারদা আর ব্রজেন সেন। এই ব্রজেন সেনই শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন শৃঙ্খলিত মাষ্টারদার পাশে। তাই সে কাহিনী ব্যক্ত করার জন্য তাঁকেই আমি এগিয়ে দিচ্ছি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে।

"...মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হন পটিয়া থানার গৈরালা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস নাম্নী এক প্রৌঢ়া মহিলার বাড়ীতে। গ্রেপ্তারের কারণ হল—এক মহিলার অজ্ঞতা এবং কতক প্রভাবশালী গ্রামবাসীর লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা। এদের মধ্যে নেত্র সেন অন্যতম।

...সেদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারী। রাত ৮টায় পরিষ্কার জানা গেল, এই আশ্রয়স্থল প্রকাশ হয়ে পড়েছে গ্রামের দুষ্ট লোকের কাছে। কাজেই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন। তাই মাষ্টারদা তাঁর সাথীদের আদেশ দিলেন—তাড়াতাড়ি নয়টার মধ্যেই বইপত্র দলিলাদি ও নিজেদের টর্চ, রিভলবার, পিস্তলগুলো নিয়ে তৈরী হতে।

সকলে প্রস্তুত হয়ে ৯-১৫ মিনিটে সারিবন্ধ হয়ে একে অন্যের পিছনে বেরিয়ে পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে পথ চলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একে অন্যের খুবই নিকটে ছিল। তখন গ্রামে গ্রামে সরকারী আদেশে কারফিউ চলেছে। তাই গ্রামের পথঘাট অস্বাভাবিক নির্জন ছিল।

এই সারিবন্ধ বিপ্লবীদলের পুরোভাগে ছিলেন ব্রজেন সেন, মাষ্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত। মাষ্টারদার নেতৃত্বে এই বিপ্লবীদল প্রথমে পূর্বদিকে—বাড়ী থেকে বেরোবার স্বাভাবিক পথে এগিয়ে বাঁশের বেড়া পার হবার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ আওয়াজ শোনা গেল—'কোন হ্যায়।'

মুহূর্তে সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আগ্নেয়াস্ত্র মুষ্টিবদ্ধ করে সঙ্গীদের সম্ভাব্য নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। মাষ্টারদা তখন

ইঙ্গিত করলেন সকলকে বাড়ীর আড়ালে চলে যেতে। সেখানে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পরামর্শ করে নেওয়া হল যে, ঐ জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সবচাইতে নিরাপদ পথ—বাড়ীর পশ্চিম দিকের বাঁশবনের ভেতর দিয়ে। সেদিকে সকলে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।

কিন্তু শুকনো পাতায় পা পড়তেই যে মর্মর আওয়াজ হল, তাতেই মনে হল যেন গভীর নীরবতা ভেঙে সেই শব্দই বিকট, বিরাট হয়ে উঠছে। এগিয়ে যেতেই হবে, তাই সে আওয়াজ আর কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হল না। কারণ, সেখানে সর্বত্রই শুকনো বাঁশপাতা ছড়ানো ছিল।

ক্রমে সকলে গুর্খা-কর্ডনের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়ল। গুর্খারা দাঁড়িয়েছিল গাছের আড়ালে ও বিভিন্ন ঝাড়ঝোপের মধ্যে। গুর্খা পরিবেষ্টনী ভেদ করে এগোবার সময় ব্রজেন সেনকে সৈন্যরা জড়িয়ে ধরে ফেলে।

পরক্ষণেই পাশের গাছের আড়াল দিয়ে মাষ্টারদা পরিবেষ্টনী অতিক্রম করতে গেলে গুর্খারা ধাওয়া করে। তিনি গুলি করলেন, কিন্তু গুলি ব্যর্থ হয়ে গাছে লেগে গেল।

সে সময় সেনাবাহিনী আকাশে আগুনের টুকরোর মত একটি গুলি ছোঁড়ে। ঐ গুলি নিচের দিকে আতসবাজীর মত সমস্ত জায়গা আলোকিত করে দিল।

সেই আলোতে নিকটস্থ গুর্খাবাহিনীর ৩/৪ জন সৈন্য তিনদিক থেকে ধাওয়া করে মাষ্টারদাকে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেনকে গুর্খারা কোমরের ও পায়ের পট্টি খুলে হাত পা বেঁধে—গাছের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখে এবং সারারাত ঐ গুর্খা সৈন্যরা রাইফেলের কুদো দিয়ে আঘাত করে। লাথি মেরে গালি দিয়ে গায়ে প্রস্রাব করে দিয়ে নানাভাবে উৎপীড়ন করে।

ক্ষীণস্বাস্থ্য ৩৯ বছরের প্রৌঢ় মাষ্টারদা মৃতবৎ অনড় নির্বাক হয়ে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেন অটুট অবিচল মনোবলে।

রাত প্রায় সাড়ে তিন বা চারটায় ক্যাপ্টেন ওয়ামসলে কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশকে নিয়ে ঘটনা পরিদর্শন করতে আসে। ইতিমধ্যে রাত নয়টা থেকে তিনটে পর্যন্ত এই গুর্খা পরিবেষ্টনীতে কয়েকবার গুলি বিনিময় হয়েছিল। তাই অফিসারেরা ভয়ে কেউ এ মুখো হননি।

তারা এসেই মাষ্টারদার মুখে তীব্র টর্চ ফেলে জিজ্ঞেস করে—'নাম কি'? উনি বলেন 'বিজন'। ওরা কুৎসিত গালাগাল করে ওঠে—এই সূর্য সেন।

মাষ্টারদা ধৃত হন বসন্ত ঋতুর অন্ধকার পক্ষে। আকাশে তারাগুলো সুস্পষ্ট। কোথাও কোন মেঘের চিহ্ন নেই। কিন্তু অকস্মাৎ শেষ রাত্রে প্রকৃতির অশ্রুকণার মত এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

খুব ভোরে সমস্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে মাষ্টারদা এবং তাঁর সংগীকে পটিয়া ক্যাম্পের দিকে কর্ষিত জমির উপর দিয়ে, পল্লীপথ দিয়ে দৌড়িয়ে হাঁটিয়ে মহোল্লাসে নিয়ে চলল।

যেতে যেতে মাষ্টারদা কয়েকবার এই শক্ত ডেলাপূর্ণ মাঠে অবসন্ন হয়ে পড়ে যান। সৈন্যরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে মাষ্টারদার দেহ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। সাহেবকে ডেকে বলতেই সে এসে বন্ধন খুলে দিলে তিনি কাপড় পরে নেন। অর্ধেক পথ এরূপ নিগৃহীত ও বিবস্ত্র হয়ে আসতে হয়। এ সময়ে তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অগ্নিদীপ্ত ও গম্ভীর।

প্রায় মাঝামাঝি পথে রাস্তার ধারে একটি দোকানে বসে কিছু লোক পদ্মপুরাণ পড়ছিল। তারা পড়া থামিয়ে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখল। গুর্খারা বিকৃত স্বরে চীৎকার করে বলল—তোমহারা সর্দারকো পাকড়ায়া।

তারা ভাবল—এ কি! আমাদের পরমপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা ধরা পড়ল ব্রিটিশের হাতে! সকলের মনে সুদৃঢ় গর্ব ছিল মাষ্টারদাকে ধরা ব্রিটিশ সেনার কর্ম নয়।

পটিয়ার ডাকবাংলোয় মিলিটারী ক্যাম্পে ছয় ফুট দৈর্ঘ্য—প্রস্থ কাঁটাতারের এক খাঁচায় মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। মাষ্টারদাকে দেখবার জন্য ক্যাম্পের চতুর্দিকে অসংখ্য জনতার ভীড় জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। স্কুল খালি। ছাত্ররা বই নিয়ে দাঁড়িয়েছে নীরবে। অন্যান্যরা দাঁড়িয়েছে বিমর্ষ হয়ে।

ভীড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। মিলিটারী সেপাইরা এই জনসমুদ্রকে বাধা দিল না। মাষ্টারদা দেখলেন সকলের মুখেই গভীর শোকের ছায়া। নেতাকে শেষবারের মত দেখে গেল দেশবাসী।

মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেন কাঁটা তারের খাঁচায় বসে রয়েছেন চারিদিকে চারজন সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য প্রহরী দাঁড়িয়ে। এমন সময় পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার গোয়েন্দা ক্যাপ্টেনের অলক্ষ্যে বললেন—Surya babu we have many things to learn from you.

মাষ্টারদা একথায় একটু অবাক হয়ে গেলেন। সারাদিন প্রখর সূর্যতাপে দগ্ধপ্রায় অবসন্ন দেহ লুটিয়ে পড়তে চায় মাটিতে। গুর্খারা তখনই তাড়া করে ওঠে রাইফেল উঁচিয়ে।...

শহর থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপার সহ কয়েকজন ইংরেজ এসে উপস্থিত। ওদের মধ্যে পুলিশ সুপার হিকস্ বলে—I shall hang you.

ওরা চলে গেলে মাষ্টারদা বলেন—আমিও ফাঁসি চাই।...তোমরা রইলে। জেল থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে। ধলঘাটের বিশ্বাসঘাতকতা নিরক্ষর গ্রাম্য লোক বলে ক্ষমা করেছি। এবারের

বিশ্বাসঘাতকতা যেন কিছুতেই ক্ষমা না পায়। আমাদের দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায়। এতে বিপ্লবী কাজের খুবই ক্ষতি হবে।

সন্ধ্যা সাতটায় পটিয়া থেকে ট্রেনে করে শহরে নিয়ে যাবার পথে একজন গোয়েন্দা পুলিশ হালকা আলাপ শুরু করে দিল মাষ্টারদার সঙ্গে। বলল—'সূর্যবাবু, আপনি গান্ধীজীর অহিংস নিরস্ত্র পথে না গিয়ে সশস্ত্র পথে গেলেন কেন?'

উনি ধীর শান্তভাবে বললেন—'নিরস্ত্র ও সশস্ত্র আন্দোলনের লক্ষ্য একই।'

এইভাবে ট্রেন এসে পড়ে ষোলশহর স্টেশনে। ট্রেনের দরজা খুলে কতিপয় ইংরেজ ও বাঙালী পুলিশ গোয়েন্দা উঠে পড়ে। একজন ইংরেজ সার্জেন্ট বলে, 'Who is the great Surya Sen?'

কে একজন বলল, 'That old man.'

সেই মুহূর্তে ইংরেজ সার্জেন্ট প্রচণ্ড বেগে মাষ্টারদার নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দেয়। নাক ফেটে ঝর্ঝর্ করে পড়া রক্তে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ দুটি দেহ সিক্ত হয়ে ট্রেনের মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। মাথাটি অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ল সঙ্গী ব্রজেন সেনের বুকের কাছে।

তখনই টানাটানি করে নিচে নামিয়ে বরফঠাণ্ডা জলে মাথা-নাক ভিজিয়ে একটা মোটর বাসে করে দুজনকে সরাসরি জেলা গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে এল। অবসন্ন মৃতপ্রায় মাষ্টারদা নাক টেনে কোন প্রকারে সামলে ওঠার চেষ্টা করেন।

গোয়েন্দা অফিসের দেওয়ালের ধারে মাষ্টারদা ও তাঁর সঙ্গীকে দাঁড়িয়ে রেখে প্রহরী সৈনিকদের বসিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা অফিসার শ্লেষ করে বলল 'সূর্যবাবু, পাহাড়তলীতে প্রীতিকে খেলেন জ্যান্ত মেরে। কল্পনাকে কোথায় রেখে এলেন?'

তিনি শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'জানি না।'

পরক্ষণে পুলিশ সুপার হিক্স্ ও সহকারী পুলিশ সুপার স্প্রিংফিল্ড এসেই দুজন বিপ্লবী বন্দীর উপর প্রহার শুরু করে দেয়। স্প্রিংফিল্ড মাষ্টারদার বুকে রিভলবার দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে।

একজন গোয়েন্দা অফিসার বলে, 'He is injured seriously, please don't beat him.' এতে ওরা উভয়ে বিরত হল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কালো পোষাক পরিহিত বহুসংখ্যক ইংরেজ কৌতূহলী হয়ে তাদের শত্রু মাষ্টারদাকে দেখতে এসেছে। এদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিল। মাষ্টারদাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরে রাত প্রায় এগারোটায় লোহার শিকল খুলে মাষ্টারদাকে অন্যত্র নিয়ে গেল। পরদিন গোয়েন্দা অফিসের বারান্দায় দেখা গেল—মাষ্টারদার পরিহিত ধুতি ধুয়ে রোদে দিয়েছে। রক্তের দাগ কাপড়ে তখনও সুস্পষ্ট। চারদিন পরে মাষ্টারদাকে শেষবারের মত দেখা গেল জেল গেটে। ব্রজেন সেনকেও সেদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী জেলে নিয়ে যায়।'

[বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতি : পৃ: ২০৭-২১১]

নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মাষ্টারদা ধরা পড়লেন। কিন্তু তারপর? কোথায় গেল তার সেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার। হ্যাঁ, পুরস্কার তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। ভোজালির এক কোপেই শেষ। দুবার আর দরকার হয় নি।

১৮ই মে শুরু হল গহিরা সংঘর্ষ।

প্রাণ দিলেন মনোরঞ্জন দাস, পূর্ণ তালুকদার আর নিশি তালুকদার। বন্দী হলেন কল্পনা দত্ত ও মাষ্টারদার নির্বাচিত পরবর্তী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার।

কি ভাবে সেদিন কুমারী কল্পনাদি ও তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা) গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন পুলিশের হাতে। সহযোদ্ধা বিপ্লবী সুধীন দাসের মুখ থেকেই তার বিবরণ কিছুটা শোনা যাক।

"গহিরা গ্রামখানা হল আনোয়ারা থানার সর্বশেষ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে। সমুদ্রের জল-কল্লোলে গ্রামখানা সব সময় মুখরিত হয়ে থাকে।

সেই গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু পরিবারের লোক পূর্ণ তালুকদার ও তাঁর ছোট ভাই প্রসন্ন তালুকদার। তাঁদের বিরাট বসতবাটি। তাঁদের বাড়ীর পশ্চিমে পুকুর। তারপরই সমুদ্রের বিরাট চর।

তাঁদের দুই ভাগিনা ছিল আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগে এবং আমাদের দলের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় আমরা বাঁশখালী থানার সাধনপুর, কালীপুর গ্রামে কয়েকদিন কাটাবার পর গহিরায় এই আশ্রয়ে চলে আসি ১৯৩৩ সালের ১৬ মে। সেই দিনই বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত ছনদণ্ডী গ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়।

বৃটিশ সৈন্য তখন আনোয়ারা থানার সর্বত্র ছেয়ে ফেলেছে। তারা কয়েকটি গ্রামে ছাউনী ফেলেছে ও তল্লাসী চালাচ্ছে। আত্মগোপনকারীদের পক্ষে চলাফেরা করা খুবই অসুবিধা হয়েছে।

তবুও তার ভেতর দিয়ে আমাদের দলের ব্রজেন দে, অবিনাশ দাস, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখ কর্মীবৃন্দ শত বিপদ উপেক্ষা করে সংবাদ আদানপ্রদান করত। আমরা সৈন্যদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম।

তবুও দেখেছি আশ্রয়দাতা তালুকদার ভ্রাতৃবৃন্দের মনোবল কতই সুদৃঢ়। সমস্ত জেনে-শুনেই তাঁরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং খুবই আদরযত্ন করতেন।

সেই আশ্রয় কেন্দ্রে ফুটুদা, কল্পনাদি, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আমি ছিলাম। আমরা দিনের বেলায় ঘরে আবদ্ধ থেকে বোমার পাউডার তৈরী করতাম এবং নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম।

আমরা আলোচনা করে স্থির করেছিলাম কুমিরা-সীতাকুণ্ডের দিকে যাব। সেভাবেই আমরা তৈরী হচ্ছিলাম। সেদিককার আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতা ছিলেন বিনোদদা (বিনোদ দত্ত)। তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ চলছিল সেদিকে যাবার।

সন্ধ্যা হলেই আমরা স্নান, খাওয়া ইত্যাদি সেরে সমুদ্রের চরে গিয়ে বসতাম। সেখানে দলের কর্মীরা খবরাখবর নিয়ে আসত। ১৬ই মে থেকে ১৮ই মে অবধি এভাবেই আমরা দিন কাটাই।

১৮ই মে সন্ধ্যার সময় তুলাতলী গ্রামের মনোরঞ্জন দাস খবরাদি নিয়ে ফুটুদার সাথে দেখা করতে আসে। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর রাত বেশী হওয়াতে পথে টহলদার সৈন্যের সম্মুখে পড়ার আশংকায় মনোরঞ্জনকে ভোরের দিকে যাবার কথা ফুটুদা বললেন।

রাত প্রায় ২-৩০ টার সময় আমরা সবাই আশ্রয়ে চলে আসি। আশ্রয়ে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা সবাই শুয়ে পড়ি। রাত বেশী করে শোয়ার দরুণ আমরা সত্বর ঘুমিয়ে পড়ি।

ভোরের দিকে মনোরঞ্জনকে ফুটুদা জাগিয়ে দেন যেন ভোরে ভোরে গহিরা গ্রামের বাইরে চলে যেতে পারে। মনোরঞ্জন ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের উঠানে এসে জোরে চীৎকার করে বলে উঠে, 'পুলিশ পুলিশ'।

তখনই আমরা চারজন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে রিভলবার হাতে পর পর ঘর থেকে বের হই। প্রথমে আমি, তারপর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও ফুটুদা এবং সবার পেছনে কল্পনাদি।

উঠানে নামতেই দেখতে পাই সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত আশ্রয়স্থল। তখন পুরো ভোর হতে আর আধঘণ্টা মাত্র বাকী। আমরা কর্ডন ভেদ করে সমুদ্রের দিকে চলে যাবার চেষ্টা করি এবং ফুটুদার নির্দেশ মত সেই দিকে সৈন্যদের প্রতি তাক করে গুলীবর্ষণ করি। দেখতে পেলাম ২-৩টি সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল।

তখনই সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য এসে গেল এবং তারা ডাকাডাকি করে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। তখন ফুটুদা আমাদের আবার গৃহে প্রবেশ করতে আদেশ দিলেন। গৃহে ঢোকার পর তাড়াতাড়ি ঠিক করা হয়,

আমরা শেষ গুলিটি থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

আমাদের কাছে চারটি বোমা ছিল এবং এক সের ওজনের সোনার অলংকার ছিল। আমরা ঐ সমস্ত জিনিস নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সোনার অলংকারগুলি প্রসন্ন তালুকদারের হাতে ফুটুদা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'যদি অলংকারগুলি আমাদের কেউ নিতে আসে তাহলে দিয়ে দেবেন।'

ফুটুদা আরও বললেন, 'যতক্ষণ অবধি সাহেবরা দরজার কাছে এসে আপনাদের বের হতে বলবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কেউ ঘর থেকে বের হবেন না। তাদের এই নির্দেশ দিয়ে কোঠাঘরে ঢুকিয়ে দিলেন এবং আমরা দক্ষিণদিকের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সেই ঘরে ঢুকে শুনতে পেলাম, বাইরের উঠান থেকে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। ফুটুদা জোর গলায় বললেন, 'আত্মসমর্পণ নয়, আমরা শেষ গুলিটি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'

আমি ফুটুদাকে বললাম, 'রাতের আর বেশী দেরী নেই। আপনাকে এবং ভুলুদিকে (কল্পনাদি) বাঁচতেই হবে। পার্টিকে সুসংগঠিত রাখার জন্য আপনাদের পালিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আমি আর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কর্ডন ভেদ করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে সৈন্যরা মনে করবে আমরা সবাই সেদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এতে তাদের লক্ষ্য থাকবে সেদিকে। আর এরই সুযোগে আপনারা অন্যদিকে পালিয়ে যাবেন।'

এই প্রস্তাবমত মনোরঞ্জন আর আমি বোমা ও রিভলবার নিয়ে দরজার কাছে এসে কোন্ দিকে দৌড়ে যাব দেখছি, এমন সময়ে পশ্চিমদিক থেকে একটা গুলি মনোরঞ্জনের বুকে এসে বিঁধল। আমরা দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। গুলি লাগামাত্রই 'ভাই আমি চললাম তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও' বলেই আমার গায়ে ঢলে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। অজস্র রক্ত ঝরতে লাগল, যেন বাঁধভাঙা বন্যায় জল কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। রক্তের শেষ বিন্দু নিঃশেষ হবার পর তাকে দেখতে পেলাম যেন হাসি-হাসি মুখে মৃন্ময় শয্যায় শায়িত এক দেবকুমার।

মিনিট কয়েক অতিবাহিত হবার পর আবার পরিকল্পনামত হাতে বোমা ও রিভলবার নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উঠানের দিকে দৌড় দেব, এমন সময়ে ফুটুদা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'একজনকে তো হারালাম, আর তোমাকে এভাবে হারাতে চাই না। পরিণামে যা হবে হোক, up to last bullet যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'

এই বলেই দরজা বন্ধ করে ঘরের তিনটি বড় জানালা খুলে দিয়ে ভলি

ফায়ার করতে লাগলাম আমরা তিনজনে। তারই মধ্যে দরজা খুলে বোমা চারটি নিয়ে উঠানে নেমেই সৈন্যদের দিকে তাক করে চারটি বোমাই ছুঁড়ে দিই। ভীষণ শব্দে বোমাগুলি ফেটেছিল। সৈন্যরাও তাদের মধ্যে বলাবলি করে ভীষণ গুলিবর্ষণ করতে লাগল এবং আমরাও সমানে গুলি চালিয়ে যেতে লাগলাম। ভোর হবার পর অবধি এভাবেই গুলি বিনিময় হতে হতে আমাদের সমস্ত গুলি নিঃশেষ হয়ে গেল।

তখন প্রায় সকাল আটটা বাজে। বাড়ীর বাইরে থেকে ক্যাপটেন হাঁক দিতে থাকে, 'আত্মসমর্পণ কর এবং উলংগ হয়ে হাত তুলে বের হও।' বাইরে থেকে আমাদের বের হতে বলায় গৃহস্বামী ৭০-৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ পূর্ণ তালুকদার ওদের বের হয়ে যেতে বলেছে মনে করে আমরা যে ঘরে আছি, সে ঘরের সম্মুখ দিয়ে গিয়ে যেই উঠানে নেমেছেন, সে সময় একটি গুলির শব্দ শুনলাম এবং একটা ভারী জিনিসেরও পতনের শব্দ শুনলাম।

সৈন্যরা যে ঐ বৃদ্ধকে গুলি করেছে তা আমরা বুঝতে পারি নি। কারণ সে সময় দরজাটি বন্ধ ছিল। তারপর ফুটুদা বললেন, যা হবার তা ত হবেই, আর দেরী করে লাভ নেই। ওদিকে Captain Major-রা ঘন ঘন হাঁক দিচ্ছে। এতে আমরা পর পর হাত তুলে বের হলাম।

দরজা খুলে বাইরের উঠানে যাবার পথে পূর্ণ তালুকদার মহাশয়ের প্রাণহীন দেহ দেখতে পেলাম। সৈন্যরা সংগীন উঁচিয়ে, পিস্তল তাক করে আমাদের কাছে এসে আমাদের পিছমোড়া করে বন্দী করল। এর পর বাড়ীর বাইরের রাস্তার পাশে মনোরঞ্জন দাশকে (যার চিৎকারে আমরা জানতে পারি পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে) মাথায় বেটন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাই।

এক জাঠ মেজর তার হাতের বেটন দিয়ে আমার বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। সেই আঘাতে আমি প্রায় দশ মিনিট নিশ্বাস ফেলতে পারি নি। সেই বেটন মারার কালো দাগ শরীরের চামড়ার সাথে মিশে যেতে প্রায় তিন-চার বছর লেগেছিল।

তারপর আমাকে এবং ফুটুদাকে চৌকিদারেরা নীল পাগড়ীর কাপড়ের দুদিক দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তার একপাশে বসিয়ে রাখল এবং কল্পনাদিকে অন্য এক দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাদের থেকে আলাদা করে বসিয়ে রাখল। পাঁচ-ছয়জন সৈন্য সংগীন উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল। সেই সময় দেখতে পেলাম দূর থেকে অনেক সৈন্য এসে সেই আশ্রয়ে জমা হচ্ছে।

দুজন ইংরেজ অফিসার ফুটুদা ও আমার কাছে এসে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করল এবং ফুটুদাকে বুট দিয়ে এমনভাবে লাথি মারল, যার ফলে

তার বাম চোখের ভ্রূর উপর ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। এরপর আর আমাদের কারোর উপর তেমন কোন শারীরিক নির্যাতন করে নি কারাগৃহে নেওয়া পর্যন্ত।

দেখতে পেলাম, আশেপাশের গ্রামের লোক এসে সেখানে জড়ো হয়েছে এবং আমাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের সময় নানা দুঃখ প্রকাশ করছে।

সে সময় গ্রামবাসীর চেহারা দেখে আমরা অনুভব করেছি যে, আমরা ধরা পড়াতে তারা কতই না দুঃখিত। তাদের সহানুভূতিপূর্ণ চোখমুখ এখনো যেন আমার চোখে ভেসে উঠছে।

পরে জানতে পেরেছি যে সৈন্যরা এই আশ্রয়স্থানকে ঘিরে ফেলার সাথে সাথে সেই গ্রামের আর যত সব পথ আছে সবগুলিতেই সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে কোন রকমে গ্রাম থেকে কোন লোক বাইরে যেতে না পারে।

এর পর আমাদের গহিরা গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে তুলাতলী গ্রামের ছাউনিতে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সারার পর আবার হাঁটিয়ে চার-পাঁচ মাইল উত্তরদিকে আনোয়ারা হাই-স্কুলের ক্যাম্প নিয়ে আসে।

সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করার পর সকালবেলা আবার হাঁটিয়ে সাত-আট মাইল উত্তরে কালারপুলে নিয়ে আনে। সেখানে তখন গুর্খা রেজিমেন্টের বিরাট ক্যাম্প ছিল। তাদের মাঝখানে আমাদের বসিয়ে রাখার পর ইংরেজ ক্যাপটেনরা আমাদের নিয়ে কয়েকটি ফটো তুলে নিল।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম শহর থেকে একখানা লঞ্চ এসে পেঁচেছে। এতে করে ফিরিঙ্গীবাজারের সন্নিকটে রায়বাহাদুর অভয় মিত্রের ঘাটে আমাদের অবতরণ করান হয়। সেখান থেকে হাঁটিয়ে কোতোয়ালী থানার সন্নিকটে ডি, আই, বি অফিসে এনে হাজির করে। সেখানে আমাদের তিনজনের জবানবন্দী নেওয়ার পর ২০শে মে সন্ধ্যা সাতটার সময় চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হয়।"

[**চট্টগ্রাম : বিপ্লবের বহ্নিশিখা : শচীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত**]

এবার বিচার। আসামীর সংখ্যা মোট তিনজন। মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার আর কল্পনা দত্ত। রায় দেওয়া হল ১৯৩৩ সালের ১৪ই আগস্ট।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রতি প্রাণদণ্ড

কুমারী কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'চট্টগ্রাম ১৪ই আগস্ট—অদ্য দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রাইবিউনাল হইতে অতিরিক্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় প্রদত্ত হয়। ট্রাইবিউনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ঐ একই ধারায় তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। কুমারী কল্পনা দত্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা

অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণের চারিদিকে পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। রায় প্রদত্ত হইবার পূর্বে সেনাদল কিছুকাল শহরে কুচকাওয়াজ করে।

আসামীরা শান্তচিত্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহারা বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতে করিতে আদালতগৃহ ত্যাগ করে।

ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট রায়ের উপসংহারীয় অংশ পাঠ করেন। ১৫০ খানি টাইপ করা কাগজে রায় প্রদত্ত হইয়াছে।

[আনন্দবাজার : ১৫-৮-৩৩]

এরপর আপীল। সংবাদপত্রের ভাষায় :

সূর্য সেন প্রভৃতির আপীল

হাইকোর্টে আবেদন দাখিল

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার এবং যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কুমারী কল্পনা দত্তের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের আবেদন পেশ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রোহিনীবিনোদ রক্ষিত, পরিমল মুখোপাধ্যায় এবং রাধিকারঞ্জন গুহ এই সকল আইন ব্যবসায়ী আসামী পক্ষ হইতে আপীল রুজু করিয়াছেন। [আনন্দবাজার : ২২-৮-৩৩]

আপীল অগ্রাহ্য করা হল পুজোর ছুটির পরে নভেম্বর মাসে। রায় ঠিকই আছে। ফাঁসিই এক্ষেত্রে একমাত্র শাস্তি।

সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী শেষ রাত্রে। একই দিনে। একই সঙ্গে। একই ফাঁসি মঞ্চে। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার

শুক্রবার ভোরে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসি

চট্টগ্রাম ১২ই জানুয়ারী, অদ্য সকালবেলা চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী। চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। বিচারে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত দণ্ডাদেশের

বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৩-১-৩৪]

শক্তিমত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ত্রাস সৃষ্টিকারী অগ্নিযুগের তৃতীয় পর্বের নায়ক মাস্টারদা চলে গেলেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন মল্লিকা। কি অবস্থায় সেদিন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মাস্টারদাকে ? তখন কি সত্যই তাঁর দেহে প্রাণ ছিল; নাকি তার আগেই তিনি নিহত হয়েছিলেন পাশবিক নির্যাতনের ফলে ? মৃত্যুর পরে তাঁর দেহটারই বা কি হল ! ওটা কি দাহ করা হয়েছিল, নাকি ভারী পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের নিচে ?

অনেক প্রশ্ন। অনেক সন্দেহ। কিন্তু ইতিহাস নীরব।

ইতিহাস মুখর হয়ে উঠল ১৯৬৯ সালের এক শনিবারে।

বাল্যবন্ধু চিত্তপ্রিয় মিত্র তখন আলিপুর কোর্টের দায়িত্বশীল রেজিস্টারিং অফিসার। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে চিত্তপ্রিয়ই সেদিন একটি রহস্যময় লোককে ধরে নিয়ে এল লেক গার্ডেনস-এ অবস্থিত বিচারপতি অমর সাহার বাড়িতে।

পূর্ব ব্যবস্থা মত অনেকেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন লেক গার্ডেনস-এ অবস্থিত সেই বাড়িতে। ছিলেন চিত্তপ্রিয়র সহকর্মী বিমল মুখার্জী, ডেপুটি জেলার প্রভাস বসু, আর বিচারপতি অমর সাহা স্বয়ং।

সবার দৃষ্টি তখন সেই রহস্যময় মানুষটির দিকে। বিরাটদেহী পুরুষ। বয়েস চুরাশী বছর। কিন্তু কি অটুট স্বাস্থ্য। যেন ছোটখাট একটি দৈত্যবিশেষ।

ওদিকে অ্যাডভোকেট অমর ঘোষালের দামী টেপ রেকর্ড যন্ত্রটি নিয়ে চিত্তপ্রিয়র ভাগ্নে প্রদীপ নিয়োগী তখন প্রস্তুত। স্পুলটা ঘুরতে শুরু করেছে স্বাভাবিক গতিতে।

তোমার কোন ভয় নেই ভাই, আমরা কয়েকটি কথা জানতে চাই তোমার কাছে। কোন কিছু গোপন না করে এ সম্বন্ধে যা জানো, সব খুলে বল। কথাটা বুঝতে পেরেছ কি ?

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল সেই মানুষটি। হ্যাঁ, সে বুঝতে পেরেছে।

টেপ রেকর্ডে গৃহীত একটি জবানবন্দী। দীর্ঘ দশ বছর বাদে তার কিছুটা অংশ আমি তুলে ধরছি তোমার সামনে।

তোমার নাম কি বল ?

এজ্ঞে, শিবু ডোম। খাঁটি নাম শিবলাল ডোম। সবাই ডাকে 'নাটা' বলে।

দেশ কোথায় ?

এজ্ঞে, মজঃফরপুর জেলায়। গাঁয়ের নাম বেরিচাপরা।

—এখানে কোথায় থাক ?

—কে, পি রায় লেনে।

—পেশা কি ?

—জেলখানায় ফাঁসি দেওয়া।

—কবে থেকে এ কাজ শুরু করেছ ?

—সাহেবদের আমল থেকেই। তেনারা খুব ভক্তিছেদ্দা করতেন আমাকে। খাতির করে হ্যাংম্যান বলে ডাকতেন। আদর করে দু একটা সিগারেটও দিতেন মাঝে মাঝে।

—এ কাজের জন্য কত টাকা করে পেতে সরকারের কাছ থেকে ?

—ষোল টাকা আর যাতায়াত ভাড়া।

—মোট কতজনকে ফাঁসি দিয়েছ এ পর্যন্ত ?

—অত গুণে রাখিনি হুজুর। তবে আট-নয়শর কম হবে না।

—কবে, কাকে ফাঁসি দিতে হবে, কি করে জানতে ?

—এজ্ঞে নোটিশ পেতাম। ব্যস, তারিখমত গিয়ে হাজির হতাম সেই জেলখানাতে।

—তারপর কি করতে বলে যাও।

—এজ্ঞে, তামাম দিন জেলখানায় বসে ধেনো মদ গিলতাম, আর ঘুমোতাম। পয়সা লাগতো না। সাহেবরাই আদর করে খাওয়াতেন। কোন স্বদেশীবাবুকে ফাঁসি দিতে হলে আরো বেশী করে খাওয়াতেন।

—স্বদেশীবাবুদের মধ্যে কাকে কাকে ফাঁসি দিয়েছ ?

—নাম মনে নেই হুজুর, তবে অনেককেই দিয়েছি।

—চট্টগ্রাম জেলে কাউকে ফাঁসি দিয়েছ কি ?

—দিয়েছি হুজুর। একসঙ্গে একজোড়া স্বদেশীবাবুকে ফাঁসি দিয়েছি।

—সেদিনের কথা তোমার কিছু মনে আছে কি ?

—এজ্ঞে, বেজায় শীত ছিল সেদিন।

—আর কিছু মনে নেই ?

—কি করে থাকবে হুজুর! আমাকে তো ধেনো খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখা হত। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম সেদিন। যেদিকে তাকাই শুধু গুর্খা আর গুর্খা। গোটা জেলখানা ভর্তি গুর্খা। দেওয়ালের ওপর, এমন কি গাছের ওপর পর্যন্ত গুর্খা ফৌজ বসে আছে বন্দুক হাতে নিয়ে। এত ফৌজ এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি হুজুর।

—তারপর কি হল বলে যাও।

—সাহেবরা দুজন স্বদেশীবাবুকে সেপাইদের সাহায্যে ধরে নিয়ে এলেন। একজনের বয়েস বেশী। মাথায় চুলও কম। আর একজন ছোকরাবাবু।

ব্যস, তারপরই লেগে গেল গোলমাল।

—কিসের গোলমাল?

—এজ্ঞে আইনে রয়েছে, গলায় দড়ি পরাবার আগে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দিতে হবে। বড় স্বদেশীবাবু তাতে একেবারেই নারাজ! তাঁর এক কথা, 'ইংরেজ সরকারের আইন আমি মানি নে।' বারবার তিনি বাধা দিতে লাগলেন সেপাইদের। বললেন 'যতক্ষণ প্রাণ আছে, কিছুতেই আমি আমার হাত বাঁধতে দেব না।'

—তারপর কি হল বলে যাও।

—এক সাহেব তখন আমাকে হুকুম করলেন হাত দুটো বেঁধে দিতে। ধেনোর নেশায় আমি তখন বেহুঁশ প্রায়। কি করতে কি করে বসব কে জানে। তাই বললাম আমাকে রেহাই দিন হুজুর। আমার কাজ ফাঁসি দেওয়া, হাত বাঁধা আমার কম্মো নয়।

—তারপর! তারপর! তারপর!

—সাহেব তখন নিজেই গেলেন তার হাত বাঁধতে। আরে বাসরে বাস। এমনভাবে বড় স্বদেশীবাবু মুখ বাড়িয়ে দিলেন যে, মনে হল বুঝি দাঁত বসিয়ে দেবেন। ভয় পেয়ে সাহেব তখন সরে গেলেন নাগালের বাইরে। তারপর হুকুম হল—আবার একে নিয়ে চল সেই পুরণো ঘরে।

—পুরণো ঘরে! মানে আবার সেই ডেথ সেলে?

—হ্যাঁ হুজুর। সঙ্গে গেল জনকয়েক গোরা সেপাই। আমি ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম প্রস্তুত হয়ে। এমন ফ্যাসাদে আমাকে আর কোথাও পড়তে হয়নি হুজুর।

—থেমো না যেন। তারপর কি হল বলে যাও।

কিছুক্ষণ পরে আবার সবাই ফিরে এলেন ফাঁসির জায়গায়। কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু দেখা গেল, বড় স্বদেশীবাবু তখন আমার চাইতেও বেহুঁশ। তিনচার জন গোরা সেপাই তাঁকে নিয়ে এসেছিল ধরাধরি করে।

—দেহে প্রাণ ছিল কি?

—কি করে বলব হুজুর! আমি কি আর তখন মনিষ্যি ছিলাম! যাকে বলে বেহেড মাতাল।

—একটু ভেবে বল শিবু। বেঁচে থাকার কোন লক্ষণ তাঁর দেহে দেখতে পেরেছিলে কি মনে হয়?

—জোর করে বলতে পারব না হুজুর। থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। তবে একদম হুঁশ ছিল না। সাহেবদেরও দেখলাম খুব গম্ভীর।

—তারপর কি হল বলে যাও।

—বলার আর কিছু নেই হুজুর। তিন চারজন গোর্খা সেপাই শেষ পর্যন্ত ধরে রইলেন তাঁর বেঁহুশ দেহটাকে। তখন আর হাত বাঁধতে কোন অসুবিধা ছিলনা। সাহেবদের হুকুমে আমি তাঁর মুখটা ঢেকে দিলাম কালো টুপি দিয়ে। এক সাহেব তার হাত থেকে রুমালটা ফেলে দিলেন মাটিতে। আমিও জোরে টান দিলাম হাতল ধরে। ব্যস, শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে।

—শবদেহ কি হল? ওটা কি জেলের ভেতরেই দাহ করা হয়েছিল?

—না, জেলের ভেতরে কিছু হয়নি। তাহলে আমার চোখে পড়ত।

—তবে কি জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

—তা আমি দেখিনি হুজুর। তবে পষ্টো মনে আছে, জেলের ভেতরে কিছু হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। সে যা কাণ্ড সেদিন। গতিক দেখে সাহেবের দেওয়া আর এক বোতল গলায় ঢেলে দিলাম, তবু কিছুতেই আর নেশা হল না।

—কি ব্যাপার বল তো?

—বহু স্বদেশীবাবু তখন আটক ছিলেন জেলখানাতে। তামাম রাত ধরে চলল তাঁদের চিৎকার—বন্দেমাতরম্। সাহেবদের হুকুমে গুর্খারা বারবার গিয়ে পেটাতে লাগল ঐ স্বদেশীবাবুদের! কিন্তু কে কার কথা শোনে! কেউ সেদিন ঘুমোননি ঐ জেলখানাতে। খালি বন্দেমাতরম্।

—তাই বুঝি অত ধেনো খেয়েও তোমার নেশা টুটে গিয়েছিল?

—ঠিক বলেছেন হুজুর।

—সেদিন যাকে তুমি ফাঁসি দিয়েছিলে, তাঁর নাম জানো কি?

—তখন জানতাম না হুজুর। পরে শুনেছিলাম, তাঁর নাম নাকি মাস্টার-বাবু। সবাই নাকি খুব ভক্তিছেদ্দা করতেন তাঁকে।

—একথা শোনার পর তোমার অনুতাপ হল না?

—অনুতাপ হবে কেন হুজুর! আমি তো আর ফাঁসির হুকুম দিইনি। হুকুম দিয়েছেন সরকার, আমি সেই হুকুম তামিল করেছি মাত্র। আমি না করলে আর একজন করতো। সে না করলে অন্য লোক আসতো। তাহলে আমার দোষটা কোথায়। আমি তো হুকুমের চাকর। তাছাড়া আমি তো আগেই বলে নিতাম যে, আমার কোন দোষ নেই।

—সে আবার কি?

—এজ্ঞে, টুপি পরানোর আগে সাহেবরা আদালতের হুকুম শোনাতেন। আমাকে তখন বলতে হতো—আমার কোন দোষ নেবেন না, আমি সরকারী হুকুমে ফাঁসির দড়ি টানছি মাত্র।

মাস্টারদা সম্বন্ধে জল্লাদ শিবু ডোমের কথা এখানেই শেষ। যুব বিদ্রোহের

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, কিন্তু ইতিহাস আজও তাকে বুকে ধরে রেখেছে পরম শ্রদ্ধাভরে। সেখানে তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অমর। মৃত্যুঞ্জয়ী।

মাস্টারদার ফাঁসির তারিখ সম্বন্ধে আনন্দবাজারের বিবরণটি লক্ষ্যণীয়। এই ১২ই জানুয়ারী তারিখটিই 'সূর্য সেন দিবস' হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে। একই বক্তব্য রয়েছে 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা' পুস্তিকায়: '১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি গ্রেপ্তার হন, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ দেন।' অভিজ্ঞ সমালোচকের মতে তারিখটি সন্দেহজনক। কারণ ভারত সরকারের প্রামাণ্য ইতিহাস তাঁকে ফাঁসি দিয়েছেন আরো চব্বিশ ঘণ্টা আগে ১১ই জানুয়ারী তারিখে।

মাস্টারদার অধ্যায় কিন্তু এখানেই শেষ নয় মল্লিকা। সেদিন আরো চারজনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল মাস্টারদাকে কেন্দ্র করে।

মাস্টারদার ফাঁসির ঠিক চারদিন আগেকার কথা। তারিখটা ছিল ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী।

গোটা চট্টগ্রাম সেদিন অস্থির, চঞ্চল। মাস্টারদার ফাঁসি কিছুতেই আমরা মুখ বুঁজে সহ্য করবো না। এর জবাব আমরা দেবই। মাস্টারদা যেন দেখে যেতে পারেন যে, আমরা এখনো মরে যাইনি।

নেত্র সেন খতম। তা বলে এটাই আমাদের শেষ কথা নয়। নীতি আমাদের এখন একটাই। আঘাতের বদলে আঘাত। মারের বদলে মার।

চিহ্নিত তরুণরা সবাই কারারুদ্ধ। কেউ বড় একটা বাইরে নেই। তাই দায়িত্ব নিলেন হরেন চক্রবর্তী, নিত্য সেন, কৃষ্ণ চৌধুরী, হিমাংশু চক্রবর্তী প্রমুখ বালকবৃন্দ। যা হবার হবে, তা বলে মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে কেন। শ্বেতাঙ্গদের ভীড়ে পল্টনের ক্রিকেট মাঠ সেদিন জমজমাট। চারপাশে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর কঠোর বেষ্টনী। সুতরাং, নিশ্চিন্তে ম্যাচ শুরু করা যেতে পারে।

সহসা গোটা মাঠটা কেঁপে উঠল রিভলবার ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দে। মরি তো মরব, তবু দেখিয়ে দিয়ে যাব যে, আমরাও বদলা নিতে জানি।

হিমাংশু চক্রবর্তী ও নিত্য সেন ঘটনাস্থলেই প্রাণ দিলেন রক্ষীবাহিনীর গুলিতে। কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী ধরা পড়লেন গুরুতরভাবে আহত হয়ে।

যথাসময়ে বিচার। তারপর সেই একই ব্যাপার। দুজনকেই দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। কিন্তু না, আর চট্টগ্রাম নয়। ওদের বিশ্বাস নেই। তাই ঝুঁকি না নিয়ে দুজনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হল মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে।

ভালই হল। পাশের কনডেমড সেলেই ও'রা পেয়ে গেলেন যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীকে। তিনিও তখন ফাঁসির প্রতীক্ষায়। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলার রায়

অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড

'চট্টগ্রাম, ১০ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দ্বিতীয় মামলার রায় দিয়াছেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রতি প্রাণদণ্ড এবং সরোজ গুহের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। হেমেন্দু বিকাশ দস্তিদার মুক্তি পাইয়াছে।

অম্বিকা চক্রবর্তীকে সাতদিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবে। রায়দানের সময় আদালতের ভিতরে ও বাহিরে বহু পুলিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর ফাঁসি হয়নি। আপিলে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল ফাঁসির পরিবর্তে।

গানে গল্পে দিন কেটে যায়। তবে আর বেশীদিন নয়। ১৯৩৪ সালের ৫ই জুন কৃষ্ণ ও হরেনকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যমঞ্চে। যেতে যেতে সে কি উল্লাস দুজনের। আমরা যাচ্ছি অম্বিকাদা। আপনি দুঃখ করবেন না যেন। চলি এবার। বন্দেমাতরম!

বন্দেমাতরম।

শেষ পর্যন্ত অম্বিকা চক্রবর্তী তাকিয়ে রইলেন ওদের চলার পথের দিকে। ঐ যে ওরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে বধ্যমঞ্চের দিকে। না, আর দেখা যাচ্ছে না। দুজনেই ঢাকা পড়ে গেছে পাঁচিলের আড়ালে।

সব যেমন ছিল তেমনই আছে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে। শুধু পাখির কলরব শান্ত হয়ে গেছে। সেই কলকণ্ঠ এখন একেবারেই স্তব্ধ।

বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়ালে একটি স্মৃতিফলক তোমার চোখে পড়বে মল্লিকা। মোট দুজন শহীদের নাম লেখা রয়েছে ঐ ফলকটির গায়ে। একজন অনুজা সেন, অন্যজন দীনেশ—না, রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী দীনেশ গুপ্ত নন, ইনি সম্পূর্ণ আলাদা লোক। নাম দীনেশ মজুমদার।

অথচ এই দুই দীনেশ নিয়ে নাম বিভ্রাট ঘটেছে বারবার। এমন কি সরকারী তরফে পর্যন্ত।

বিপ্লবী বন্ধু লোকেন সেনগুপ্তের প্রয়াসে সরকারী উদ্যোগে প্রথম এই

স্মৃতি ফলকটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ২৫শে আগস্ট।

'আশ্চর্য', পরিচয়-লিপিতে সেই একই বিভ্রাট। সংস্কার করা হল ১৯৭৮ সালের ২৫ শে আগস্ট। এবার অবশ্য বুঝতে অসুবিধা নেই যে, ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী দীনেশ গুপ্ত আর দীনেশ মজুমদার এক নন, তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা লোক।

দীনেশ গুপ্তের কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এবার বলব দীনেশ মজুমদারের কথা।

১৯৩০ সাল। আকাশে বাতাসে কিসের যেন একটা চাপা অস্থিরতা। মনে হয়, শিগ্‌গীরই বড় রকমের যেন একটা ঝড় উঠবে। উদ্দাম ঝড়।

আশংকা অমূলক হল না। সহসা পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠল সুদূর চট্টগ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল প্রতিটি বিপ্লবী দলে। আর দেরী নয়। এই সুযোগ। একযোগে চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে চিরতরে ঘুচিয়ে দিতে হবে। আঘাতের বদলে আঘাত হানতে হবে। মারের বদলে মার।

জানি, তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অনেক তাজা প্রাণ। তার জন্য কোন দুঃখ নেই। অতীতেও আমরা অনেক মূল্য দিয়েছি। দরকার হলে এবারও দেব। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই মূল্য দেবার পালা আমাদের কোনদিনও শেষ হবে না।

ফার্স্ট টার্গেট: বিপ্লব আন্দোলনের পয়লা নম্বরের শত্রু পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। কি করেনি সে এই বাংলাদেশের বুকে। কি করতে বাকি রেখেছে!

শহীদ গোপীনাথের সেই অন্তিম বাসনা আজো পূর্ণ হয়নি। আজও সেই শয়তান টেগার্ট তার অত্যাচারের নির্মম রথচক্র চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে। এবার তার জবাব দিতে হবে। উপযুক্ত জবাব।

২৫ শে আগস্ট, ১৯৩০ সাল।

জনাকীর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ার। চারিদিকে লোকজনের কর্মব্যস্ততা। জনতার কোলাহল আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চলটা।

একটা নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে যুগান্তর পার্টির দায়িত্বশীল সদস্য দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন তখন প্রস্তুত।

বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অপর দুই সদস্য অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগীও প্রস্তুত। আর রয়েছেন কালিপদ ঘোষ। টেগার্টের গাড়ি দেখামাত্র তিনিই সবাইকে সংকেত দেবেন ইশারাতে। তারপরই, ব্যস।

জানা গেছে, রোজই এগারোটা নাগাদ টেগার্ট লালবাজারে গিয়ে থাকেন-

নিজের গাড়িতে করে। আজ আর তার পরিত্রাণ নেই। মারাত্মক টি. এন. টি. বোমা এবং রিভলবার দুইই তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে গ্রীন সিগন্যাল দিলেন কালীপদ ঘোষ। ওই যে গাড়িটা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। সবাই প্রস্তুত হও।

নিমেষে লক্ষ্য স্থির করলেন দীনেশ। পরমুহূর্তেই তিনি বোমাটা ছুঁড়ে দিলেন টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—বুম্‌বুম্‌।

না, ঠিক হল না, ধোঁয়া সরে যেতেই দেখা গেল, বোমাটা ঠিকমত লাগে নি। গাড়ির বাঁ দিকের দরজায় লেগে বাইরে ফেটে পড়েছে।

ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছেন সঙ্গী অনুজা সেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সামান্য দেরী হল তাঁর বোমাটা ছুঁড়ে দিতে, আর সেই মুহূর্তে নিজের হাতে বোমা ফেটে গোটা দেহটাই গেল তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে। দেখা গেল পেটের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

এই অবস্থার মধ্যেই অনুজা কোনরকমে এগিয়ে গেলেন সামনের পার্কটাকে লক্ষ্য করে। হাত বাড়িয়ে পার্কের একটা রেলিং চেপে ধরে পরক্ষণেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন জীবনী শক্তির অভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

সহসা কি দেখে কোমরে হাত দিলেন দীনেশ। উদ্যত রিভলবার হাতে নিয়ে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে টেগার্ট। এই সুযোগ। এই সুযোগ ওকে ওর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

কিছুতেই কিছু হল না। দেখা গেল, ভুলের মাশুল একা অনুজাকেই শুধু দিতে হয় নি, সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে নিজেও তিনি আহত হয়েছেন মারাত্মকভাবে।

নিরুপায় দেখে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করলেন পলায়নপর জনতার ভিড়ে মিশে যেতে, কিন্তু আহত দেহ নিয়ে বেশীদূর যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে।

ডাক্তারী পরীক্ষায় অনুজার পেটে ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল মোট দশটি। তার নয়টি দেহের বাম দিকে। একটি বুকের উপর।

দীনেশের আঘাত লেগেছে ডান হাতের মোট তিন জায়গায়। এক্সরে করে দেখা গেছে, তখনো দুটো বোমার টুকরো তাঁর ডান হাতের মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকে রয়েছে গভীরভাবে।

সেদিনই গ্রেপ্তার করা হল কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ রায়কে। তারপর ডাঃ ভূপাল বসু, যতীশ ভৌমিক, কালিপদ ঘোষ, সুরেন দত্ত, রোহিনী অধিকারী, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায় প্রমুখ আরো অনেকেই।

মেয়েরাও বাদ নেই। ছাত্রী সংঘের কল্যাণী দাস, কমলা দাশগুপ্ত, শোভারাণী দত্ত, সতারাণী দত্ত, কমলা দাস, রেণু সেন—অনেককেই ধরা হল সন্দেহক্রমে।

শুরু হল মামলা। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মেয়েদের মামলায় জড়ানো সম্ভব হল না, তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ছেড়ে দিতে হল আপাততঃ। ছাত্রী সংঘের মেয়েদের অবদানের কথা তোমাকে আমি শোনাব আরো পরে।

মোট দুটি মামলা। একটি কেবলমাত্র দীনেশের বিরুদ্ধে, অন্যটি বাকি সবার বিরুদ্ধে। দীনেশের সাজার কথা তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

দীনেশচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের অন্যতম আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র শান্তভাবেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। যুবকটির বয়স মাত্র ২২ বৎসর। দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র ছিলেন।

[ভারতবর্ষ : কার্তিক : ১৩৩৭ সাল]

এবার দ্বিতীয় মামলা। এ মামলার জন্য বিশেষভাবে গঠিত স্পেশাল ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যান হলেন মিঃ এইচ. পি. স্টর্ক। বাকি দুজন আশুতোষ ঘোষ ও আদিত্যুজ্জমান খান।

অভিযোগ, বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ রাখা ও ইয়োরোপীয়ান এবং পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

নীলাদ্রি চক্রবর্তী, যার বাবার কারখানায় বোমার সেল তৈরি করা হয়েছিল, তাকে আসামীর তালিকা থেকে রেহাই দিয়ে ডাকা হল সাক্ষী হিসেবে। তাছাড়া রাজসাক্ষী হলেন আরো দুজন। সীতাংশু সরকার ও ব্রজদুলাল সেন। সাধারণ সাক্ষীর সংখ্যা প্রায় শতাধিক। তারপর একদিন মহামান্য আদালত রায় প্রকাশ করলেন আসামীদের বিরুদ্ধে।

কলিকাতা বোমার মামলায় কঠোর দণ্ডাদেশ

গতকল্য আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে কলিকাতা বোমা ষড়যন্ত্রের মামলায় রায় দেওয়া হইয়াছে। ১০ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের উপর ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। আসামী অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শরৎচন্দ্র দত্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় এম. বি. কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার। ইনি ও ডাঃ ভূপাল বসু এম. বি. উভয়েই ২০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রসিকলাল দাস ১৫ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

যতীশচন্দ্র ভৌমিক ও অম্বিকাচরণ, ওরফে নন্দ ও আদিত্যচরণ দত্ত ১২ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রোহিনীকান্ত অধিকারী ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। [আনন্দবাজার : ২৮-১১-৩১]

মামলার রায়ে বলা হল : ৭১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট ও সরস্বতী প্রেস হচ্ছে মূল কেন্দ্র, যেখান থেকে এই ষড়যন্ত্রের প্রেরণা এসেছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, অরুণ গুহ ও মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ।

এবার আপীল। আপীলে অবশ্য কিছুটা হেরফের হল। সেখানে ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসুর হল পনেরো বছর। সুরেন দত্তর বারো, আর যতীশ ভৌমিকের দু বছর। আর প্রমাণাভাবে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হল রসিক দাস, অদ্বৈত বর্মণ ও অম্বিকা রায়কে।

তবে এ মুক্তি মুক্তি নয়। তাই জেল গেটেই আবার গ্রেপ্তার করা হল বোমা ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়ক রসিক দাসকে। তারপর বিনা বিচারে আটক করে রাখা হল একটানা আট বছর। অদ্বৈত বর্মণ ও অম্বিকা রায়কেও আটক করে রাখা হল একই ভাবে।

অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত তখনো পলাতক। মাসতিনেক বাদে তিনিও একদিন ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দ রায়। পুলিশ তার হদিসই পায়নি কোনদিন।

দীনেশ ক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ভাল লাগে না এই অর্থহীন বন্দী জীবন। যে করে হোক, বাইরে গিয়ে আবার পার্টির কাজে লাগতে হবে।

তারিখটা ছিল ১৯৩২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী। রাত তখন গভীর।

বিচিত্র কৌশলে সঙ্গী সুশীল দাশগুপ্ত ও শচীন কর গুপ্ত সহ এক সময়ে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের উঁচু পাঁচিল টপকে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দীনেশ। তারপরই দে ছুট।

অনেক ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফরাসী চন্দননগরে। প্রথমে ডাঃ হীরেন্দ্র চ্যাটার্জীর গৃহে, পরে দাশরথি ঘোষের বাড়িতে। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন। একজন হিজলী বন্দীনিবাস থেকে পলাতক নলিনী দাস। অন্যজন বীরেন্দ্র রায়।

শান্তি ও বিশ্রামের আশাকে পেছনে ফেলে রেখে আবার দীনেশ ঝাঁপ দিলেন অশান্ত কর্মজীবনে। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। এগুলো একে একে শেষ করে ফেলতে হবে।

প্রথম কাজ—সরকারী স্টেটসম্যান সম্পাদক ওয়াটসনকে একটু শিক্ষা দেওয়া। প্রতিটি সংখ্যায় কি জঘন্য উক্তি সে করে চলেছে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে।

'No track with the terrorists. Give the dog a bad name to hang him' অর্থাৎ—বিপ্লবীদের কোনরকম খাতির নয়। সন্দেহ হলেই যে কোন একটা অপবাদ দিয়ে ওদের ঝুলিয়ে দাও।

৫ই আগস্ট অফিসের দরজায় ওয়াটসনকে পেয়ে আগুন ছড়ালেন যুগান্তর দলের অতুল সেন। না, হল না। আবার ট্রিগার টানতে হবে। তাও হল না। তার আগেই ছুটে এল প্রহরীর দল। ধরা দিতে অতুল সেন রাজী নন। তাই শেষ পর্যন্ত মুখে পুরে দিলেন সায়ানাইডের পুরিয়া। ব্যস, সব শেষ।

পরবর্তী আক্রমণ অনুষ্ঠিত হল পরের মাসের আঠাশ তারিখে। ঘায়েল হয়েও প্রাণে বেঁচে গেলেন ওয়াটসন। এ পক্ষে প্রাণ দিতে হল অনিল ভাদুড়ী ও মণি লাহিড়ী নামক দুজন বিপ্লবীকে।

এবার মানে মানে দেশে ফিরে গেলেন ওয়াটসন। কথায় বলে বারবার তিনবার। কাজ নেই বাপু ঝুঁকি নিয়ে। তার চাইতে বিলেতই ভাল।

এদিকে তখন হন্যে হয়ে উঠেছে পুলিশ। যে করে হোক, পলাতকদের গ্রেপ্তার করতেই হবে। নইলে মান-মর্যাদা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না সরকার বাহাদুরের।

সেদিন কি একটা কাজে দীনেশ এবং আরো কয়েকজন চুঁচুড়াতে গিয়েছিলেন সাইকেলে করে। হঠাৎ পেছন থেকে রব উঠল—পাকড়ো! পাকড়ো! আসামী ভাগতা হ্যায়।

ধরা পড়লেন শচীন করগুপ্ত এবং আরো একজন। দীনেশ চোখের পলকে উধাও। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

দীনেশ মজুমদার, জিতেন গুপ্ত

'গত শনিবার চুঁচুড়ার নিকট গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুই জন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনকে শচীন করগুপ্ত বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেল; হিজলী বন্দীশালা ও বক্সা বন্দীশালা হইতে যে সমস্ত আসামী পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৩ জন ব্যতীত অন্যান্য সকলেই পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই তিনজনের নাম জিতেন গুপ্ত (বক্সা

বন্দীশালা হইতে পলাতক), দীনেশ মজুমদার (মেদিনীপুর জেল হইতে পলাতক); নলিনী দাস (হিজলী বন্দীশালা হইতে পলাতক)।

দীনেশ মজুমদারের গ্রেপ্তারের জন্য ১৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। জিতেন গুপ্ত ও নলিনী দাস—প্রত্যেকের গ্রেপ্তারের জন্য ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার : ২২-১২-৩২]

দীনেশ তখনো চন্দননগরে।

সেদিন রাত্রে জোর পাঞ্জার লড়াই শুরু হয়েছে দীনেশ ও নলিনী দাসের মধ্যে। কার কব্জিতে কত জোর দেখা যাক। দীনেশ নামকরা লাঠিয়াল। নলিনী দাসও বরিশালের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। তাই কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে রাজী নয়।

হঠাৎ কি দেখে চমকে উঠলেন দীনেশ। পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! ফরাসী পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুঁ্য একদল পুলিশ সহ হাজির।

যদিও ফরাসী চন্দননগর ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সর্বত্রই এক। তাই মঁসিয়ে কুঁ্য তাদের গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর।

বাধ্য হয়েই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিতে হল দীনেশকে। ব্যাস, মঁসিয়ে কুঁ্য-র খেল খতম। আর তাকে চোখ মেলে তাকাতে হল না এ জীবনে।

একত্র তিনজন বেরিয়ে পড়লেন দাশরথি ঘোষের বাড়ি থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন নলিনী দাস। ছুটতে ছুটতে এক সময়ে তিনি ছিটকে পড়লেন চুঁচুড়ার দিকে। দীনেশ উত্তরপাড়া হয়ে এক সময়ে পৌঁছে গেলেন কলকাতায়।

এড়াতে পারলেন না বীরেন্দ্র রায়। তিনি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন একটা জঙ্গলের মধ্যে।

সেদিন খুব কাছ থেকে দীনেশকে যিনি দেখেছিলেন, তিনি হলেন সুভাষ-গুরু আচার্য বেণীমাধব দাসের কন্যা ছাত্রী সংঘের কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)। দীনেশ ছিলেন এই ছাত্রী সংঘের লাঠি খেলার শিক্ষাগুরু। এ সম্বন্ধে আমাকে লিখিত কল্যাণীদির একটা দীর্ঘ চিঠি থেকে কিছুটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

'সবে মাত্র আট মাস জেল খেটে ফিরেছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, দীনেশবাবু নাকি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়েছেন। কোথায় আছেন তার কোন সন্ধান নেই।

সন্ধান পেলাম আরো কিছুদিন পরে। তিনি তখন চন্দননগরে। সঙ্গে রয়েছেন আরো দুজন পলাতক বিপ্লবী। নলিনী দাস ও বীরেন্দ্র রায়।

সুলতা (লেখিকা সুলতা কর) এবং আমি অনেকদিন ওখানে গিয়েছি হাতে শাঁখা পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে—কনে বউ সেজে। শ্যামনগর গিয়ে ওখানে থেকে নৌকা করে ওপারে যেতাম। কোন কোনদিন ফেরা সম্ভব হত না। ফিরে আসতাম পরদিন ভোরে। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলতাম—দূরের একটা স্কুলে প্রাইজ দিতে গিয়েছিলাম।

…আমাদের ছাত্রী সংঘে তখন অনেক মেয়ে এসেছে। আমার মার প্রতিষ্ঠিত সরলা পুণ্যাশ্রমেও বেশ কিছু মেয়ে তৈরি করেছি। যখন প্রয়োজন ডাক দিলেই হল।

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি ঠিক করাই ছিল। একটা ঘর আর রান্নাঘর। আশ্রমের একটি মেয়ে সুগতাকে জানালাম, বোন সেজে একজন পলাতক বিপ্লবীকে নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। প্রস্তুত হও।

তখুনি সে জামাকাপড় নিয়ে চলে এল। একবারও ভাবল না যে, কত বড় ঝুঁকি সে নিতে চলেছে।

নিজে খৃষ্টান বড়দিদি সাজলাম। প্রশ্নের উত্তরে ওখানকার সবাইকে জানালাম, ভাইয়ের যক্ষ্মা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এনেছি। সঙ্গে ছোটবোন থাকবে।

পরে যখন শুনলাম, দীনেশবাবুর সত্যিই যক্ষ্মা হয়েছে, তখন যে মনে কি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম, তা ভাষায় বোঝাবার নয়।

টালিগঞ্জে বেশীদিন থাকা গেল না। নিয়ে আসা হল মুসলমান পাড়া লেনের একটা বাড়িতে। মেছুয়াবাজারের একটা বাড়িতেও রইলেন কিছুদিন। দিনের আলোতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যেতাম সন্ধ্যার পরে—বৌ সেজে।' [অগ্নিযুগ : কল্যাণী ভট্টাচার্য]

দীনেশ তখন অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। দেখে মনে হয়, এ যেন আগেকার সেই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর দীনেশ নন, সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

তা বলে তিনি কিন্তু চুপ করে বসে নেই। মাথায় তখন একটি মাত্র চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে বারবার। টাকা চাই ; পার্টি'র জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা।

গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের সই জাল করে পাওয়া গেল সাতাশ হাজার টাকা। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কর্মী ও বন্ধু কানাই ব্যানার্জী'র ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রী সংঘের মেয়েদেরও সেদিন কম মূল্য দিতে হয় নি দীনেশের জন্য। দীনেশ শুধু তাঁদের সহপাঠী বন্ধু নন, গুরুও বটে। হাজার প্রতিকূলতা ঠেলেও উপযুক্ত গুরুকে যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা দিতে সেদিন তাঁরা পিছিয়ে

থাকেন নি। এ প্রসঙ্গে কল্যাণীদি কি লিখেছেন দেখা যাক।

'পার্টির প্রয়োজনে সেদিন সই জাল করে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হল। আমাদের বাড়ীতে বসেই টাইপ এবং সই করা টাকা তুলে জমা রাখা ইত্যাদি হল। দীনেশবাবুর নির্দেশে টাকাটা মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে রাখা হল।

সুহাসিনী একটি খাঁটি হীরে। তার কাছেই বেশী টাকা রাখা হল। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও সব গচ্ছিত টাকা এনে দিল।

বৌদি শ্রীমতী সুধা দাসও নিজেকে বিপন্ন করে স্নেহের দাবীতে কিছু রক্ষা করেছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশীয় বোন লীলা কামলে সমস্ত শক্তি দিয়ে বিপ্লবী-দলকে সমৃদ্ধ করল। দীনেশবাবুকে কি শ্রদ্ধার চোখেই না সে দেখেছিল।

অমিয়া আমার সঙ্গেই জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল আমাদের দলে। আবার ধরা পড়ল গ্রিণ্ডলে ব্যাংক-এর কেসে। লীলাকেও ধরল। শেষ পর্যন্ত ওকে বহিষ্কার করে দিল বাংলাদেশ থেকে।

সুলতা আট মাস জেল খেটে এসে আবার ধরা পড়ল গ্রিণ্ডলে ব্যাংক-এর ব্যাপারে। প্রভাত নলিনীদিকে নিয়ে এলাম আগুনের পাশে। ধরা পড়লেন। অসুস্থ হয়ে অন্তিমশয্যা নিলেন হাসপাতালে।

শোভারাণী বার্জ মার্ডার কেসে ধরা পড়ল। ফিরল সে রাঁচীর পাগলা গারদ থেকে। কি যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না ওর জীবন শেষ হল।

এমনি কত মেয়েই না এল। বিভা, বনলতা, শান্তি রায়, উমা বসু, সুহাসিনী সেন, শান্তিসুধা ঘোষ, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা—এমনি আরো কতজন।

বনলতা রিভলবার সহ ধরা পড়ল ডায়োসেসন কলেজ হোস্টেলে। আর ধরা পড়ল জ্যোতিঃকণা দত্ত। রিভলবারের গুলি পাওয়া গিয়েছিল তার কাছেই। কি অমানুষিক নির্যাতনই না সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল জ্যোতিকণাকে, কিন্তু কিছুতেই পুলিশ পারে নি ওর মুখ থেকে একটি কথা বের করতে।

আভা দে বহরমপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি ভীষণ জীবন সংগ্রাম, তবু গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা আগলে রেখেছিল যক্ষের মত। আমি জেল থেকে ফেরার পরে আর দেখা হল না। জীবন দীপ নিভে গেল। প্রভাত নলিনীদিকেও আর দেখতে পেলাম না।

—দীনেশবাবুকে তখন সত্যি দুরারোগ্য রোগে ধরেছে, তবু গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের সেই টাকা থেকে একটি পয়সাও তিনি নিজের জন্য খরচ করতে রাজী নন। তাই ভয়ে ভয়ে নিজে থেকেই একপোয়া দুধের ব্যবস্থা করলাম। বীণা, কমলা, সবাই তখন জেলে। মা-বাবাকে লুকিয়ে টিউশনী করি।

তাই দিয়ে দুধের ব্যবস্থা।

কতদিন গিয়ে দেখেছি, জ্বরে বেহুঁশ। মাথার কাছে সাবুর বাটি শুকিয়ে পড়ে আছে। একদিন যেতেই গম্ভীরভাবে বললেন—দুধের ব্যবস্থা আপনি করেছেন। আমার মত যেখানে যত পলাতক বিপ্লবী রয়েছে, পারবেন আপনি তাদের সবার জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে। তা না হলে কাল থেকে এসব আর আনতে যাবেন না।

—দীনেশবাবুর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। এর ক'দিন বাদে আমিও ধরা পড়ে গিয়েছিলাম পুলিশের হাতে।'

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে কল্যাণীদির বক্তব্যের সমর্থনে আমি এখানে কিছু টুকরো টুকরো পেপার কাটিং তুলে ধরছি তোমার সামনে।

কুমারী জ্যোতিঃকণা দত্ত

কুমিল্লার বাড়িতে খানাতল্লাস

'কুমিল্লা, ৩রা আগস্ট—কালীকচ্ছের শ্রীযুক্ত উল্লাসকর (আলিপুর বোমার মামলা) দত্তের পিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্তের বাড়িতে অদ্য খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ যে, কলিকাতায় ডায়োসেসন কলেজের ছাত্রী-নিবাসে কুমারী জ্যোতিঃকণা দত্তের গ্রেপ্তার সম্পর্কেই এই খানাতল্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুমারী জ্যোতিঃকণা দত্ত অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্তের পৌত্রী।'

কুমারী বনলতা দাশগুপ্তা ধৃতা

'গত বুধবার ডায়োসেসন কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী জ্যোতিঃকণা দত্তের গ্রেপ্তারের পর যে ছাত্রীটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহার নাম কুমারী বনলতা দাশগুপ্তা। কুমারী দাশগুপ্তা চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী।' [আনন্দবাজার : ৫-৮-৩৩]

কুমারী কল্যাণী দাস

পুনরায় হাজত বাস

'ডায়োসেসন কলেজ হোস্টেলে রিভলবার ও পিস্তল প্রাপ্তির অভিযোগ সম্পর্কে শ্রীমতী কল্যাণী দাস গ্রেপ্তার হন। বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. কে. বিশ্বাস তাঁহার প্রতি পুনরায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হাজত বাসের আদেশ দিয়াছেন।'

[আনন্দবাজার : ১-৯-৩৩]

কুমারী কল্যাণী দাস

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সং ফোঃতে গ্রেপ্তার

'ডায়োসেসন কলেজ হোস্টেলে দুইটি রিভলবার ও দুইটি পিস্তল প্রাপ্তি

সম্পর্কে কুমারী কল্যাণী দাস বি. এ. কে (কুমারী বীণা দাসের ভগ্নী) গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত সোমবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট প্রমাণাভাবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁহাকে বঙ্গীয় সং ফোঃতে গ্রেপ্তার করে।'

অর্ডিন্যান্সে বনলতা দাশগুপ্তা

'ডায়োসেসন কলেজের ছাত্রীনিবাসে রিভলবার প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত উক্ত কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতিঃকণা দত্তকে গত সোমবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর আলিপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ. আর. সেনের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে ধৃতা অপর ছাত্রী শ্রীমতী বনলতা দাশগুপ্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তিদান করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হয়।

[আনন্দবাজার : ৫-৯-৩৩]

কুমারী জ্যোতিঃকণার ৪ বৎসর কারাদণ্ড

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায়

'গত বুধবার আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. আর. সেন ডায়োসেসন কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতিঃকণা দত্তকে বিনা লাইসেন্সে দুইটি রিভলবার, দুইটি পিস্তল ও ৫০টি কার্তুজ রাখিবার অভিযোগে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন।

জ্যোতিঃকণার বিদ্যার্জন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।'

[আনন্দবাজার : ২৬-১০-৩৩]

গ্রিন্ডলে ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলা

'গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক প্রতারণা সম্পর্কে ধৃত শ্রীযুক্তা সুলতা কর বি. এ. আশুতোষ কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী লীলা কামলে (মহারাষ্ট্র বালিকা) ও শ্রীযুক্তা অমিয়া গাঙ্গুলীকে গত মঙ্গলবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. কে. বিশ্বাসের এজলাসে হাজির করা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে আগামী ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত পুলিশ হাজতে থাকিবার আদেশ দেন। উক্ত মহিলাদিগকে গত ২৭শে ডিসেম্বর ভবানীপুর ও বালীগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হয়।'

[আনন্দবাজার : ৩-১-৩৪]

সুখী ও নিশ্চিন্ত গৃহকোণ ছেড়ে সেদিন যারা অগ্নিঝরা পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কিন্তু মোটেই কম ছিল না মল্লিকা।

কল্যাণী দাসের ছোট বোন বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়) পারুল মুখার্জী, ননীবালা দাস—এঁদের ইতিহাস তো তুমিও জান।

আর আড়াল থেকে যারা সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা তো হিসেবের বাইরে। দুর্ভাগ্য, তাদের কাহিনী আড়ালেই রয়ে গেল চিরদিন। যাক, আগেকার কথায় ফিরে যাই।

১৯৩৩ সাল।

দীনেশকে তখন রাখা হয়েছে দর্পণা সিনেমার কাছাকাছি ১১৬।৪এ, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সঙ্গে রয়েছেন সেই পলাতক বিপ্লবী নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জী।

এদিকে পুলিশ তখন অত্যন্ত তৎপর। বিশেষ করে চন্দননগরের ঘটনার পর থেকে তৎপরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হন্যে হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে বাংলা দেশের সর্বত্র। যে কোন মূল্যে হোক, দীনেশ মজুমদারকে চাই-ই।

১৯৩৩ সালের ২২শে মে। ভোর তখন প্রায় পাঁচটা।

কি একটা সূত্রে খবর পেয়ে সেদিন বিরাট এক পুলিশবাহিনী সেখানে গিয়ে হাজির। আজ তুমি কোথায় যাবে দীনেশ মজুমদার! হয় আত্মসমর্পণ কর, নয়তো মৃত্যু অনিবার্য।

অসুস্থতা সত্বেও শেষবারের মত দপ্ করে জ্বলে উঠলেন দীনেশ। মৃত্যু হয় তো হোক, তবু আত্মসমর্পণ কোন মতেই নয়।

শুরু হল তীব্র সংঘর্ষ। একদিকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। অন্যদিকে ভয়লেশহীন তিনটি মাত্র যুবক। তবু তারা লড়াই চালিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলি শেষ। তাই আহত অবস্থায় তিনজনকেই ধরা পড়তে হল একে একে।

এবার বিচার। বলা বাহুল্য, এবার আর কোনরকম ঝুঁকি নিলেন না সরকারবাহাদুর। তাই ১০ই অক্টোবর দীনেশের সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

নলিনী দাসের সাজা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। শিগগীরই আর একবার তাঁকে দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। সংবাদপত্রের ভাষায়:

দ্বীপান্তরের উপর আর এক দফা

নূতন অভিযোগে নলিনীমোহন দাস

'কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গুলি যুদ্ধের মামলায় বরিশাল জেলার দাদপুর (গোবিন্দপুর), থানা হিজলা এবং ভোলা নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের পুত্র নলিনীমোহন দাসের প্রতি মঙ্গলবার আলিপুর স্পেশাল

ট্রাইবিউনাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

১২ই অক্টোবর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ—বরিশালের সেসন জজ মিঃ ডবলিউ ম্যাকশার্প আই. সি. এস (প্রেসিডেন্ট), পাবনা—বগুড়ার সেসন জজ শ্রীযুক্ত কমলাচন্দ্র চন্দ আই. সি. এস. এবং বাখরগঞ্জের সদর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী সৈয়দ সালামতুল্লাকে লইয়া গঠিত একটি স্পেশাল ট্রাইবিউনালে নলিনীমোহন দাসের আবার বিচার হইবে।'

নলিনীমোহন হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দী ছিল। সিংগা ডাকাতি মামলায় তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু বন্দীশালা হইতে পলায়ন করে বলিয়া তাহার তখন বিচার হইতে পারে নাই। বর্তমান স্পেশাল ট্রাইবিউনালে ঐ সম্পর্কে আনীত অভিযোগে তাহার বিচার হইবে।

[আনন্দবাজার : ১২-১০-৩৩]

এবার দীনেশের পক্ষ থেকে আপীল করা হল হাইকোর্টে। ১৫ই জানুয়ারী আপীল অগ্রাহ্য করলেন মহামান্য হাইকোর্ট। এরপর প্রিভি কাউন্সিল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। সেই ফাঁসির আদেশই বহাল রইল যথারীতি। সংবাদপত্রের বিবরণ :

প্রাণ দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দীনেশ মজুমদার

প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য

'এলাহাবাদ, ২৪শে এপ্রিল, এক বিশেষ তারের সংবাদে প্রকাশ, দীনেশচন্দ্র মজুমদার তাহার প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের জন্য যে আবেদন করিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দীনেশ মজুমদারের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। সে দণ্ডভোগ কালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে, কিন্তু পরে উত্তর কলিকাতার এক বাড়িতে ধৃত হয় এবং স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।'

[আনন্দবাজার : ২৫-৪-৩৪]

সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল ৯ই জুন ভোর রাত্রে।

আরো আগেই হত, হতে পারেনি দীনেশের অসুস্থতার জন্য। সর্বক্ষণ জ্বরে বেহুঁশ প্রায়। সেদিন জ্বরটা একটু কম ছিল, সংগে সংগে তৎপর হয়ে উঠল জেল কর্তৃপক্ষ। আর দেরি করা ঠিক নয়। দাও এবার ঝুলিয়ে।

যথাসময়ে দীনেশের ফাঁসির খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রের পাতায়।

দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি

শনিবার শেষ রাত্রিতে

'গত শনিবার শেষ রাত্রিতে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দীনেশ মজুমদারের

ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে (ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা) দীনেশের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। দণ্ড ভোগ কালে সে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করে।

অনেকদিন পর কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এক বাড়িতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সহিত তাহার লড়াই হয়। দীনেশ যে ঘরে ছিল, সেই ঘর হইতে নিক্ষিপ্ত রিভলবারের গুলিতে মুকুন্দ ভট্টাচার্য নামক জনৈক পুলিশ কর্মচারী আহত হন।

গত ১০ই অক্টোবর আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে দীনেশের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৫ই জানুয়ারী (ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে) কলিকাতা হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেন।' [আনন্দবাজার : ১২-৬-৩৪]

এই হল সেদিনের আনন্দবাজার পত্রিকার খবর। এবার বর্তমান কালে প্রকাশিত একটি খবরের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মল্লিকা।

শহীদ স্মৃতি তর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার: শনিবার বিনয়-বাদল-দীনেশবাগে শহীদ অনুজা সেন ও দীনেশ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।—১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে গুলি করতে গিয়ে এই দুই বীর বিপ্লবী পুলিশের পালটা গুলিতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

[আনন্দবাজার : ২৮-৮-৭৯]

দুটি বিবরণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছ কি। লক্ষ্য করো, প্রথমবার দীনেশ প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসি মঞ্চে। পরের বার পুলিশের গুলিতে।

তবে দীনেশের ব্যাপারে সব চাইতে বেশী উদারতা দেখিয়েছে ভারত সরকারের ইতিহাস। তারা তাঁকে আরো দুবছর বাঁচিয়ে রেখে ফাঁসি দিয়েছে ১৯৩৬ সালে।

এরপর অসিত ভট্টাচার্য। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র অসিত ভট্টাচার্য। জালালাবাদ পাহাড়ে মেসিনগানের গুলিতে নিহত বিধু ভট্টাচার্যের নিকটআত্মীয় অসিত ভট্টাচার্য। ফাঁসির তারিখ ১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই। স্থান—শ্রীহট্ট জেল।

ব্যস, এইটুকুই। অনেক চেষ্টা করেও গত ক'বছরে এর চাইতে বেশী কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি লেসিয়ারা গাঁয়ের অসিত সম্বন্ধে। তবে বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন, 'অসিত সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কিছু

জানতে হলে বিরাজ দেবকে ধরুন। অসিত সম্বন্ধে ও'র কথাই হল শেষ কথা।'

—কোথায় থাকেন তিনি ?

—ভগবান জানেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ একদিন এসে উদয় হন, তারপরই আবার উধাও।

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হল না।

অবশ্য দেশ স্বাধীন না হলে খুঁজে পাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ, পঁয়তাল্লিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এখনো তাঁর শেষ হত না। অগ্নিযুগের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটা একটা রেকর্ড। বিরাজ দেব ছাড়া আর কেউ এত দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই।

ব্যাপারটা সাহিত্যিক বন্ধু মনোরঞ্জন ঘোষ জানতেন। মাস কয়েক আগে হঠাৎ তিনি একদিন অপরিচিত এক ভদ্রলোক সহ এসে হাজির। বললেন আসামী বিরাজ দেব হাজির। এবার অসিত সম্বন্ধে কি বলতে চান বলুন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির দিকে। দেহে কোথাও বয়েসের ছাপ পড়েনি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি বেশ কিছুটা ক্ষীণ।

যাক, শহীদ অসিত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বিরাজবাবুর বক্তব্য আমি তাঁর জবানী থেকেই তোমাদের শোনাচ্ছি মল্লিকা।

''অসিত আর আমি সমবয়সী ছিলাম।—একই মামলায় অসিতের প্রাণদণ্ড আর আমার পঁচিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছিল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অসিতের সঙ্গে ফাঁসির সেলে আমার কয়েক ঘণ্টা কথা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ দিনটিতে আমি তাঁর কাছাকাছি একই জেলে থাকতে পারিনি।

সিলেট্ জেল থেকে আমাকে কুমিল্লা-ঢাকা-প্রেসিডেন্সী জেল ঘুরিয়ে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। আন্দামান সেলুলার জেলেই আমি অসিতের ফাঁসির সংবাদ শুনি। অসিত ভট্টাচার্যই ত্রিপুরার প্রথম শহীদ, যে 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান।'

অসিতের বয়েস যখন সতেরো-আঠারো, তখন কুঠিগ্রামে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে ছিল পড়াশুনোয় যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। কসবা ও কুঠিগ্রামে বিপ্লবীদের গুপ্তকেন্দ্র ছিল এবং এই কেন্দ্রের সঙ্গে অসিতের সংযোগ ছিল।

সে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শুরু হয়েছে এক রক্তরাঙা অধ্যায়। বাংলায় বিভিন্ন জেলায় তখন বিদ্যুতের মত চমক লাগিয়ে প্রায়ই গর্জন করে উঠছে বিপ্লবীদের বোমা-রিভলবার,—আর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ব্রিটিশ শাসনের এক একটি স্তম্ভ। এমনি একটি স্তম্ভ কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসন লুটিয়ে পড়লেন বিপ্লবী বালিকাদ্বয় শান্তি-সুনীতির রিভলবারের গুলিতে।

শান্তি-সুনীতির এই কাজের পেছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ধরার জন্য পুলিশ উঠেপড়ে লাগল। কুমিল্লার বহু বিপ্লবী বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন করলেন।

আমাদের কালীকচ্ছ গ্রামে লুকিয়ে রইলেন বারীন ঘোষ, বিনয় দত্ত ও সতীশ রায়। আমার মাধ্যমে তাঁরা গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে চিঠিপত্রের সাহায্যে যোগাযোগ রাখতেন। এই কাজ করতে গিয়ে আমি কসবা ও কুঠিগ্রামের সংযোগ রক্ষাকারী অসিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি।

একদিন কালীকচ্ছে আত্মগোপনকারী তিনজন বিপ্লবীকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করে ফেলল পুলিশ। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের এই গ্রেপ্তারে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমরা। উল্লাসকর দত্ত (আলিপুর বোমার মামলা) ও অশোক নন্দীর জন্মভূমি কালীকচ্ছ গ্রামের বিপ্লবী ঐতিহ্যের এতবড় অপমান!

কে পুলিশকে বিপ্লবীদের সন্ধান দিয়েছে? সেই গুপ্তচরের নাম খুঁজে বের করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমরা প্রস্তুত হলাম।

১৯৩২ সালের ২০ শে নভেম্বর রাত্রে আমি ও ধীরেন চক্রবর্তী গুলি করে সেই গুপ্তচরটিকে হত্যা করলাম। পুলিশ আমাদের সন্ধান করে। আমি কুমিল্লা জেলা ত্যাগ করে সিলেটের সীমানায় ছাতিয়ান গ্রামে আত্মগোপন করে থাকি। এখানে কিছু তরুণকে দলভুক্ত করে গুপ্তকেন্দ্র গড়ে তুলি। এরপর চলে যাই হবিগঞ্জের কাছে রতনপুর গ্রামে।

আমার আত্মগোপনকালে অসিত আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। দলের নেতৃস্থানীয় দাদারা বিশেষ কেউ আর বাইরে নেই। দায়িত্ব এসে পড়ে আমার কাঁধে। নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়।

সমস্যার মধ্যে অর্থ সমস্যাই সবচেয়ে বড়। সেটা সমাধানের জন্য আমি ও অসিত দুজনেই আগ্রহী হয়ে উঠি। দলের বিশিষ্ট নেতা প্রমোদ দাসের সঙ্গে একদিন আলোচনা করলাম। সরকারী টাকা লুণ্ঠনের জন্য আমরা কয়েকজন সাহসী তরুণ প্রস্তুত হলাম। অসিত সিলেটের গ্রামে আমার আস্তানায় অন্যদের নিয়ে এল।

১৯৩৩ সালের ১৩ই মার্চ দোলের দিন আমরা আসামের ইটাখোলা স্টেশনের মেলভ্যান থেকে টাকা ছিনিয়ে নিলাম। নির্বিঘ্নে কার্য সমাধা করে আমরা

ছয়জন (অসিত ভট্টাচার্য, বিরাজ দেব, বিদ্যাধর সাহা, গৌরাঙ্গ দাস, মনোমোহন সাহা ও মহেশ রায়) স্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে আসি।

খানিক দূরে দৌড়ানোর পর সামনে পাহাড় দেখে বুঝতে পারলাম যে, আমরা পথ ভুল করেছি। তারপর আরও একটি মারাত্মক ভুল করলাম পেছনে ফিরে এসে নতুন করে পথ খুঁজতে গিয়ে। ইতিমধ্যে সারা অঞ্চলে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। পুলিশ চারদিকে পলাতকদের সন্ধান শুরু করে দিয়েছে।

ইটাখোলায় কিছু কলকারখানা ছিল। দোলের ছুটি বলে সেদিন পথে অনেক লোক রঙ খেলতে বেরিয়েছিল। তারা আমাদের দেখতে পেয়ে যায় এবং সাধারণ ডাকাত মনে করে। আমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে— আমরা ডাকাত নই, এই টাকা দেশের কাজের জন্য নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারী পুরস্কারের লোভে তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে।

বেশ খানিকক্ষণ দৌড়ানোর পর দেখতে পেলাম সামনের পথও অবরুদ্ধ। একটা বিরাট পুকুর কাটা হচ্ছিল। সেখানকার কর্মরত মজুররা গোলমাল শুনে কোদাল-শাবল নিয়ে ছুটে আসে। আমাদের পেছনে একদল লোক, সামনেও একদল লোক। তখন আমরা ঠিক করলাম, সবাই একসঙ্গে না থেকে ছড়িয়ে পড়ব এবং যে-যেদিক পারি ছুটে পালাব।

ইতিমধ্যে একজন অসিতকে একটি সড়কি ছুঁড়ে মারল। সেটা তার পায়ের ডিমকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে মাটিতে গেঁথে যায়। অসিত ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে গুলি করে। লোকটি পড়ে যায়। মারাত্মকভাবে আহত অসিতও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে যায়।

আমিও পথ করে নেবার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হলাম। আমার গুলিতে জনকয়েক পড়ে যায়। কিন্তু আমিও ধরা পড়ি। একে একে আমাদের চারজন ধরা পড়ে। শুধু মহেশ রয়ে আর মনোমোহন সাহা নিরাপদে পালাতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের ২২ শে জুলাই শুরু হল বিচার।

ইটাখোলা ডাকাতির মামলা ভীড়ের ভয়ে কোর্টে না হয়ে সিলেট জেলের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছিল, কিন্তু জেলে ফ্যান না থাকায় কয়েকদিন পরে মামলা কোর্টে পাঠানো হয়। আমাদের দেখার জন্য সেখানে এত বেশী জনসমাগম শুরু হল যে, ক'দিন বাদে মেডিক্যাল কলেজের নতুন বাড়িতে স্পেশাল কেস স্থানান্তরিত করা হয়।

ভীড় এড়ানোর জন্য আমাদের মামলা কোন কোনদিন সাত-সকালেই শুরু হত। রায় দানের দিন ভীড় দেখে জজ রায় না দিয়ে কাগজপত্র কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেন। তখন আসামে কোন হাইকোর্ট ছিল না।

বিচারে অসিতকে দেয়া হল মৃত্যুদণ্ড। বিদ্যাধর সাহা, গৌরাঙ্গ দাস আর আমাকে দেয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিচারের ব্যাপারে আমাকে নিয়ে বাংলা ও আসাম সরকারের মধ্যে বেশ টানা-পোড়েন চলে। আসাম সরকার চায়—মেল ডাকাতির বিচার করতে। এদিকে বাংলা সরকার চায়—কালীকচ্ছ গোয়েন্দা হত্যা মামলার বিচার করতে। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লায় একটি ট্রাইবিউনাল গঠন করা হয়। দুটি মামলায় সাজা দেয়া হল মোট পঁয়তাল্লিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

সিলেট জেলের জেলার আমাদের গ্রামের লোক বলে অসিতের ফাঁসির হুকুম হবার পর তাঁর সেলে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক কথা বলার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কথা বলব কি! কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে। মৃত্যু পথযাত্রী অসিত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বলেছিল—'আমার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। মরণ জেনেই তো এ পথে এসেছি। আপনারা জেল থেকে বেরিয়ে আবার কাজ শুরু করে দেবেন। আমার জন্য অনুতাপ করবেন না।'

শুনেছি ফাঁসি মঞ্চে উঠে অসিত নাকি বলেছিল—"হে ভারতবাসী বন্ধুগণ, স্বাধীনতার জন্য আমি দেশমাতৃকার বেদীমূলে নির্ভয়ে আত্মবলি দিচ্ছি। তোমরাও এর জন্য প্রস্তুত থাকবে। বন্দেমাতরম।"

[অনুলেখন : মনোরঞ্জন ঘোষ]

একটি অবিস্মরণীয় রেকর্ড। এমন রেকর্ড আর কেউ কোনদিন করতে পারেনি আমাদের দেশে।

ইংরেজ এখন দিশেহারা। এত ফাঁসি, এত দ্বীপান্তর, তবু কি দুরন্ত বাংলার এই যুবশক্তি। পরপর দুজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ওরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে মেদিনীপুরে। আরও কতজনকে যে বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে কে জানে! কিন্তু না, কোনরকম দয়া বা অনুকম্পা নয়। যে করে হোক; ওদের নিঃশেষ করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত বাংলার গভর্ণর হিসেবে নিয়ে আসা হল দুর্ধর্ষ শাসক স্যার জন এণ্ডারসনকে। বিপ্লবীদের সায়েস্তা করতে নাকি তাঁর জুড়ি নেই। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনফিন আন্দোলন দমনের ব্যাপারেই তার প্রমাণ মিলেছে বারবার।

এসেই চ্যালেঞ্জ জানালেন স্যার জন এণ্ডারসন। মনে হয়, মেদিনীপুরের টেররিস্টরা আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে, কোন জেলা শাসককেই তারা জীবিত থাকতে দেবে না। বেশ; আমরা তাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।

মারাত্মক দমননীতির ফলে বাংলার যৌবন তখন কারারুদ্ধ। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে কারাগারে বন্দী। কেউ বা বিচারের প্রহসনে, কেউ বা বিনা বিচারে।

তবু এণ্ডারসনের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মেদিনীপুর। তাদের এক কথা, গুরু দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেবার বদলা আমরা নেবই। কোন শ্বেতাঙ্গ শাসককেই আমরা মেদিনীপুরে থাকতে দেব না। যে আসবে তাকেই আমরা খতম করবো।

১৯৩১ সালে আমরা জেলাশাসক পেডিকে খতম করেছি। ১৯৩২ সালে ডগলাসকে। ১৯৩৩ সালে হ্যাটট্রিক করে দেখিয়ে দেবো যে, চ্যালেঞ্জের জবাব আমরা দিতে পারি কিনা।

ডগলাস হত্যার মামলার সহকর্মী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন। না হয় আমরাও দেবো। তা বলে তৃতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে আমরা কিছুতেই জীবিত ফিরে যেতে দেবো না মেদিনীপুর থেকে।

কাজেও তাই করা হল। কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের চার্চ প্রাঙ্গণে আর একটি নূতন কবর খুঁড়তে হল দুর্দান্ত জেলাশাসক পেডি ও ডগলাসের পাশে। অবশ্য তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছিল যথেষ্ট। দিতে হয়েছিল পাঁচ পাঁচটি তরুণ তাজা প্রাণ। সেই নিঃশেষ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, বিপ্লবী শপথ ফাঁকা আওয়াজ নয়।

ডগলাস হত্যা পর্যন্ত বৈপ্লবীক সংস্থা বি, ভির মেদিনীপুর শাখা পরিচালিত হতো কেন্দ্রীয় এ্যাকশন স্কোয়ার্ডের অন্যতম নেতা প্রফুল্ল দত্তের নেতৃত্বে। তবে আর বেশীদিন নয়। মাত্র কয়েকদিন, তারপরই একদিন তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছে আকস্মিকভাবে। তা বলে কাজ অবশ্য থেমে যায়নি। হাল ধরেছেন অপর কেন্দ্রীয় নেতা যতীশ গুহ।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রফুল্লদত্ত ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। বিনয়, বাদল, দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের নক্সাটি ছিল তাঁর নিজের হাতে করা। অপরপক্ষে যতীশ গুহ ছিলেন তরুণ আইনজীবী। দুজনেই তখন বাস করতেন কলকাতায়।

যথাসময়ে যতীশ গুহ গ্রীন সিগন্যাল দিলেন মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে। এগিয়ে যাও। মনে রেখো, এ পর্যন্ত আমাদের কোন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়নি। আশা করি এবারও তা হবে না। তৃতীয় জেলাশাসক বার্জ যেন কিছুতেই রেহাই না পায় তোমাদের হাত থেকে।

সমস্যা দেখা দিল ক্ষুদিরাম গুরু শহীদ সত্যেন বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান বসুকে নিয়ে। সেকি তাঁর আকুলি বিকুলি। তোমাদের মত সোনার টুকরো

ছেলেরা এভাবে একের পর এক প্রাণ দেবে, আর বুড়ো হয়ে আমি কিনা বারবার সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখবো। না, তা হয় না। হতে পারে না। এর একটা বিহিত তোমাদের করতেই হবে।

যতীশ গুহের বিশ্বস্ত সহকর্মী শ্রদ্ধেয় চিরঞ্জীব রায়ের লেখনী থেকেই সেই মধুর করুণ ইতিহাসের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"১৯৩৩ সাল। আবার ঘুরে আসছে মেদিনীপুরের 'এ্যানিভার্সারি ডে'। ম্যাজিস্ট্রেট নিধনের এ্যানিভার্সারী ডে। চলছে তার প্রস্তুতি।

এদিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় আমরা বিশেষভাবে আবেগে বিচলিত হ'লাম। বাঙলাদেশের অবিস্মরণীয় শহীদ সত্যেন বসুর ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর স্বদেশ প্রেম ও দেশসেবার ইতিহাস মেদিনীপুরবাসীর অজানা নয়। তিনি নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী। বয়স তৎকালে যথেষ্ট হয়েছে, তার উপর রুগ্নদেহ।

সত্যেন বসুর ভ্রাতা এই জ্ঞান বসুর প্রতি রক্তকণায় বৃদ্ধ বয়সেও বিপ্লবী-পরিবারের রক্ত প্রবাহিত ছিল। তার মনের যৌবন কানায় কানায় পূর্ণ। জ্ঞানবাবুকে কেউ বলেনি যে, বার্জ সাহেব বিপ্লবীদের পরবর্তী টার্গেট্। কিন্তু তিনি ধারণা করে নিয়েছেন যে, তাঁর কিশোর বন্ধুরা এবার সেই প্রোগ্রামই গ্রহণ করবেন। তাই বারে বারে প্রভাংশু ও ব্রজকে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন যে, এ যাত্রা তিনি নিজে যাবেন এ্যাকশানে। এ ব্যাপারে তিনি উতলা হয়ে উঠলেন।

কী তাঁর আকুতি! তিনি বারে বারে ব্রজদের বলছেন, কলকাতা থেকে 'বি-ভি'-র নেতাদের অনুমতি আনতে, তাঁকে এ্যাকশানের জন্য ছাড়পত্র দিতে। তিনি যাবেনই আগামী এ্যাকশানে।

শহীদ সত্যেনের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর অপেক্ষা করতে পারেন না। কত ছোট ছোট ভাইয়েরা আত্মদান করে গেলেন, আর তিনি এখনও শহীদ সত্যেনের পথে পা বাড়াতে পারলেন না?

প্রভাংশু এসে যতীশদাকে বললেন দিন না জ্ঞানদাকে অনুমতি। অতবড় ঐতিহ্যসমন্বিত পরিবারের এক বৃদ্ধের সঙ্গে আমাদের তরুণরা একত্রে এ্যাকশান করে ফাঁসি গেলে তার ইম্পেটাস হবে অভাবিত। মেদিনীপুর জ্বলে উঠবে, বাংলার রক্তে আগুন ছুটবে, ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হবে, সর্বোপরি ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ খান খান হয়ে যাবে"। [রক্তের অক্ষরে : পৃঃ-২১৯]

রাজী হতে পারলেন না যতীশ গুহ। জ্ঞানবাবুর দেশপ্রেম এবং মনোবল সবকিছুর উর্ধে। কিন্তু দেহ! আঘাত করতে গেলে পাল্টা আঘাত আসবেই। এ বয়সে এই রুগ্ন দেহ নিয়ে তখন তিনি সমানে সমানে পাঞ্জা কসবেন কি করে? এযে একেবারেই অসম্ভব।

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করা হল জ্ঞানবাবুকে। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন প্রথম সুযোগেই কৃতকার্য হতে পারি লক্ষ্য সাধনে

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। জানা গেল, ওদিন একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মহামেডান ভার্সাস টাউন ক্লাবের মধ্যে এবং সে খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন মিঃ বার্জ স্বয়ং।

সতর্কতার অন্ত নেই। মাঠের একদিকে জেলখানা, অন্যদিকে পুলিশ আর্মারি, তা সত্ত্বেও সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রচুর। জায়গাটা মেদিনীপুর। কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে। তাই সাবধান থাকাই ভাল।

ওদিকে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে বিপ্লবী মহলে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। চাই এমন দুটি আত্মনিবেদিত তরুণ, মৃত্যু যাদের কাছে একটা খেলামাত্র। কারণ মাঠে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকদের মাঝ থেকে জীবিত ফিরে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই মৃত্যু-অভিসারে যেতে কে কে রাজী আছ বল?

দেখা গেল, কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। সবারই এক দাবী, আমি যাব। এবার আমার পালা। শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হলেন দুজন। অনাথ পাঁজা আর মৃগেন দত্ত।

বিকেল পাঁচটা। মাঠের চারপাশে দর্শকদের ভীড়। অনাথ ও মৃগেনও মিশে রয়েছেন ভীড়ের মধ্যে। বার্জ তখনো আসেননি। এখুনি এসে পড়বেন বলে জানা গেছে।

সহস্য চঞ্চলতার ঢেউ জাগল দর্শকদের মধ্যে। ঐ যে বার্জ এসে গেছেন। ঐ যে তিনি নামছেন তাঁর গাড়ি থেকে।

দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! নিমেষে দুজনের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল দিক বিদিক কাঁপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বার্জ লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। অনাথ কিন্তু এখানেই থামলেন না। ভুলুণ্ঠীত বার্জের বুকের উপর চেপে বসে রিভলবারের বাকি বুলেটগুলোও তিনি চালিয়ে দিলেন বার্জের দেহে।

অনাথ ও মৃগেনের সারা মনে তখন একটা কুলপ্লাবি আনন্দ। একটা বিপুল পরিতৃপ্তি। তাদের হ্যাট্রিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। এবার আসুক আঘাত। আসুক মৃত্যু। তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত।

কাজেও তাই হল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তৎপর হয়ে উঠল সশস্ত্র প্রহরীর দল। মুহূর্তে তাদের রাইফেল আগুন ছড়াল দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!

ব্যস, সব শেষ। অনাথ, মৃগেন, বার্জ—পাশাপাশি তিনজনই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন মেদিনীপুরের মাটিতে।

ব্যর্থতার জ্বালায় উন্মাদ হয়ে গেল শাসক সম্প্রদায়। পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা! না আর কোন কথা নয়। একধারসে সবাইকে পেটাও, আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও মেদিনীপুরকে।

সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার করা হল নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, সুকুমার সেন, সনাতন রায়, কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিংহ প্রমুখ তরুণ বৃন্দকে। সেই সঙ্গে সুরু হল শহর জুড়ে অমানুষিক তাণ্ডব, যা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। শহীদ নির্মলজীবন ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বিনয়জীবন ঘোষের লেখনী থেকেই তার সামান্য অংশ তুলে

'মিঃ বার্জের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকমহল শহরবাসীর উপর বীভৎস জুলুম ও অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিল। শহরকে সৈন্যবাহিনীর আয়ত্তাধীন করা হল। নিরীহ পথচারীদের উপর মারধোর চললো। সাইকেল আরোহী-দের, তার মধ্যে কেউ কেউ উচ্চপদস্থ ভারতীয় সরকারী কর্মচারী, ধাক্কা দিয়ে রাস্তার উপর ফেলে নির্মমভাবে প্রহার করা হল। ভীতত্রস্ত শহরবাসী দৌড়ে যে যার ঘরে আশ্রয় নিল।

হত্যাকাণ্ডের তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্মলজীবন ঘোষকে (ডাকনাম—পায়রা) গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। শহরের আরও অনেক বাড়ি তল্লাসী করে প্রায় বিশজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হল।

আমাদের বাড়ি, আমাদের লাগোয়া দক্ষিণে দু'খানা বাড়ি, রাস্তার ওপারে সামনের দু'খানা বাড়ি এবং উত্তরে দুটো বাড়ি বাদ দিয়ে একটি রেস্তোরাঁ—এই ছ'খানা বাড়ির উপর সৈন্যবাহিনী অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল। ছ'খানি বাড়িতে একসঙ্গে দুড়দাড়, ঝনঝন করে জিনিস-পত্তর চুরমারের সে কি বিকট শব্দ।

কিছুক্ষণ পরে চিৎকার ও গোঙানির শব্দ শোনা যেতে লাগল। সুমুখের বাড়িতে গাড়োয়ালীরা পশুর মত নৃশংসতার সঙ্গে আমার সহপাঠী শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসুকে মারপিট করছিল। সব মিলিয়ে একটা করুণ হৃদয়বিদারক শ্বাসরোধকারী দৃশ্য। বেদম প্রহারের ফলে সে অজ্ঞান, মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে গাড়োয়ালীরা তাকে চ্যাংদোলা করে রাস্তার ড্রেনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের বুকে একটা ভীতি বিহ্বলতা ও আতঙ্ক চেপে বসল। শহর থেকে সরে পড়ার হিড়িক পড়ে গেল। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে, গাড়ি করে, এবং ট্রেনে অধিবাসীরা শহর ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। দুপুরের আগেই আমাদের দু'পাশের এবং সামনের শত শত বাড়ি খালি হয়ে খাঁ খাঁ করতে লাগল।" [বিপ্লবী মেদিনীপুর : পৃঃ-৪৯-৫৩]

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে শুরু হল বিচার। মোট তিনজন বিচারপতি। এইচ, জি, ওয়েট্ আই, সি, এস (চেয়ারম্যান) টি, এন, বসু এবং এস, পি ঘোষ।

প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও ভুল করলেন না শাসক সম্প্রদায়। যদিও আসামীদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই, অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যায়নি কারো কাছে, তবু এক অপরিণত বয়স্ক রাজসাক্ষীর বক্তব্যকে মূলধন করে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মলজীবন ঘোষ ও রামকৃষ্ণ রায়, এই তিনজনকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, সনাতন রায় ও সুকুমার সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বাদবাকি সবাই মুক্ত। সংবাদপত্রের ভাষায় :

তিনজনের প্রাণদণ্ড

মেদিনীপুর; ১০ই ফেব্রুয়ারী; অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ বার্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী (১) নির্মলজীবন ঘোষ (২) ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (৩) রামকৃষ্ণ রায়—এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। [আনন্দবাজার : পৃঃ-১২-২-৩৪]

যথাসময়ে আপিল করা হল হাইকোর্টে, কিন্তু লাভ হল না কিছুই। ফাঁসির হুকুমই বহাল রইল যথারীতি।

"১৯৩৪ সালের ৩০শে আগস্ট আপীল বেঞ্চ রায় দিলেন। দণ্ডিতদের সকলের আপীল অগ্রাহ্য ও স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের রায় পুরোপুরি সমর্থিত হল। মা; দিদিমা মাথা খুঁড়ে, বুক চাপড়ে দিনের পর দিন কেঁদে হাহাকার করতে লাগলেন। তাঁরা দুজনেই অন্নজল ত্যাগ করে শোকে মুহ্যমান অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ভাষায় সে শোকের, সে আর্তনাদের প্রকাশ সম্ভব নয়।

"দীর্ঘদেহী, সবল, সুপুরুষ, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, জ্বলন্ত, জীবন্ত—আমাদের পরম স্নেহের ও আদরের পায়রাকে (নির্মলজীবন) অকস্মাৎ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে এক অমোঘ নির্দেশে। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমাদের মত দণ্ডপ্রাপ্ত অপর যুবকদের বাড়িতেও দুঃখ শোকের অমানিশা যে নেমে এসেছিল, তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু কে কাকে সান্ত্বনা দেয়!" [বিপ্লবী মেদিনীপুর : পৃঃ-৬৩]

পৃথিবী কারো মুখ চেয়ে তার চলার গতি বন্ধ করে না। অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এল ১৯৩৪ সালের ২৫শে অক্টোবর। সেদিন ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ রায়কে হত্যা করা হল মেদিনীপুর জেলের ফাঁসিমঞ্চে।

পরদিন ২৬শে অক্টোবর নির্মলজীবন ঘোষ। কোন দুঃখ নেই। কোন ক্ষোভ নেই। ভিক্ষায় কোন দিনও স্বাধীনতা আসে না। তার জন্য মূল্য দিতে হয়। এমন কত জনই তো মূল্য দিয়েছেন, তাহলে দুঃখ কিসের!

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তা বলে মেদিনীপুর কিন্তু আজো ভোলেনি মৃত্যুঞ্জয়ী সেই শহীদবৃন্দকে। তাই এখানে-ওখানে সর্বত্র দেখা যায় শহীদদের অসংখ্য আবক্ষ মূর্তি। তাই বুঝি মেদিনীপুর শহরের আর এক নাম আজ 'City of statues'.

পরবর্তী শহীদ মতি মল্লিক।

অগ্নিযুগের ইতিহাসে বাংলাদেশে সব চাইতে বেশী তরুণ ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন ১৯৩৪ সালে। তার সর্বশেষ সংযোজন বি. ভি-র এই মতি মল্লিক।

গদীতে বসেই একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগলেন দুর্ধর্ষ লাট বাহাদুর এণ্ডারসন। কত শক্তি ধরে বাংলায় এই বিপ্লবীরা তা আমি একবার দেখতে চাই।

প্রথমেই তিনি কুখ্যাত গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গড়ে তুললেন 'ভিলেজ গার্ড' বাহিনী। উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। ছেলেদের প্রতি নজর রাখো। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই থানায় খবর দাও। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার।

সেই সঙ্গে জানালেন এক নতুন নির্দেশ। শুধু হত্যা বা হত্যা প্রচেষ্টা নয়, কারো কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেলেই তার সাজা হবে প্রাণদণ্ড।

বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ বড় একটা তখন বাইরে নেই। এক এক করে প্রায় সবাইকেই আটক করা হয়েছে এণ্ডারসনের নির্দেশে।

ব্যতিক্রম শুধু বি. ভি-র যতীশ গুহ, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, মতি মল্লিক, কামাখ্যা রায়, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবী। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ তখনো পর্যন্ত পারেনি তাঁদের গ্রেপ্তার করতে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মুষ্টিমেয় এই তরুণবৃন্দ। এই তো সেদিন বার্জকে কবর দেওয়া হল মেদিনীপুরের মাটিতে। সেদিন তোমার এত সৈন্যসামন্ত কোথায় ছিল এণ্ডারসন! পেরেছিলে কি তোমরা তাকে রক্ষা করতে! তবে এবার আমরা টার্গেট করবো তোমাকেই। দেখিয়ে দেবো যে, আমরা এখনো মরে যাইনি।

কিন্তু তার আগেই একদিন জোর সংঘর্ষ বেধে গেল নারায়ণগঞ্জ সংলগ্ন দেওভোগ গ্রামে। তারিখটা ছিল ১৯৩৪ সালের ১০ই এপ্রিল।

রাত তখন অনেক। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে সেদিন সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জী এসেছিলেন দেওভোগ গ্রামে। উদ্দেশ্য, স্থানীয় সদস্য মতি মল্লিককে কিছু জরুরী নির্দেশ দিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে যাওয়া।

কথাবার্তা শেষ। এবার সবাই পা টিপে টিপে ফিরে চলেছেন গাঁয়ের পথ ধরে। সংগে রয়েছেন মতি মল্লিক। তাঁর উদ্দেশ্য,—বহিরাগতদের সাবধানে গাঁয়ের সীমানা পার করে দেওয়া।

হঠাৎ কোথা থেকে দলবল নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিলেজ গার্ড বাহিনীর রমজান মিঞা।

আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে ভিলেজ গার্ড বাহিনীও নাছোড়বান্দা। ফলে শুরু হল তুমুল সংঘর্ষ। তারপরই একসময়ে রিভলবার গর্জে উঠল দিকবিদিক কাঁপিয়ে। ব্যাস, রমজান মিঞা খতম।

চোখের পলকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন সুকুমার ঘোষ ও মধু ব্যানার্জী। এ সময়ে ধরা পড়লে চলবে না। আগে নাটের গুরু এণ্ডারসনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু মতি! মতি কোথায়! ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন! ও বোধহয় আগেই গা ঢাকা দিয়েছে অন্ধকারের আড়ালে। সুতরাং, ছুটে চল এবার সীমানার বাইরে।

আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরকম। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাস্থলেই মতি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন ভিলেজ গার্ড বাহিনীর হাতে, যে খবর তখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল সহকর্মীদের কাছে।

গ্রেপ্তারের পর অকথ্য নির্যাতন করা হল মতি মল্লিকের ওপর। বল, তোমার সংগে কে-কে ছিল। কি নাম তাদের। কোথায় থাকে তারা?

হাজার নির্যাতনেও মুখ খুললেন না মতি। বিপ্লবী জীবনে নির্যাতন নতুন কিছু নয়। এই তো তাদের ভাগ্যলিপি।

শেষ পর্যন্ত প্রলোভনের টোপ ফেলা হল পিতা রাজকুমার মল্লিকের কাছে। ছেলেকে সব কিছু খুলে বলতে বলুন। করকরে দশ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন সংগে সংগে। তাছাড়া মতিকে খালাস করে এনে পড়াশুনো করার জন্য সোজা পাঠিয়ে দেবো বিলেতে। সব খরচ সরকারের।

সহজ, সরল, ধর্মভীরু লোক রাজকুমার মল্লিক। লেখাপড়া সামান্যই জানেন। কিন্তু কি জবাব সেদিন তিনি দিয়েছিলেন এই প্রস্তাবের উত্তরে! বলেছিলেন—'আমার আরো ছেলে আছে। না হয় একটিকে আমি বলি দেবো দেশের জন্য, তা বলে বাপ হয়ে ছেলেকে আমি বলতে পারবো না বেইমানী করতে।'

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে মতি মল্লিক প্রাণ দিলেন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসি মঞ্চে।

আর রাজকুমার মল্লিক! সর্বক্ষণ সেদিন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন তাঁর ঠাকুরের সামনে। কোন ক্ষোভ নেই। কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশও নেই।

শুধু একটি মাত্র কামনা—আমাকে শক্তি দাও ঠাকুর। অন্যায়ের কাছে কোন দিনও যেন আমাকে নতি স্বীকার করতে না হয়।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ধাপে ধাপে মানুষ এগিয়ে চলেছে ক্রমবর্ধমান সভ্যতার দিকে। কিন্তু কোথায় আজ রাজকুমার মল্লিক। রাজকুমার মল্লিকের মত ধর্মভীরু লোকগুলি আজ একেবারেই হারিয়ে গেছে আমাদের দেশ থেকে।

মতি মল্লিকের পর ভবানী ভট্টাচার্য। বি. ভি-র দুঃসাহসী তরুণ ভবানী ভট্টাচার্য।

দলের তখন একমাত্র লক্ষ্য—খোদ এণ্ডারসন। ওকে বুঝিয়ে দিতে দিতে হবে যে, আয়ার্ল্যাণ্ড আর বাংলাদেশ এক নয়। কি আর হবে। এমন কতজনই তো চলে গেছে নিজেকে উৎসর্গ করে। না হয় আরো দু-চারজন যাবে। তা বলে ওকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। ওর ঐ সীমাহীন দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

১৯৩৪ সাল। মে মাস। এণ্ডারসন তখন শৈলশহর দার্জিলিং-এ।

পরিকল্পনামত ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী ঢাকা থেকে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ওখানকার জুবিলী স্যানাটোরিয়ামে। কলকাতা থেকে গেলেন কুমারী উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়) ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। তাদের স্থান হল স্নো ভিউ হোটেলে।

৮ই মে, ১৯৩৪ সাল।

লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে সেদিন উৎসবের সমারোহ। ঘোড় দৌড় শেষে বিজয়ীপক্ষকে গভর্ণরস্ কাপ পুরস্কার দেবেন স্বয়ং এণ্ডারসন।

এদিকে ও'রা তখন প্রস্তুত। এমন সুযোগ আর কোনদিনই হয় তো পাওয়া যাবে না। সুতরাং, যা করার ওদিনই করে ফেলতে হবে।

ঠিক হল—টার্গেট করবেন ভবানী আর রবি ব্যানার্জী। আড়াল থেকে তাদের সাহায্য করবেন মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা মজুমদার।

নির্দিষ্ট সময়ে দুখানি টিকেট কেটে রেস গ্রাউণ্ডে ঢুকে পড়লেন ভবানী আর রবি ব্যানার্জী। আশ্রয় নিলেন এণ্ডারসনের ডানদিকে ন-দশ ফুট দূরে দর্শকদের আসনে। আর একটু কাছে আসন নিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু উপায় নেই। চারপাশে তার একান্ত বশংবদ দেশীয় রাজা-মহারাজাদের দল।

খেলা চলছে। দুজনের চোখে মুখেই তখন দৃঢ় সংকল্পের রেখা। আজ তোমার শেষ দিন এণ্ডারসন। চ্যালেঞ্জের জবাবে তোমার আমলেই আমরা বার্জকে খতম করেছি। রমজান মিঞাকে খতম করেছি। পেরেছিলে তুমি তাদের রক্ষা করতে ? আজ পারবে নিজেকে রক্ষা করতে ? দেখা যাক।

খেলা শেষ। এবার গভর্নর কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ। কিন্তু একি! এণ্ডারসন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শোনা গেল পর পর দুটি গুলির আওয়াজ—গ্রাম! গ্রাম!

সবাই স্তম্ভিত। চারপাশে হাজার হাজার জনতা। তার মাঝে দাঁড়িয়ে এক বলিষ্ঠ কিশোর। হাতে তার উদ্যত অগ্নি নালিকা। লক্ষ্য—বাংলার ভাগ্যবিধাতা স্যার জন এণ্ডারসন।

তৃতীয়বার আর সুযোগ পেলেন না ভবানী ভট্টাচার্য। তার আগেই এক করদরাজ্যের মহারাজা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভবানীর ওপর। সেই সঙ্গে এণ্ডারসনের এডিকং চার চারটি গুলি ছুঁড়লেন ভবানীকে লক্ষ্য করে। আহত ভবানী রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলির আওয়াজ। এবার টার্গেট করেছেন রবি ব্যানার্জী। না, সুবিধা হল না। শুধু গুলিটা এণ্ডারসনের ঠোঁটটাকে ঝলসে দিয়েছে মাত্র। আবার ট্রিগারে চাপ দিলেন রবি। কিন্তু তার আগেই এণ্ডারসন আত্মগোপন করেছেন তাঁর স্টেনো মিস থর্টনের আড়ালে। ফলে গুলিবিদ্ধ হলেন মিস্ থর্টন।

ততক্ষণে একদল খয়ের খাঁ ঝাঁপিয়ে পড়েছে রবির ওপর। তারপরই শুরু হল উন্মত্ত প্রহার। এমন অমানুষিক প্রহার যে, রবিকে আর চেনার কোন উপায়ই রইল না।

হাসপাতালে এক সময়ে জ্ঞান ফিরে এল ভবানীর। প্রশ্ন তাঁর একটাই—'Is Anderson still alive?' এণ্ডারসন কি এখনো বেঁচে আছে?

খবর শুনে হৈ চৈ পড়ে গেল সারাদেশে। সাবাস! হাজার সাবাস! অবশ্য এণ্ডারসনের মৃত্যু হয়নি। নাই বা হল। এক এণ্ডারসন গেলে আর এক এণ্ডারসন আসবে। শাসক হিসেবে সবাই যে সমান। আসল কথা হল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা। সেদিক থেকে এ ঘটনা দাম্ভিক এণ্ডারসনের রাজনৈতিক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিনন্দন জানালেন আইরিশ বিপ্লবীগণ। 'Fianna Fail' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবেই তারা লিখলেন: 'আমরা যা পারিনি, বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তা পেরেছেন। হাজার অভিনন্দন জানাই তাঁদের।'

এদিকে পুলিশ চুপ করে বসে নেই। গ্রেপ্তার সমানেই চলছে। উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জীও ধরা পড়ছেন পুলিশের হাতে। আর ধরা পড়েছেন শহীদ মতি মল্লিকের সংগী সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জী, সুশীল চক্রবর্তী, গিরিন গুহ প্রমুখ কয়েকজন।

১৯৩৪ সালের ১৪ই আগস্ট বিচার শুরু হল স্পেশাল ট্রাইবিউনালে। বিচার সভায় দাঁড়িয়ে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ভবানী: আমার উদ্দেশ্য ছিল

গভর্নরকে হত্যা করা। আমি আর রবি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ জড়িত ছিল না।

'I Came to assassinate the Governor. My object was to murder him. I have nothing more to say. None but myself and Rabi took part in the action connected in this conspiracy.' [Amrita Bazar : 26. 8. 34]

রায় দেয়া হল ১৯৩৪ সালির ১২ই সেপ্টেম্বর। সংবাদপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

ভবানী, রবীন্দ্র ও মনোরঞ্জনের মৃত্যুদন্ড

'দার্জিলিং, ১২ই সেপ্টেম্বর—লেবংএ রেসের মাঠে বাংগলার লাট স্যার জন এণ্ডারসনের উপর গুলি মারা সম্পর্কে অভিযুক্ত আসামীদের মামলার রায় অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

মিঃ জে. ইউনি, মিঃ আর. এইচ. পার্কার, ও মিঃ এম. এইচ. এস ফারোককে লইয়া গঠিত একটি স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের নিকট এই মামলার শুনানী হয়। শুনানীর পর রায়দান স্থগিত ছিল। অদ্য বিচারকগণ নিম্নলিখিত দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন ঃ— (১) ভবানী ভট্টাচার্য, (২) রবীন্দ্র ব্যানার্জী, (৩) মনোরঞ্জন ব্যানার্জী—এই তিনজনের প্রাণদণ্ড।

শ্রীমতী অমিয়া মজুমদার—ওরফে উজ্জ্বলা—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ১৪ বৎসর কারাদণ্ড। তবে উভয় দণ্ডই একসংগে চলিবে।

(১) সুকুমার ঘোষ—ওরফে লাল্টু, (২) মধুসূদন ব্যানার্জী—১৪ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড। সুশীল চক্রবর্তী—১২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড'।

[আনন্দবাজার : ১৩-৯-৩৪]

অবশ্য আপীলে কিছুটা এদিক-ওদিক করা হল। ফাঁসির পরিবর্তে সেখানে রবি ও মনোরঞ্জনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উজ্জ্বলা মজুমদারের চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড। বাদ বাকি যা ছিল—তাই।

এবার রবির পক্ষে দাঁড়ালেন মিশনারীগণ। রবি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। ওকে এভাবে সাজা দিলে চলবে না। তাহলে মিশনের বদনাম হবে।

শেষ পর্যন্ত মিশনারীদের দাবী মেনে নিতে হল শাসক প্রভুদের। তাই বছর খানেক বাদে আন্দামান থেকেই রবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিলেতে। শর্ত হল—অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আর কোনদিনই তিনি ফিরতে পারবেন না নিজের জন্মভূমিতে।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ সাল।

রাজসাহী জেলে ভবানীর সেদিন শেষ রাত্রি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও তিনি নত স্বীকার করেননি শাসকদের কাছে। সেদিনও

দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। বীরের মতই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন মাথা উঁচু করে।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি। সেদিন ভবানী ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছিলেন এণ্ডারসনকে হত্যা করতে গিয়ে। আর বর্তমানে আলিপুরের বিখ্যাত সরকারী ভবন এণ্ডারসন হাউসের নামকরণ করা হয়েছে—'ভবানী ভবন।'

এবার রোহিনী বড়ুয়া। মাস্টারদার আদর্শে অনুপ্রাণিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিশোর রোহিনী বড়ুয়া।

ধরা পড়েছিলেন ১৯৩২ সালের ২৭শে জুন চট্টগ্রামে। দুমাস বাদে—২রা সেপ্টেম্বর তাঁকে পাঠানো হল হিজলী বন্দীনিবাসে। ওখান থেকে ১৯৩৩ সালের ২৮শে মার্চ বহরমপুর ক্যাম্পে।

এখানেই শেষ হল না। ১৯৩৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর আবার এক নতুন আদেশ।

তখনকার দিনে বিপ্লবীদের বেলায় ভারী অদ্ভুত একটা সরকারী নিয়ম চালু ছিল, যাকে বলা হতো অন্তরীণবন্দী। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে হয়তো একদিন আদেশ হল—তোমাকে এখন থেকে অমুক জেলার অমুক থানার সীমানার মধ্যে গিয়ে বাস করতে হবে। প্রস্তুত হও। অবিলম্বে।

হঠাৎ এমনি একটি আদেশ জারী করা হল সতেরো বছরের কিশোর রোহিনীর ওপর। চলো এবার ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ ঘাট থানার দৌলতদিয়া গ্রামে।

কিন্তু খুব সাবধান। গাঁয়ের কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা বা কথা-বার্তা বলা চলবে না। বিশেষ করে ছাত্রদের সঙ্গে তো নয়ই। আর রোজ দুবেলা করে থানার দারোগা আসাদ আলীর কাছে গিয়ে তোমাকে হাজিরা দিতে হবে। কোনরকমেই যেন এ আদেশের নড়চড় না হয়।

ওস্তাদ লোক আসাদ আলী। কি করে স্বদেশীওয়ালাদের সায়েস্তা করতে হয়, সে সব কায়দা তিনি ভাল করেই জানেন। ইতিমধ্যে কত বাঘা বাঘা ছেলেকে তিনি ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন মনের সুখে ডাণ্ডা মেরে। এতো সতেরো বছরের একটা পুঁচকে ছেলে মাত্র।

শুরুতেই খিটিমিটি। সেই সঙ্গে ক্রমাগত মিথ্যে হম্বিতম্বি। কেন তুমি গাঁয়ের অমুকের সঙ্গে কথা বলেছ। কার হুকুমে। সেপাই, লাগাও ডাণ্ডা।

অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন রোহিনী। তারপর ক্রমশ তার মধ্যে দানা বেধে উঠল এক ভয়ঙ্কর শপথ। যদি মানুষ হই, তাহলে এর জবাব আমি দেবো। কি আর হবে। না হয় ফাঁসি দেবে। দিক না। তা বলে দিনের পর দিন মনুষ্যত্বের এই অবমাননা সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন তারিখে।

রাত তখন ঠিক দশটা। চেয়ারে বসে কাজ করছেন দারোগা আসাদ আলী। পেছনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ যম। হাতে তার একটি ধারালো দা! হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাতে মাথাটা দূরে ছিটকে পড়ল আসাদ আলীর। সামান্য একটা চিৎকারও কেউ শুনতে পেলনা তার মুখ থেকে।

সেপাইরা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কেউ নেই কাছে কিনারে। তাছাড়া চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই সুযোগে গা ঢাকা দেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়। রোহিনী কিন্তু তার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। বরং বুক চিতিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমি মেরেছি।

যথা সময়ে রোহিনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফরিদপুর জেলে। এবার বিচার।

অন্তরীণ বন্দীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন সেদিন ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তার ফলে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। যেমন—ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানায় অন্তরীণ বন্দী মেদিনীপুরের নবজীবন ঘোষ। জলজ্যান্ত ছেলে। অথচ হঠাৎ একদিন সরকারী রিপোর্টে জানানো হল,—তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন থানার অভ্যন্তরে।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে মেদিনীপুরের এই ঘোষ পরিবারের অবদান চিরস্মরণীয়। ছোট ভাই নির্মলজীবন ঘোষ বার্জ হত্যা মামলায় আগেই প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসি মঞ্চে। এবার গেলেন তাঁর ভাই নবজীবন ঘোষ। আর এক ভাই যতিজীবন ঘোষকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়নি নেহাত ভাগ্যের জোরে। এই যতিজীবন ঘোষ এবং বিমল দাশগুপ্তই যে সেদিন প্রথম জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করেছিলেন, সেকথা তো তোমাকে আগেই বলেছি।

দুর্ভোগ বড় ভাই বিনয়জীবন ঘোষকেও কম পোহাতে হয়নি। ভাই নবজীবন ঘোষের তথাকথিত এই আত্মহত্যা সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন শোনা যাক।

"আমার চতুর্থ ভাই নবজীবন ঘোষকে (ডাক নাম শালিক) আমার সঙ্গেই ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। স্পেশাল ট্রাইবিউনাল নির্মলজীবনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার অব্যবহিত পরেই নবজীবনকে বন্দীর সংশোধিত ফৌজদারী আইনবলে গ্রেপ্তারের পর রাজবন্দী করা হয়। সে কিছুকাল বহরমপুর বন্দীশালায় আটক থাকে। যতিজীবনও তখন ঐ বন্দীশালায় ছিল। ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি নবজীবনকে বহরমপুর বন্দীশালা থেকে স্থানান্তরিত করে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের থানা গৃহে আটক করা হয়।

১৯৩৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের রাত এগারোটা। বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে একখানা বই পড়ছি। একটা লোক সাইকেল চড়ে এল। আমার ঘরের জানালাটার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—'এটা কি নবজীবন ঘোষের বাড়ি?'

আমি বললাম—হ্যাঁ।

তেমনি নিষ্করুণ অবহেলার সুরে লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল—'রাজবন্দী নবজীবন ঘোষ কাল রাত্রে গোপালগঞ্জে আত্মহত্যা করেছে।'

কী বললে! কী বললে! চেঁচাতে চেঁচাতে আমি ছুটে নিচে গেলাম।

লোকটার চেঁচানিতে মা-বাবার ঘুমও ভেঙে গেছল—তাঁরাও আমার পিছু পিছু নিচে এলেন; সাদা পোষাক পরা একজন পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরকে খবরটা জানানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ কর্মচারিটি সেই নিদারুণ খবরটি আবার যখন আমাদের বলল—বাবা এই অকস্মাৎ বিনামেঘে মাথায় বজ্রাঘাততুল্য সংবাদ শুনে হতজ্ঞানের মত বিড় বিড় করে বললেন—'তাহলে অবশেষে আমার ছেলে বন্দী-দশা থেকে মুক্তি পেল।'

মা শোকে অধীর হয়ে মাথা-বুক খুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন। ১৯৩৪ এর ২৬শে অক্টোবর এক ছেলেকে হারিয়েছিলেন (নির্মলজীবন ঘোষ)। দু বছর পূর্ণ না হতেই ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬—আর এক ছেলেকে হারালেন। আমার মাথা ঘুরছে; মা-বাবার অবস্থা চোখে দেখা সহ্যাতীত মনে হল। আমি ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

পরদিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬—সকাল দশটার ট্রেনে আমি ও বাবা গোপালগঞ্জ রওনা হলাম। খুলনা ঘাটে স্টীমার ধরতে হল। আমরা যখন গোপালগঞ্জে নামলাম, বেশ কয়েকজন স্থানীয় যুবক গভীর আন্তরিক সমবেদনা ও সহৃদয়তার সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করলেন।

থানার দারোগা জানালেন, ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালে তারা দেখলেন—নবজীবন মৃতাবস্থায় তার ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। তার কাপড়ের একটা খুঁট গলায় জড়ানো ছিল।

নবজীবন যে সত্য সত্যই আত্মহত্যা করেছে, আমাদের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—আত্মহত্যার পূর্বে নবজীবন দুখানি শেষ পত্র লিখে রেখে গেছে। একখানি গভর্ণমেণ্টকে লেখা, আর একখানি আমার পিতাকে। চিঠি দুখানি মহকুমা অফিসারের নিকট গচ্ছিত আছে।

কিন্তু বাবা যখন উক্ত অফিসারের বাড়ি গিয়ে তাঁকে লেখা চিঠিখানি চাইলেন, তখন মহকুমা অফিসার তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। বাবা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, তাঁকে লেখা মৃত পুত্রের শেষ চিঠিখানি একটিবার চোখে

দেখতে দেওয়া হোক। এস. ডি. ও. বাবার এই কাতর আবেদনও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, পুলিশ-কর্মচারী ও থানার লোকদের সঙ্গে নবজীবনের মাঝে মাঝে বচসা ও ধস্তাধস্তি হতো এবং থানার পুলিশ মাঝে মাঝে নবজীবনকে মারপিট করতো। এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নবজীবনের তথাকথিত আত্মহত্যা গভীর রহস্যের জালে আবৃত হয়ে পড়ে।

নবজীবনের শেষকৃত্য আমাকেই করতে হল। শব ব্যবচ্ছেদ ২৩শে সকালেই সেরে রেখেছিল। মৃতদেহের ওপর ঢাকা তুলে ফেলামাত্র আমার চোখের সুমুখে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল; তার আকস্মিক ধাক্কায় আমি মাটিতে ছিটকে পড়লাম। আমার সঙ্গে যে সব বন্ধুরা গেছলেন, তাদের আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম—বাবাকে যেন তারা তক্ষুনি ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে কিছুতেই নবজীবনের মৃতদেহ দেখতে না দেন। সে দৃশ্যের আকস্মিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে বাবা সেখানেই মারা যাবেন।

বাবা ভয়ানক কাঁদতে লাগলেন এবং জেদ ধরলেন—তাঁর শালিককে তিনি একবার শেষ দেখা দেখতে চান। আমি বললাম—কী দেখবে। তোমার শালিকের ওতে কিছুই আর নেই, তুমি দেখলে শিউরে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। আমরা তোমাকে কিছুতেই ও দেখতে দিতে পারিনে।

দরদী বন্ধুরা বাবাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর নবজীবনের যা কিছু অবশেষ ছিল, আমরা দাহ করলাম। দূর গোপালগঞ্জ ধলেশ্বরী তীরে রইল চিরনিদ্রামগ্ন মেদিনীপুরের নবজীবন ঘোষ।"

[বিপ্লবী মেদিনীপুর : পৃ :-৬৭]

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঢাকার শ্রীসংঘের একনিষ্ঠ সদস্য অনিল দাসের কথা।

স্বীকৃতি আদায়ের জন্য পুলিশ যে ভাবে বর্বর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেছিল, কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে তা কল্পনাও করা যায় না।

সব কিছুর জবাব দিলেন রোহিনী বড়ুয়া।

জীবন দুর্বহ। প্রাণ ধারণের গ্লানি অসহ্য। তাই অপমানে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বেছে নিলেন চরম পথ। তাঁর এক কথা—মরবো তার জন্য দুঃখ নেই, তবে তার আগে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির প্রবর্তক ইংরেজ শাসকদের বুঝিয়ে দিয়ে যাবো যে, অকারণে একতরফা মার খাওয়া বিপ্লবীর ধর্ম নয়। এখনো সাবধান হও, নইলে আসাদ আলিই শেষ নয়। আরো অনেক আসাদ আলিকেই যেতে হবে এমনি করে।

শুরু হল বিচার। খুব অল্প দিনের মধ্যেই বিচার শেষ। ১৮ই জুলাই সাজা দেওয়া হল—মৃত্যুদণ্ড।

তার কারণও ছিল। স্বপক্ষে কোন আইনজীবী নিযুক্ত করতে রাজী হননি রোহিনী। তাঁর সাফ কথা—হ্যাঁ, আমি মেরেছি। ওকে আমি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেছে।

আপীল! না, আপীল নয়। আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধবদের কঠোর নির্দেশ দিলেন রোহিনী, কোন আপীল করা চলবে না। কোন করুণা আমি চাইনে। এই আমার শেষ কথা।

রোহিনীর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন ফরিদপুর জেলের ফাঁসি মঞ্চে।

উল্লেখযোগ্য, অগ্নিযুগের তৃতীয় অধ্যায়ে রোহিনী বড়ুয়াই হল শেষ শহীদ। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের আর কাউকেই প্রাণ দিতে হয় নি ফাঁসির দড়িতে।

কিন্তু কেন! তবে কি বিপ্লবীরা তাঁদের লক্ষ্য থেকে সরে গিয়েছিলেন প্রচণ্ড দমননীতির ফলে! না, তা নয়। আসলে এর মূলে ছিল ভারত সরকারের নতুন শাসন সংস্কার নীতি। মোট সাতটি প্রদেশে তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। সেই নতুন পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে সময়ের প্রয়োজন।

'দামামা ঐ বাজে
দিনবদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।'

—রবীন্দ্রনাথ

দিন বদলের পালা এল ১৯৩৯ সালে। শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

প্রতিটি বিপ্লবী দলে সেদিন সাজ সাজ রব। যে কোন পরাধীন জাতির পক্ষে এটা মস্তবড় একটা সুযোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসবিহারী ও বাঘা যতীনের আন্তরিক প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও এবার আর কোন মতেই ব্যর্থ হলে চলবে না। শেষ লড়াইয়ের জন্য সবাই প্রস্তুত হও।

শাসকদলের কাছেও এটা অজানা নয়। তাই শুরু হল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার। ফলে চিহ্নিত বিপ্লবীদের মধ্যে প্রায় সবারই স্থান হল কারা প্রাচীরের অন্তরালে। যুদ্ধ পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। এ সময়ে ওদের বাইরে রাখা বিপজ্জনক।

সুযোগ বুঝে সুভাষচন্দ্র একদিন অন্তর্ধান করলেন শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে। তারপর সোজা জার্মানী। 'শত্রুর শত্রুই আমার মিত্র, তাই সর্বদিক

থেকে আঘাত হেনে ইংরেজকে এবার বিতাড়িত করতে হবে ভারতভূমি থেকে।

ইংরেজের তখন সত্যই বড় দুর্দিন। ইয়োরোপে প্রতিটি রণাঙ্গনে তাকে মার খেতে হয়েছে হিটলারের হাতে। একই অবস্থা তখন এশিয়া ভূখণ্ডে। হংকং, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, বর্মা—সব কিছু তাকে হারাতে হয়েছে জাপানের কাছে।

দেখে শুনে তৎপর হয়ে উঠলেন জাপান প্রবাসী বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। সেবারে সেনা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবার তুমি কোথায় যাবে পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজ! সবকিছুর প্রায়শ্চিত্ত এবার তোমাকে করতেই হবে।

গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমস্ত ভারতীয় প্রস্তুত হও। সর্বস্ব পণ করে সবাই এ বাহিনীতে যোগ দাও। সংগ্রাম আসন্ন।

ডাক শুনে প্রতিটি ভারতীয় তখন উদ্দীপ্ত। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। একটা শক্ত আঘাতে এবার ঐ দুষমনকে দূর করে দিতে হবে হিন্দুস্থান থেকে।

কিন্তু হিন্দুস্থানের প্রকৃত অবস্থা এখন কি। কোথায় কোথায় দুষমনরা ঘাঁটি গড়ে তুলেছে যুদ্ধের প্রয়োজনে। লড়াই চালাতে হলে এসব খবর যে বিস্তৃতভাবে জানা দরকার।

ঠিক হল—কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে ভারতবর্ষে পাঠানো হবে সাবমেরিণ যোগে। তাঁরাই সাঙ্কেতিক ভাষায় এসব তথ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার্সে জানিয়ে দেবেন শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে।

প্রথমে এস, এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখ পাঁচজনের একটি দল এসে অবতরণ করলেন কালিকটের উপকূলে। আর একটি দলে রইলেন বেতার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তরুণ সত্যেন বর্ধন ও আরো চারজন। তাঁদের লক্ষ্য—কাথিয়াবাড়ের উপকূল।

সত্যেন বর্ধন আগে ছিলেন মালয়ের ডাক ও তার বিভাগের কর্মী। সবকিছু তুচ্ছ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে। তারপর ট্রেনিংএর কাজে পেনাংএ। সেখানেই তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এম. এ. কাদের, ফৌজ সিং প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে। এ অভিযানে সবাই তাঁরা অংশীদার।

দিগন্ত-বিস্তৃত আরবসাগর। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙা-গড়া

মিছিলের।

সহসা সেদিন একটা সাবমেরিণের পেরিস্কোপ আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল জলের ওপর। তারপর গোটা সাবমেরিণটাই। না, কেউ নেই কাছে কিনারে। এমনকি কোন জেলে ডিঙি পর্যন্ত নজরে পড়ে না ধারে কাছে। রবারের ডিঙিতে চেপে এবার তোমরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাও উপকূলের দিকে। কামনা করি, তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

বেতার ট্রান্সমিটার সহ ক্রমশ পাঁচজন এগিয়ে চললেন উপকূলের দিকে। মাত্র পাঁচ মাইল দূরত্ব। এ আর কতক্ষণ।

ততক্ষণে সাবমেরিণটা আবার তলিয়ে গেছে জলের নিচে। শুধু সমুদ্রের বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না।

উত্তাল ঢেউয়ের সংগে লড়াই করতে করতে ততক্ষণে রবারের ডিঙিটা অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে তীরের দিকে। আর মাত্র মাইল খানেক বাকি।

সহসা কি দেখে ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন সত্যেন। গতিক সুবিধের নয়। সমুদ্র আজ সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয় ঝড় উঠবে।

আশংকা মিথ্যে হল না। দেখতে না দেখতেই ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। সংগে সংগে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রের সে কি বিচিত্র রূপ। সে কি তার নাচের ঘটা। উৎক্ষিপ্ত দু বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত আক্রোশে মুহুর্মুহু সে আঘাত করতে লাগল রবারের ডিঙিটার গায়ে। যেন ডিঙিটাকে অতলসমাধিতে না পাঠানো পর্যন্ত কিছুতেই তার শান্তি নেই।

ঝড়ের সংগে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে এগিয়ে চলেছেন ও'রা পাঁচজন। কিন্তু কোথায় উপকূল। ঝড়ের ঝাপটায় ডিঙিটা যে তখন দিকহারা হয়ে কোথায় কোন অনির্দেশের পথে ছুটে চলেছে, কে জানে।

এমনি করে সারারাত। ঠিক ছিল, রাত্রির প্রথমভাগেই তাঁরা তীরে অবতরণ করবেন, কিন্তু সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল ঝড়ের জন্য। ফলে—সামান্য পাঁচ মাইল অতিক্রম করতে সময় লেগে গেল তাঁদের দীর্ঘ একুশ ঘণ্টা।

ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে একটি দুটি করে। এ অবস্থায় কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

কাজেও তাই হল। ডিঙি দেখেই থমকে দাঁড়াল স্থানীয় একটি গ্রাম্য লোক। বাঃ। কি সুন্দর রবারের এই ডিঙিটা। এমন জিনিস তো আমাদের দেশে দেখা যায় না। ওরা কারা। এলই বা কোথা থেকে।

এক কান থেকে অন্য কান। তারপর গোটা গাঁ জুড়ে সেই একই

আলোচনা। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানাতে। রবারের ডিঙি করে কারা এসে নেমেছে আমাদের গাঁয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে এল ঝড়ের বেগে। যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে। এ সময়ে কারা এখানে এল রবারের ডিঙি করে।

সত্যেনের তখন একমাত্র চেষ্টা সবাইকে নিয়ে জনতার মধ্যে মিশে যাওয়া, কিন্তু সব বৃথা। যাদের মুক্তির জন্য তাঁদের এই মরণপণ সংগ্রাম, সেই গ্রামবাসীরাই তাদের ধরিয়ে দিল পুলিশের হাতে।

অন্য দলে আগত এস. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখরাও রেহাই পেলেন না। তাঁরাও একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিকভাবে।

আর ধরা পড়লেন ফৌজ সিং, সঞ্জীব ব্যানার্জী প্রমুখ আরো কয়েকজন। বিভিন্নদলে তাঁরা এসেছিলেন চট্টগ্রাম ও আসামের মধ্য দিয়ে হাঁটা পথে।

সবাইকে রাখা হল মাদ্রাজ ফোর্টে। এবার বিচার। অপরাধ—শত্রু পক্ষের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা।

১৯৪৩ সালের ৮ই মার্চ শুরু হল সবার অগোচরে, অতি সংগোপনে। আগষ্ট আন্দোলনের আগুন তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে এখানে ওখানে। এ অবস্থায় ভারতবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর জানতে পারলে আর রক্ষে নেই।

রায় দেওয়া হল ১লা এপ্রিল। সত্যেন বর্ধন, এম. এ. কাদের, এস. আনন্দম ও ফৌজ সিং—এই চারজনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। আপীলে বাকি একজনকে প্রাণদণ্ডের বদলে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সাল।

দেখতে দেখতে একসময়ে ফর্সা হয়ে এল পূব আকাশটা। ভেসে এল মিলিটারী বুটের ভারী শব্দ। প্রস্তুত হও। এবার যেতে হবে সবাইকে।

উত্তরে শোনা গেল সবার প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ—হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত। আজাদী সৈনিক মৃত্যুকে কোনদিনও ভয় পায় না। চল কোথায় যেতে হবে আমাদের! বলো ভাই সব—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

আস্তে আস্তে বুটের শব্দ একসময়ে মিলিয়ে গেল দূরে। তখনও দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে শোনা যেতে লাগল সেই একই ধ্বনি—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

তারপরই সব স্থির। সব শান্ত। আর সেই ধ্বনি শোনা গেল না কারো কণ্ঠ থেকে।

প্রায় একই সময়ে, একই সঙ্গে আরো কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হল মাদ্রাজ ফোর্টের ফাঁসিমঞ্চে।

আশ্চর্য, কেউ সেদিন জানতে পারেনি যে, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে ভেতরে ভেতরে। জানা গিয়েছিল দীর্ঘ তিন বছর বাদে—১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে।

১৯৪৩ সাল। ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন-দিনের সংকেত।

নির্দিষ্ট সময়ে রেডিও খুললেই ডাক ভেসে আসে সুদূর বার্লিন থেকে—'আমি সুভাষ বলছি। সংগ্রাম আসন্ন। দিন আগত ঐ। সবাই প্রস্তুত হও।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে একইভাবে ডাক ভেসে আসে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর—'আমরা এখানকার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় প্রস্তুত। তোমরাও প্রস্তুত থেকো।'

শুনে শুনে ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন মাদ্রাজ উপকূল-রক্ষীবাহিনীর বাঙালী তরুণবৃন্দ। সামনে দুরন্ত সংগ্রামের দিন। আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে আসন্ন সেই সংগ্রামের জন্য।

১৮ই এপ্রিল বিপর্যয় ঘটে গেল আকস্মিকভাবে। কিছুই জানা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না। শুধু অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ভাবে শোনা গেল; বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী তরুণকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানকুমার বসু ঠাকুর তাদের অন্যতম, যিনি ইতিপূর্বে সামরিক বিভাগের তেরোটি পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

৬ই জুলাই শুরু হল বিচার।

প্রকাশ্য বিচারসভায় নয়; বাঙ্গালোরের সেন্ট এনড্রুজ চার্চে অনুষ্ঠিত সামরিক আদালতে। সবার অলক্ষ্যে। অতি সঙ্গোপণে।

আসামীর সংখ্যা মোট বারোজন। মানকুমার বসুঠাকুর, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, নন্দকুমার দে, চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, সুনীল মুখার্জী, কালীপদ আইচ, নীরেন মুখার্জী, আব্দুল রহমান, আর. এন. ঘোষ ও এ. কে. দে।

রায় দেওয়া হল ৫ই আগস্ট। প্রথমোক্ত ন'জনকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। আব্দুল রহমান ও আর. এন. ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এ. কে. দে-র সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ সাল।

ফাঁসিমঞ্চ প্রস্তুত। পরাধীন দেশে দেশপ্রেমের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। সেই দেশপ্রেমের অপরাধে এবার তাঁদের হত্যা করা হবে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে।

বন্দীরা নির্বিকার। একে অন্যকে আলিঙ্গন করে একসঙ্গে সবাই তাঁরা

ধ্বনি দিলেন—বন্দেমাতরম। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু জিন্দাবাদ। নেতাজী সুভাষ বসু জিন্দাবাদ।

চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল ন'টি বিপ্লবী তরুণের জীবন-নাট্য। কাউকে সে খবর জানতে দেওয়া হল না। এমনকি সংবাদপত্রগুলোকে পর্যন্ত না।

জানা গেল পুরো তিন বছর বাদে ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে। সাময়িকপত্র থেকেই তার বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

"১৮ই মার্চ—অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার জন থর্ন জানান যে, গত যুদ্ধের সময় শত্রু-গুপ্তচর অর্ডিন্যান্সে মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলকাতায় ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহাদের মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ১ জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং বাকি ১৪ জন মুক্তি পায়। ২৭ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং বাকি ১২ জনের ফাঁসি হয়।

খবর শুনে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। আশ্চর্য, সবার অলক্ষ্যে এতগুলো তরুণকে হত্যা করা হল, অথচ এতদিনের মধ্যেও সে খবর কাউকে জানতে দেওয়া হল না! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

সরকারের অবিমৃশ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়ে সেদিন এ প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে কি লেখা হয়েছিল তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

"যুদ্ধের সময় মাদ্রাজের কেল্লায় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নয়জন সৈনিক জমাদার মানকুমার বসু ঠাকুর, এন. কে. দে, হাবিলদার ডি. ডি. রায় চৌধুরী, হাবিলদার এস. কে. মুখার্জী, হাবিলদার এন. বড়ুয়া, নায়েক পি. চক্রবর্তী; নায়েক সি. মুখার্জী, গানার পি. কে. আইচ—ইঁহাদিগের ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

আর গানার আব্দুল রহমান, গানার আর. এন. ঘোষ ইঁহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে, এবং গানার এ. কে. দে-কে সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বলিয়া নয়াদিল্লী হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে।

ইঁহারা সকলেই তরুণ। ইঁহাদের বয়স ১৭ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রকাশিত নামের তালিকা হইতে ইহাও মনে হয়, ইঁহারা সকলেই বাঙালী।

শোনা যায়, সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারের দ্বারাই ইঁহাদের প্রতি দণ্ডবিধান করা হয়। বলা বাহুল্য, বাহির হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইঁহাদিগকে কোনরূপ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

এই মামলা সম্পর্কে ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও যে ইঁহাদের সঙ্গে দেখা-

সাক্ষাৎ করিবার কোন সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহাও মনে হয় না। সুতরাং লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাকক্ষের মধ্যেই সব কিছু সমাধা হইয়াছে।

ইঁহারা কি অপরাধ করিয়াছিলেন নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয়, পরাধীন দেশে যাহা সর্বাপেক্ষা দণ্ডনীয় অপরাধ, সম্ভবত সেই শ্রেণীরই ছিল। কারণ, সংবাদে দেখিতে পাই, ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিবার আগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যুবকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং জাতীয় সংগীত গান করিতে করিতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়া দাঁড়ান।

এতগুলি বাঙালী যুবকের অকালমৃত্যুর এই সংবাদ এমন আকস্মিকভাবে পাইয়া বাঙালী সমাজ স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে; ভিতরের ব্যাপার গোপন থাকাতে এই বেদনা সমধিক প্রগাঢ় আকার ধারণ করিয়াছে।

কারা-প্রাকারের অন্তরালে এই যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, এগুলি গোপন রাখিবার জন্য সরকারের আগ্রহের কারণ কি থাকিতে পারে আমরা বুঝি না; অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের এমন একটা আগ্রহের পরিচয় পাইতেছি।

...কারাকক্ষের গোপন কক্ষে ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানদের বন্ধন, পীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে ভারতবাসীরা কৃতসংকল্প হইয়াছে; আমলাতন্ত্র যদি এ সত্য এখনও উপলব্ধি না করিয়া থাকেন, তবে তাহারা নিজেদের অনর্থ নিজেরাই ডাকিয়া আনিবেন। মানব ধর্মের অগ্নিময় বেদনাকে আর এ দেশে কারচুপির দ্বারা প্রশমিত করা চলিবে না।" [সাপ্তাহিক দেশ : ৩০-৩-৪৬]

'যত বড় হও—
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও
আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়
এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।'
—রবীন্দ্রনাথ

'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়'—

একথা সংসারে ক'জন বলতে পারেন জানিনে, তবে ও'রা পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তো ও'রা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন ফাঁসির দড়িতে।

পরাধীন দেশে এটা নতুন কিছু নয়। কবে কোন শাসক সম্প্রদায় বিপ্লবীদের ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে? তাহলে ফাঁসিমঞ্চ তৈরি হয়েছে কাদের জন্য?

ওদের কাহিনী শেষ করার আগে আমি তোমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে

চাই মল্লিকা।

সেদিন দেশ ছিল পরাধীন। আজ স্বাধীন। বলতে পার, যে সব দধীচির আত্মত্যাগের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে, দেশের মানুষ কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে অগণিত সেই শহীদবৃন্দকে। কতটুকু তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের দেশের ভাগ্য বিধাতাগণ?

বছর কয়েক আগেকার কথা মনে পড়ে। মিছিলে মিছিলে সেদিন লালে লাল হয়ে গিয়েছিল পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি শহর। সবার কণ্ঠে ছিল একটি শ্লোগান—'ভিয়েতনামের শহীদবৃন্দ, তোমাদের আমরা ভুলিনি, ভুলবো না।'

এ সম্মান ভিয়েতনামের শহীদবৃন্দের অবশ্যই প্রাপ্য। ছোট্ট একটি দুর্বল রাষ্ট্র হয়ে যে ভাবে তাঁরা বছরের পর বছর লড়াই চালিয়ে শক্তিমত্ত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, পৃথিবীতে এমন নজীর আর কোথাও নেই। তাই মনে মনে আমিও সেদিন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলাম :—'ভিয়েতনামের শহীদবৃন্দ, তোমাদের শত কোটি নমস্কার।'

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমরা কি শুধু ভিয়েতনামের শহীদদেরই শ্রদ্ধা জানাবো! ঘরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো না! শ্রদ্ধা জানাবো না ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্যসেন বা মাতঙ্গিণী হাজরা প্রমুখ অগণিত শহীদবৃন্দকে?

তা যদি জানাতে না পারি, তাহলে ভিয়েতনামের শহীদবৃন্দ আমাদের এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন কি! আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। হয়তো একথাই তারা বলবেন যে, অযোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আমরা গ্রহণ করিনে। আগে নিজের ঘরের শহীদদের শ্রদ্ধা করতে শেখো, তারপর আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে এসো।

ব্যতিক্রম—পাঞ্জাব। মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ। পাঞ্জাব সরকারের নির্দেশে সেই ২৩শে মার্চ তারিখটি আজ ছুটির দিন। লক্ষ লক্ষ শিখ সেদিন স্পেশাল ট্রেনযোগে চলে যান সেই শতদ্রু তীরে, যেখানে দাহ করা হয়েছিল ওঁদের তিনজনকে।

হাতে তাদের পুষ্পসম্ভার। কণ্ঠে বলিষ্ঠ শপথ। শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব রাজগুরু, তোমাদের আমরা ভুলিনি, কোনদিনও ভুলবোনা।

বোধহয় জানো, বছর কয়েক আগে ভগৎ সিং-জননী বিদ্যাদেবী দেহরক্ষা করেছেন দীর্ঘ আটানব্বই বছর বয়েসে। গোটা পাঞ্জাব বোধহয় সেদিন ভেঙে পড়েছিল তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তিনি তো শুধু ভগৎ সিং-জননী নন, তখনকার সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিংয়ের ভাষায়—তিনি হলেন—'পাঞ্জাব-মাতা।'

উল্লেখযোগ্য, এই জৈল সিংই তাঁকে একটি এ্যামবাসাডার গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, সঙ্গে দিয়েছিলেন, নগদ এক হাজার টাকা।

এবার নিজের রাজ্যের দিকে একবার চোখ ফেরাও মল্লিকা। পারবে কি তুমি এমন কোন নজীর দেখাতে, যা গর্ব করে বলার মত?

কোন পাঞ্জাবী পরিচালিত বাসে উঠলেই ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ শহীদদের বাঁধানো ফটোগুলো জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে। বাঙালী পরিচালিত কোন বাসে বাংলাদেশের শহীদদের একটি ফটোও তোমার নজরে পড়েছে কি? অথচ এই বাঙালীকে দেখেই না একদিন মহামতি গোখেল মুগ্ধ সম্ভ্রমে বলেছিলেন—'What Bengal thinks to day India will think to-morrow.'

জানি, কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে না। লাগার কথাও নয়। কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কি?

আজ বিশ্বাস করা কষ্টকর হলেও একথা কিন্তু মিথ্যে নয় যে, বাঙালী সত্যই সেদিন বাঙালী ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে এমন একটা যুগ এসেছিল, যখন এক নিঃশ্বাসে শত শত বাঙালীর নাম উচ্চারণ করা যেতো, যাঁদের নামে এখনও সবাই শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়ায়। আজ হোঁচট না খেয়ে পাঁচজন বরেণ্য বাঙালীর নাম তুমি উচ্চারণ করতে পারবে কি? পারবে কি ক্ষুদিরামের ফাঁসির তারিখটা চট্ করে বলতে। বোধহয় পারবে না। তুমি কেন, অনেকেই পারবে না।

দোষ তোমাদের নয় মল্লিকা। আসলে তোমাদের জানতেই দেওয়া হয়নি ওঁদের কাহিনী। ভয়! ভয়! ভয়! দারুণ ভয় পাছে ওদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা আবার মেরুদণ্ড সোজা করে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও। আসল ভয়তো সেইখানেই। সুতরাং যা চাপা আছে, তা চাপাই থাক।

তাই স্বীকৃতি তো দূরের কথা, উল্টো আরো অপপ্রচার করা হয়েছে বিস্তর। এখনো বুঝি তার বিরাম নেই। চলছে তো চলছেই। ওরা ভ্রান্ত! ওরা অপরিণামদর্শী! ওরা মিসগাইডেড্! এমনি কত কি।

এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী নায়ক প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বড় দুঃখের সঙ্গে কি বলেছেন শোন:

"খাদি-কর্মীদের মধ্যে আমি প্রায় সকলকেই দেখেছি যে, অতীতের বিপ্লবীযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বা মানসিক তাচ্ছিল্যবোধ আছে। ভূতপূর্ব পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং আরো অনেক তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতাদের মধ্যেই আমি এই মানসিক দৈন্যের ভাব লক্ষ্য করেছি।

তাঁরা প্রকাশ্য বক্তৃতায় ঐ সব বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসায় মুখর হলেও ব্যক্তিগতভাবে যখন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তখন তাঁদের মনের আসল স্বরূপটি ফুটে বেরুতে আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি।

সেই জন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজও কংগ্রেসের ও বর্তমানের ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস নেতাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। কার্যকালে নেতাজীর জনপ্রিয়তাকে কংগ্রেস নেতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য প্রকাশ্য জনসভায় তাঁরা নেতাজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন এবং তাঁদের ভাষণ শেষ করেন 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে, কিন্তু সেই জয় হিন্দ ধ্বনির উদ্গাতা নেতাজীকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য বোধ করেন।" [পাক-ভারতের রূপরেখা : সাপ্তাহিক বসুমতী : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭]

শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর এই বক্তব্যের মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই মল্লিকা। বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে কি ভাবে যে অতি সুকৌশলে এই চরিত্র হননের পালা চলছে; তার কিছু কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরছি তোমার সামনে।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের কথা। ঠিক হল, মজঃফরপুরবাসীদের উদ্যোগে সেখানে ক্ষুদিরামের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে। কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হবে কে। ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। তেমন উপযুক্ত লোক না হলে মানানসই হবে কেন। তাই আমন্ত্রণ জানানো হল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সংগ্রামী পুরুষ জওহরলালকে।

আশ্চর্য, আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন জওহরলাল। যুক্তি দেখালেন,—ক্ষুদিরাম ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ দিলেও কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। তাই ক্ষুদিরামের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

চমৎকার যুক্তি। অবশ্য জওহরলালকে এর জন্য দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, আর বিপ্লববাদ এক নয়। প্রথমটাতে হাততালি আর ফুলের মালা—দুই-ই জোটে। কিন্তু পরেরটাতে ফাঁসি অথবা দ্বীপান্তর,—এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। জওহরলালকে কোনদিনও সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় নি। কতখানি মনের জোর থাকলে যে মানুষ স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু ধারণ করতে পারে, সে অনুভূতি তাঁর না থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু কি হয়েছিল বজবজে 'কোমাগাতামারু'-র স্মৃতিফলক স্থাপনের বেলায় ?

১৯১৪ সালের কথা। কোমাগাতামারু জাহাজের আঠারোজন যাত্রী সেদিন ঘটনাস্থলে প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে। বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী শিখ। পাঞ্জাবীরা মার্শাল জাত। তাদের সমর্থন হারানো যে কোন মতেই সঙ্গত নয়, বুদ্ধিমান জওহরলালের তা বুঝে নিতে দেরি হয়নি। তাই সানন্দে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বজবজের সেই অনুষ্ঠানে।

খুব আনন্দের কথা। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, কোমাগাতামারুর শহীদবৃন্দ কি কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিলেন? তাহলে ক্ষুদিরামের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধা ছিল কোথায়?

মল্লিকা, শুনলে অবাক হবে যে, বিশ্ববরেণ্য স্বামীজী এবং ভগৎ সিং, যতীন দাস প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদবৃন্দও রেহাই পাননি এই অপপ্রচারের হাত থেকে। এ সম্বন্ধে আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুটি খবর পরপর তুলে ধরছি তোমার সামনে। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল যুগান্তর পত্রিকায়—১৯৬৮ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে।

"স্বামী বিবেকানন্দ কি একজন দুর্বৃত্ত ছিলেন?"

জনৈক এম. পি বললেন, কিছুদিন আগে বিলাতে গিয়ে তিনি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এম. পি-টি বললেন, স্বামীজী বিলাত গিয়েছিলেন তাঁর আমেরিকা যাত্রার আগে। তাঁর বিলাত অবস্থানের প্রামাণ্য চিহ্ন কিছু বিলাতে আছে কিনা তার খোঁজ করতে করতে তিনি অবশেষে পৌঁছান পুলিশের কেন্দ্রীয় দপ্তর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।

সেখানে মহাফেজখানায় বহু ফাইলের পাতা উল্টে ভারতীয় দুর্বৃত্তদের এক ফাইলের মধ্যে স্বামীজীর বিলাত আগমনের বিবরণ আবিষ্কার করেন। স্বামীজী বিলাতে এলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সম্ভবত ভারত থেকে পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে একজন সাধুবেশধারী দুর্বৃত্ত বলে ধরে নেয় এবং তাঁর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখে। ফাইলে তার বিবরণ রয়েছে।

এম. পি-টি অভিযোগ করলেন, ভারতের একজন মহাপুরুষের রেকর্ড বিলাতে দুর্বৃত্তদের ফাইলে রয়েছে, স্বাধীন ভারত সরকার বিশ বছর ধরে তা জেনেও কোন প্রতিবিধান করেন নি।

কিন্তু ভারত সরকারের এই আচরণে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ দেশের মহাপুরুষ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের যে মনোভাব ছিল, স্বাধীন ভারত সরকারও মোটামুটি সেই মনোভাবই বজায় রেখেছেন।

এম. পি-টি বললেন, ভগৎ সিং-এর মামলা ও ফাঁসির বিবরণ—কি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিবরণ এখনও হয়ত পুলিশ ফাইলে আছে—নয়াদিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় যে নেই, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য লোক দেখানো টাকা খরচ হচ্ছে বটে, কিন্তু সে ইতিহাস রচনার ভার দেওয়া হয়েছে এমন সব লোকের হাতে, জাতীয় আন্দোলনের সংগে যাঁদের কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল না।

এম. পি-টি বললেন, ইতিহাস যেই লিখুক, লেখকের বিরুদ্ধে তাঁর বলার কিছু নেই। তাঁর অভিযোগ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রামাণ্য চিহ্ন, নথিপত্র ও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবরণগুলি যত্নের সংগে সংগ্রহ করার এবং ভবিষ্যতে গবেষণাকারী ও ইতিহাস লেখকদের কাছে সেগুলি যাতে সহজলভ্য হয়, সে দায়িত্ব ভারত সরকারের, কিন্তু নয়াদিল্লীতে তার কোন চেষ্টা ও আগ্রহ তিনি লক্ষ্য করেন নি।

এম. পি-টি বললেন, গত কয়েক মাসে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহের বাসনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে মোট ১৪৪টি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। এই সব প্রশ্নের যা উত্তর সরকারের তরফ থেকে লোকসভায় দেওয়া হয়েছে, তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন।

মন্ত্রীরা নিজেরা কোন খোঁজখবর রাখেন না, উত্তর রচনার ভার ছেড়ে দিয়েছেন আমলাদের হাতে। আমলাদের যেটুকু আগ্রহ, তা নিয়োজিত হয়েছে উত্তর এড়াবার ফিকির খোঁজার কাজে। এম. পি-টি অবশ্য এখনও হতাশ হননি, মন্ত্রীদের সংগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা যদি কিছু কাজ এগোয় তার চেষ্টা করছেন। পাঠকদের এখানে বলে রাখি, এম. পি-টি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেসী।"

এবার আর একখানি চিঠির বিবরণ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ লিখিত এই চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালের ৭ই আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায়।

ওরা কি ডাকাত

"...কলকাতা টি. ভি. কেন্দ্র হতে প্রচারিত গত ২৩শে জুলাই-এর নিউজ বুলেটিনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শহীদ বীর বিপ্লবী যতীন দাস ও সর্দার ভগৎ সিং-এর সহযোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদ ও বটুকেশ্বর দত্তকে রাজনৈতিক "ডাকাত" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সকল দুর্ধর্ষ বিপ্লবী যোদ্ধাদের সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতকে শোষণের ও শাসনের উদগ্র নেশায় বা স্বার্থে অনুরূপ ভাষায় (যথা, ডাকাত, উপদ্রবকারী বা সন্ত্রাসপন্থী) বলে আখ্যা দিতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশী শাসকরা এদেশ থেকে চলে গেলেও দেশের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে কিছু গোলামি মনোভাবাপন্ন লোক বিদেশী শাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত অসম্মানসূচক শব্দগুলির চর্বিত চর্বন

করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জা বোধ এখনও করে না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে ভবিষ্যতে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে টি. ভি. (কলকাতা কেন্দ্র) সচেতন ও যত্নশীল হবেন বলে আশা করতে পারি কি?"

মহাকরণের অলিন্দে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপনের ব্যাপার নিয়েও একদিন কম জল ঘোলা হয়নি মল্লিকা।

তারিখটা ছিল ১৯৬৬ সালের ১৫ই আগস্ট।

বহু বছর সাধ্য সাধনার পরে ঠিক হয়েছিল, ওইদিন বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে মহাকরণের সেই ঐতিহাসিক অলিন্দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন—মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তার আমন্ত্রণলিপিও পাঠানো হয়েছিল সতীর্থ বিপ্লবীদের কাছে। তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমেও সে খবর প্রকাশ করা হয়েছিল বেশ ফলাও করে।

কিন্তু একথা কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়নি যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল কোন গোপন হস্তের ইঙ্গিতে। ফলে, আমন্ত্রিত বিপ্লবীরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন হতাশ হয়ে।

কেন সেদিন অনুষ্ঠানটি বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল শেষ মুহূর্তে। কারণ, ওরা হিংসাশ্রয়ী। মহাকরণে ওদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হলে প্রশাসনযন্ত্র নাকি ব্যাহত হবে।

আমি রাজনীতি করিনে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্তও ছিলাম না কোনদিন। এখনো তাই রয়েছি। আমার কাছে সব শহীদই এক ও অভিন্ন। সবাইকেই আমি শ্রদ্ধা করি সমানভাবে। সেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা বা মাস্টারদা সূর্য সেনের মধ্যে কে বড়, কার অবদান বেশী, সেকথা আমি চিন্তাও করিনি কোনদিন। করতে অভ্যস্থও নই।

হয় তো সে কারণেই পুন্যাত্মা শহীদদের মর্যাদাকে এভাবে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে মনে মনে আহত না হয়ে পারি নি সেদিন। মনে জেগে উঠেছিল অসংখ্য প্রশ্ন। কেন পূর্ব-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল এভাবে। কার ইঙ্গিতে!

অমুকে আমাদের শহীদ, সুতরাং সে কুলীন ব্রাহ্মণ। আর অমুক! না, সে আমাদের দলের কেউ নয়, তাই শহীদ-কুলে সে পতিত—একি হাস্যকর কথা! কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শহীদদের নিয়ে এই অশোভন দলবাজী?

পরের বছরই সেই প্রতিকৃতি স্থাপিত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার হেমন্ত বসুর উদ্যোগে এবং মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর সভাপতিত্বে, এবং মাল্যদান করলেন স্বয়ং রাজ্যপাল ধরমবীর। কই, প্রশাসনযন্ত্র তো অচল হল না। যেমন

ছিল, তেমনিই তো রয়ে গেল। তাহলে এক বছর আগে হতে বাধা ছিল কোথায় ?

তবে এ ব্যাপারে সব চাইতে ভাগ্যবান বোধ হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সব কিছু থেকে নেতাজী বাদ। নেতাজীর ছবি! না, তাও চলবে না। কঠোর নির্দেশ—সরকারী ক্যানটিন, কোয়ার্টার্স, রিক্রিয়েশন রুম ইত্যাদি কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ লোকটির ছবি রাখা চলবে না। গোপন নির্দেশ-পত্রটি আমি তুলে দিচ্ছি।

Confidential

M . 155211.1
H . Q . Bombay Sub-area
Colaba, Bombay—6
11th Feb . 1949

Subject—PHOTOS

It is recommended that photos of Netaji Subhas Chandra Bose be not displayed at prominent places in Unit Line, Canteens, Quarters Guard or Recreation Rooms.
P . N . K . V . L.

Sd/—Major General staff
P. N. Khanduari.
Tel . 35081 Extn. 41

সুভাষ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম রেখেছিলেন 'স্বরাজ দ্বীপ' ও 'শহীদ দ্বীপ'। না, তাও চলবে না। এর চাইতে আগেকার নামই ভাল।

আর বিপ্লবীদের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত আন্দামান সেলুলার জেল! না, ওটাও রাখা হবে না। তাই সেলুলার জেলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উত্তর প্রদেশের গোবিন্দবল্লভ পন্থের স্মৃতি-রক্ষার্থে তার নাম রাখা হয়েছে—'পন্থ হাসপাতাল।' সেই গোবিন্দবল্লভ পন্থ, যিনি ত্রিপুরী কংগ্রেস সবচাইতে বেশী হতমান করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

তবু জনমতের চাপে,—কিছুটা প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে ঢোক গিলে সুভাষচন্দ্রের নামটা উচ্চারণ করতে হয়। না করে উপায়ও নেই। নির্বাচন সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে সুভাষচন্দ্র তো মস্তবড় একটি মূলধন। কিন্তু সেই নামোচ্চারণের পেছনে শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতির স্থান কতটুকু ?

ছোট্ট একটি ঘটনার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোধহয়

জানো, মহাক্ষীরম্ন নেতাজী ইম্ফলের উপকণ্ঠ ময়রাং এ তাঁর হেড কোয়াটার্স স্থাপন করেছিলেন ১৯৪৪ সালে। ১৯৫৫ সালে সেখানে একটি কাঠের ফলক স্থাপন করে নিহত আজাদী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তখনকার সময়ের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ঢেবর স্বয়ং।

কিন্তু কি লেখা ছিল ঐ ফলকটির গায়ে। লেখা ছিল—'আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁরা এখানে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছেন নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে।' তারপরই লেখা রয়েছে—'In their own way.'

এই 'in their own way' কথাটির মানে কি, কেউ বুঝিয়ে দিতে পার আমাকে। অর্থাৎ—সেই জাত-পাতের ব্যাপার। সোজা কথায়—যদিও আমরা ওদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তবু আমাদের শহীদদের মত ওঁরা কুলীন শহীদ নয়।

মল্লিকা, কি বলবে তুমি এই কাঠের ফলকটাকে। একি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নাকি লোক দেখানো ভড়ং?

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এমন হাজারো প্রমাণ দেখানো যায়, যেখানে পদে পদে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে হতমান ও অস্বীকার করা হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে। তার মধ্যে লালকেল্লার ভূগর্ভে কালাধার স্থাপনের ঘটনাতো তুমিও জানো। ছিল কি তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নাম?

তবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই মল্লিকা। নীতিগত দিক থেকে কিছু অমিল থাকলেও অন্ততঃ সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে কিন্তু আশ্চর্য মিল দেখা যায় কেন্দ্রীয় ও আমাদের রাজ্য সরকারের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আমি একটি চিঠির বক্তব্য তুলে ধরছি তোমার সামনে। শ্রীমতী নন্দা সরকার কর্তৃক লিখিত এই চিঠিখানি ১৯৮০ সালের ২৩শে জুন প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়।

নেতাজী বাদ

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্রুত পঠনের জন্য 'যাদের আমরা ভুলি নাই'—এই পুস্তকটিতে বাংলার অনেক সুসন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, এর মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা থেকে আরম্ভ করে চারণ কবি মুকুন্দদাস, ভগিনী নিবেদিতা, রাণী রাসমণি, কবি নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ অনেকের কীর্তি কাহিনী স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাদ পড়েছেন আমাদের একান্ত আপনজন, বাংলা—তথা ভারতের বীরসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

জানিনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গদীতে আসীন বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত

দলগুলি পরবর্তী বংশধরদের কাছে নেতাজীর আদর্শ তুলে না ধরার নীতি গ্রহণ করেছেন কিনা।"

ঠিক যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল, তাই পাশাপাশি বড় তরফের স্বীকৃতির বহরটাও একবার দেখে নাও।

নেতাজী উপেক্ষিত

"নয়াদিল্লী, ৪ঠা এপ্রিল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বোধহয় কোন অবদানই নেই। সংসদ ভবন সংলগ্ন হলঘরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য যে প্রদর্শনী চলছে, সেই প্রদর্শনীতে এলে অন্ততঃ একথাই মনে হবে। শুধু নেতাজী কেন, এই প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে একেবারে স্বীকারই করা হয়নি।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অডিও-ভিস্যুয়াল পাবলিসিটি ডিরেক্টার এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদান সম্পর্কে যে উপেক্ষার মনোভাব দেখা গেছে তা বিস্ময়কর।

প্রদর্শনীতে নেতাজী সম্পর্কে কিছুমাত্র উল্লেখ নেই। একটা ফটো পর্যন্ত না। সংসদের মহাফেজখানা থেকেই অধিকাংশ ছবি এসেছে। ছবির অভাব ছিল না। কিন্তু নেতাজী প্রদর্শনীতে স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হননি।

বাংলার শহীদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী—এঁদের ছবিও ঠাঁই পায়নি। যদিও ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু—এঁদের ছবি আছে। বাঙালী নেতাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন শুধু ডবলিউ সি. বানার্জী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শরৎ বসু। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ দেখা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রসঙ্গে।

উল্লেখ্য, প্রদর্শনীতে শ্রীমতী গান্ধীর ২৫টি, জওহরলাল নেহেরুর ১৬টি, গান্ধীজীর ৬টি ও অন্যান্য নেতাদের বেশ কিছু ছবি রাখা হয়েছে।"

[আনন্দবাজার : ৫-৪-৮০]

মল্লিকা, কি মনে হল তোমার উপরোক্ত সংবাদটি পড়ে। শিবহীন যজ্ঞের উপমাটাই সর্বাগ্রে মনে আসেনি কি। অথচ এই নাকি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস। যাক, সুভাষের কথায় ফিরে যাই।

সুভাষ। বিপ্লবের প্রদীপ্ত সূর্য সুভাষ। অসম্ভবের নায়ক সুভাষ। ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ শহীদবৃন্দের সার্থক উত্তরসূরী নেতাজী সুভাষ।

নামটা উচ্চারণ করলেই মন চলে যায় দূরে—বহুদূরে—আকাশের সীমানা পেরিয়ে দূর দিগন্তে।

বিরাট কর্মজীবন। বিরাট তার পটভূমিকা। এত বিরাট যে, মনে রাখাও কষ্টকর। ভাবতে গেলে চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে ওঠে—কলকাতা—পেশোয়ার—কাবুল—মস্কো—বার্লিন—প্যারিস—ভিয়েনা—রোম—টোকিও, সিঙ্গাপুর—সাংহাই—নানকিং—ফিলিপাইন—জাভা—সুমাত্রা—সাইগন—ব্যাঙ্কক—কুয়ালালামপুর—রেঙ্গুন—মান্দালয় এবং সবশেষে কোহিমা।

কোহিমা। নাগাল্যান্ডের রাজধানী সুন্দরী কোহিমা।

কে মনে রেখেছে যে, আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে এই কোহিমা রণাঙ্গনে বিদেশী শক্তিকে পরাজিত করে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ।

জেনারেল উইংগেট ও জেনারেল শিলমের অধীনে মরীয়া হয়ে সেদিন বাধা দিয়েছিল ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট, ডারহাম লাইট ইনফ্যানট্রি, রয়েল স্কটস্ প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ বাহিনীগুলি, কিন্তু কার সাধ্য রণোন্মত্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের গতিরোধ করে। তাই একে একে সব বাধাই তাঁদের কাছে ভেসে গিয়েছিল তৃণখণ্ডের মত।

প্রথমেই দখল করা হল জি. টি. পাহাড়ে অবস্থিত জলাধার কেন্দ্র। তারপর ডেপুটি কমিশনারের বাংলো। ক্রমশ পিছু হঠতে হঠতে শত্রুবাহিনী এমন একটা জায়গায় গিয়ে জড়ো হল, যা দৈর্ঘ্যে ছয়শো গজ এবং প্রস্থে তিনশো পঞ্চাশ গজ মাত্র। এ অবস্থায় লড়াই আর কতক্ষণ।

অবশেষে কোহিমার পতন হল আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর হাতে। হাজার হাজার জওয়ানের কণ্ঠে তখন রব উঠেছিল, জয় হিন্দ। চলো দিল্লী। নেতাজী জিন্দাবাদ। আমরা কোহিমা জয় করেছি।

'The Final onslaught on Kohima was then done under the Command of Col. Thakur Singh, second in Command of the Subhas Brigade. The tricolour flag was hoisted on the mountain tops around Kohima.' (Battle of Imphal : Debnath Das)।

একই তারিখে (৮-৪-৪৪) ব্রিটিশ পক্ষ থেকে কি প্রচার করা হয়েছিল দেখা যাক—'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমান্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, ইম্ফল-কোহিমা সড়ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শত্রুর প্রধান লক্ষ্যস্থল ইম্ফলে কার্যতঃ অবরোধকালীন অবস্থা দেখা দিয়াছে। শত্রুপক্ষ কোহিমা আক্রমণ করে এবং শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।'

মোট কত সৈনিক সেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন কোহিমা রণাঙ্গণে। সরকারী মতে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীর নিহত ১৬৭০০, জাপানের ৩০৫০২ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সব মিলিয়ে ২৭০০০ হাজার।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সমাধিস্থানে গেলে আজো চোখে পড়বে সুন্দর একটি কবিতা :

'When you go home
Tell them of us and say
We give our today,
For your tomorrow.'

কোহিমা রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পরাজয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিরাট গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ভাবতে গেলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কতটুকু শক্তি ছিল সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের। আধুনিক সমর সম্ভার বলতে কিছুই ছিল না। তবু কি করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে।

উত্তর রয়েছে নেতাজীর একটি কথার মধ্যে। প্রায়ই তিনি বলতেন—'জোর করে একজনের কাঁধে আমি রাইফেল চাপিয়ে দিতে পারি, কিন্তু প্রাণ দিতে বাধ্য করতে পারিনে। জেনেশুনে প্রাণ দেওয়া একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা একটা আদর্শ ধরে দণ্ডায়মান।'

সেই মুক্তিমন্ত্রেই তিনি দীক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর সেনা-বাহিনীকে, তাই সবকিছুই সেদিন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কাছে।

প্রমাণ, ইতিহাস। যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণ থেকে। এক সুকান্ত বুঝি সহস্র সুকান্ত হয়ে সেদিন গর্জে উঠেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে।

'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।'

চিতা তারা তুলেছিলেন বৈকি। প্রতিটি রণাঙ্গনেই তুলেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু জয় আর জয়। প্রতিটি রণাঙ্গন থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে পিছু হঠতে হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে মার খেয়ে।

তালিকাটি তুলে ধরছি—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪—আরাকান অঞ্চল ও তাউংবাজার দখল। ৬ই—মিয়া মিরাং। ১লা মার্চ—সেটাবিন। ৫ই—কালাদিন। ৮ই—ফোর্ট হোয়াইট। ১২ই—লেনাকট। ১৮ই—কেনেডি পিক। ১৯শে—ভারতভূমিতে প্রবেশ। ২০শে—তাউংজন। ২১শে—উখরুল। ২২শে—টিডিম ও মোলন। ২৫শে—সাংহাক। ৩০শে—মোর্চ। ১লা এপ্রিল—তামু ও কাবাউ। ৫ই—হেঙটাম ও কাঙরাটংগী। ৮ই—কোহিমা।

এখানেই শেষ নয়। কোহিমার পর ময়রাং। শত্রুপক্ষও তখন রীতিমত প্রস্তুত। গত দু'বছরে তারা প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেছে ভেতরে ভেতরে। সৈন্য সংখ্যাও অনেক বেশী। আর সমর সম্ভারের তো কথাই নেই। মার্কিন

মুলুক থেকে আসছে তো আসছেই।

তবু কিছুতেই গতিরোধ করা সম্ভব হল না দুরন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর। অবশেষে ময়রাং-এর পথে একদিন শোনা গেল তাদের বিজয় উল্লাস—আমরা ময়রাং জয় করেছি। আর মাত্র পঁচিশ মাইল, তারপরই ইম্ফল।

'It was fourteenth April, 1944, the Col. S. Malik Sector Commander, Azad Hind Fouj hoisted that National Flag of India.'

কোহিমার পর ময়রাং। পরবর্তী লক্ষ্য বিষেণপুর। সে কি প্রচণ্ড লড়াই! সবচাইতে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল মিখতুখং গ্রামে। কতবার যে গ্রামটা হাত বদল হয়েছিল, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

আজাদ বাহিনী তখন বেপরোয়া। যত রক্ত লাগে দেব, তবু বিষেণপুর আমাদের চাইই।

কাজেও তাই হল। অনেক রক্তের বিনিময়ে বিষেণপুরও একদিন চলে এলো আজাদী বাহিনীর হাতে। আর মাত্র তিন মাইল। তারপরই ইম্ফল।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল এক অভাবনীয় খবর। ইম্ফল ঘেরাও। ডিমাপুর রোড অবরুদ্ধ। হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো মৃত্যু, এছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর কাছে।

ঐতিহাসিক ইম্ফল রণাঙ্গন। এক দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজ, অন্য দিকে ইঙ্গমার্কিন বাহিনী। একদল স্বদেশের মাটি থেকে বিদেশী শক্তিকে উচ্ছেদ করতে দৃঢ়সংকল্প, অন্য দল তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

একটানা গর্জন করে চলেছে দুরপাল্লার কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেসিনগান ইত্যাদি ভারী মারণাস্ত্র। চলছে উভয় পক্ষ থেকেই, তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

বন্যার মত এক একবার সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আজাদ হিন্দ ফৌজ, কিন্তু অপর পক্ষও তখন মরিয়া। মালয়, বর্মা, হংকং, সিঙ্গাপুর সব কিছু হারাতে হয়েছে একে একে। ভারতবর্ষও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর রইল কি। তাই শেষ পর্যন্ত না দেখে এবার আর তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়।

একটা দুর্নিবার জ্বালায় আজাদী বাহিনী তখন জ্বলছে। আর মাত্র তিন মাইল। সর্বস্ব পণ করে ওদের ঐ প্রতিরোধ অবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় না। সব তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া যায় না?

তাই বা কি করে সম্ভব। সারিবদ্ধ কামান শ্রেণী থেকে একটানা ওরা অনল বর্ষণ করে চলেছে। এ অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া, আর পাথরের বুকে মাথা

ঠুকে মরার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

মে মাস শেষ হল। জুনও যায় যায়। তখনও আজাদী বাহিনী ঘাঁটি আগলে পড়ে রয়েছে সেই একই ভাবে।

বিধাতার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় অন্য রূপ। তাই সহসা শুরু হল অকাল-বর্ষণ। ঝর ঝর বর্ষা আর দিগন্তপ্রসারী কালো অন্ধকারে মনে হল গোটা জগৎটাই বুঝি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, তবু বর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। একটানা ঝরছে তো ঝরছেই। মনে হল, এ ঝড় বুঝি আর কোন দিনই থামবে না।

নিরুপায় বেদনায় বারবার আকাশের দিকে তাকায় আজাদী ফৌজ। বৃষ্টিটা একটু কমেছে কি। কিন্তু সব বৃথা। প্রলয় ঝঞ্ঝা সেই একই ভাবে বয়ে চলেছে রণাঙ্গনের ওপর দিয়ে।

ফল হল মারাত্মক। এতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীরা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে বন্দী করে রেখেছিল ইম্ফলের অভ্যন্তরে। এবার তারা নিজেরাই বন্দী হয়ে পড়ল প্রকৃতির অভিশাপে।

জলে থৈ থৈ করছে চারিদিক। সেই সঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে পাহাড়ী নদীগুলিতে। ফলে, পথ ঘাট, নদী নালা সব মিলেমিশে একাকার।

খাদ্য নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। সমর সম্ভার বলতে যা কিছু ছিল, সব ভিজে একাকার। সামনে চাপ চাপ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যে নজরে পড়ে না।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নির্দেশ পাঠালেন নেতাজী—এভাবে তোমাদের আমি মরতে দিতে পারিনে। আমার আদেশ, তোমরা সবাই ফিরে এস।

ফিরে যাব! নিষ্ঠুর একটা উপলব্ধি নিষ্ফল হাহাকারের মতই যেন বেজে উঠল প্রতিটি আজাদী সৈনিকের কণ্ঠে, এ পর্যন্ত একটা লড়াইতেও আমরা হারিনি, তবু কিনা ফিরে যাব! এর জন্যই কি আমরা পাহাড়-পর্বত তুচ্ছ করে দু'হাজার মাইল পায়ে হেঁটে এতদূর পথ এসেছিলাম! এর জন্যই কি আমরা এই ইম্ফলের মাটিতে হাজার হাজার সাথীকে বলি দিয়েছিলাম! হায় ভগবান! হায় খোদা! এই কি আমাদের ভাগ্যলিপি?

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আজাদী ফৌজ। দু'চোখে তাদের অশ্রুর বন্যা। এই দেশ, এই মাটি তাদের কত প্রিয়। আবার যে তাদের এই মাতৃভূমি থেকে এমন করে বিদায় নিতে হবে তা কে জানত!

এ্যাবাউট টার্ণ। লেফট-রাইট, লেফট্...

দেখতে দেখতে আজাদী ফৌজ মিলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। শুধু যাবার আগে মাতৃভূমির পদপ্রান্তে রেখে গেল একটি নীরব প্রণাম। বিদায়

ময়রাং। বিদায় বিষেণপুর। বিদায় ইম্ফল। একমাত্র তোমার মাটিতেই আমরা হাজার হাজার জওয়ান সাথীকে রেখে গেলাম চিরদিনের মত। তাদের ভুলো না যেন।

ভুলে যায়নি কি। আজকের ভারত ভাগ্যবিধাতাগণ কি মনে রেখেছেন নেতাজীর সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাসকে। মনে রাখার নিদর্শন তো একটু আগেই শুনিয়েছি তোমাকে।

জানি, পাঞ্জাবের জৈল সিং, আর পশ্চিমবাংলা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় এক নয়। তবু মনে একটা প্রশ্ন জাগে, তাঁরা কি সামান্যতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এ ব্যাপারে?

নেতাজী আজ সর্বকিছুর উর্ধ্বে। কে তাঁকে স্বীকৃতি দিল, কে দিল না তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তবু জানতে ইচ্ছা করে যে, মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় কি বাঙালী, নাকি অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসী?

এবার দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

উল্লেখযোগ্য, উক্ত প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ছবি ছিল পঁচিশটি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ষোলটি এবং গান্ধীজীর মাত্র ছয়টি।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধীর যোগ্যতা অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান কতটুকু? আমি কিন্তু তাঁর কোন অবদানের কথা আজও কোথাও খুঁজে পাইনি। অথচ প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় তাঁর স্থানই ছিল সর্বোচ্চে।

দ্বিতীয় স্থান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর অবদান কি জাতির জনক গান্ধীজীর চাইতেও বেশী। নইলে ছবির ব্যাপারে গান্ধীজী এতটা পিছিয়ে গেলেন কি করে?

ইতিহাস বড় নির্মম। ইতিহাস তাকেই বলে, যার হাত থেকে পালানো যায় না।

প্রথম সারির নেতা জওহরলাল সম্বন্ধে ইতিহাসের কি মূল্যায়ন দেখা যাক। প্রথমেই তুলে ধরছি জওহরলালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটি স্মরণীয় উক্তি:

'Jawaharlal's mistake in 1937 had been bad enough. The mistake of 1946 proved even most costly.

[India wins Freedom]

১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালে কি ভুল করেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল, যার জন্য তাঁর সতীর্থ মওলানা সাহেবের এই নিদারুণ খেদোক্তি। ব্যাপারটা

বুঝতে হলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী খুব মজার একটি জিনিস উপঢৌকন দিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষকে। ইতিহাসে তাকে বলা হয়েছে কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা। অর্থাৎ—হিন্দু ভোট দেবে হিন্দুকে, মুসলমান ভোট দেবে মুসলমানকে। যেখানে হিন্দুরা মেজরিটি হবে, সেখানে সরকার গঠন করবে কংগ্রেস। মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলিতে মুসলীম লীগ।

কি কংগ্রেস, কি মুসলীম লীগ দু'পক্ষই রাজী। বেশ তাই হোক। আমরা প্রস্তুত। হোক নির্বাচন।

শুধু বাধা দিলেন একটি মাত্র মানুষ। তিনি হলেন ভারতীয় ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক সুভাষচন্দ্র। ইয়োরোপ থেকে বারবার তিনি আবেদন জানাতে লাগলেন নেতৃবৃন্দের কাছে—ব্রিটিশের ফাঁদে তোমরা পা দিও না। এ প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ হল, হিন্দু এবং মুসলমানকে দুটি আলাদা জাত বলে স্বীকার করে নেওয়া। দেশের এত বড় সর্বনাশ তোমরা করো না।

উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে বসলেন জওহরলালকে। চিঠিতে তিনি লিখলেন :

'আজ যারা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার ওপরই আমি ভরসা রাখি। কংগ্রেসের গদী দখলের চেষ্টা যেমন করে হোক, বন্ধ করতেই হবে—আর ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ দুটো কাজ যদি তুমি করতে পারো, অধঃপতনের পথ থেকে তুমিই কংগ্রেসকে বাঁচাতে পারবে।' [বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স]

কেউ কান দিল না সুভাষচন্দ্রের কথায়। ঐ একগুঁয়ে লোকটার কাজই হল ব্যাগড়া দেওয়া। সুতরাং, ওর কথায় কান দেওয়ায় কোন অর্থই হয় না।

নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়জয়কার। এবার মন্ত্রীত্ব গঠন। স্বাধীনতা নয়। স্বায়ত্ব শাসনও নয়। তবু তো মন্ত্রীত্ব।

সাত সাতটি প্রদেশ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হল। মুখে যা-ই বলা হোক না কেন, কার্যত মেনে নেওয়া হল যে, কংগ্রেস আসলে বর্ণহিন্দুদের একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। মুসলমান বা অনুন্নত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই। ফলে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের একূল-ওকূল দুইই গেল।

গোল বাধল এই বাংলাদেশে। দেখা গেল কোন দলই একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। এখন উপায়!

উপায় বাতলে দিলেন কৃষক প্রজা পার্টির জনাব ফজলুল হক সাহেব। এসো, কংগ্রেস আর প্রজা পার্টি মিলে আমরা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করি। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। আমাদের উভয় দলের

সমন্বয়ে সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশের মাটি থেকে সাম্প্রদায়িক দল মুসলীম লীগকে উচ্ছেদ করতে আমার দু'দিনও লাগবে না। এসো, হাতে হাত মেলাও।

হক সাহেবের দাবী উপেক্ষিত হল। কারণ, জওহরলালের একটি নতুন থিয়োরী। তাঁর সাফ কথা—কংগ্রেস অন্য কোন দলের সঙ্গে কোয়ালিশনে যাবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য বাধ্য হয়েই হক সাহেব তখন গিয়ে হাত মেলালেন সেই সাম্প্রদায়িক দল মুসলীম লীগের সঙ্গে। ফলে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার পরিবর্তে গঠিত হল মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা, যার শেষ পরিণতি বাংলা বিভাগ।

সেদিন জওহরলাল, তথা কংগ্রেস এই অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় না দিলে কিছুতেই যে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হত না, এ নিষ্ঠুর সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কার সিদ্ধান্ত ঠিক? সুভাষচন্দ্রের, না জওহরলালের। কার ভুলে বাঙালীকে আজো নানা ঘাটে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে ছিন্নমূল হয়ে?

পরবর্তী কালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল:

'The acceptance of the principle of communal electorate was a mistake. It has created the problem.'

সর্দারজী ভুল স্বীকার করে রেহাই পেলেন, কিন্তু দেশ ও জাতি তার সর্বনেশে পরিণতি থেকে রেহাই পেল কি? গদীর মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে সুভাষচন্দ্রের পরামর্শটা কানে নিলে আদৌ এই সমস্যা দেখা দিত কি?

অল্পের জন্য বেঁচে গেল আসাম। বেঁচে গেল ঐ অবাঞ্ছিত সুভাষচন্দ্রের জন্যই। জওহরলালের এই উদ্ভট থিয়োরীর ফলে আসামেও লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল সাদুল্লার নেতৃত্বে, কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি।

সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস সভাপতি। জওহরলালের থিয়োরী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা তিনি চলে গেলেন আসামে। কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যকে দলে টেনে এনে কিছু দিনের মধ্যেই তিনি লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে সেখানে গড়ে তুললেন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। ফলে আসাম বেঁচে গেল চিরদিনের মত।

আজ আসামের আন্দোলনকারী ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, পরবর্তী কালে আসামকেও যে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়নি, তার সবখানি কৃতিত্ব অবাঞ্ছিত বাঙালী সুভাষচন্দ্রের একার, আর কারো নয়?

এবার আসি ১৯৪৬ সালের কথায়—

ঠিক হল, কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ দু'পক্ষই যোগ দেবে সেই অন্তর্বর্তী সরকারে। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরাই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন যৌথভাবে।

সব ভেস্তে গেল নব নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের একটি অসংযত উক্তির ফলে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যা বললেন, তার ভাবার্থ হল, ব্রিটিশ মিশন যা-ই বলুক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সবকিছু আমরা পরিবর্তন করে নিতে পারব অন্তর্বর্তী সরকারে গিয়ে।

এর মানে! শুনেই গর্জে উঠলেন মুসলীম লীগ প্রধান জিন্না, জওহরলালের কথায় কংগ্রেসের সত্যিকার মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং, আর অন্তর্বর্তী সরকার নয়। চাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।—'আজ আমরা পিস্তল সংগ্রহ করেছি এবং কি করে তা ব্যবহার করতে হয় তাও আমরা জানি।'

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কত লোককে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল কলকাতা মহানগরীতে? দশ হাজার। আর গোটা ভারতবর্ষে? ভগবান জানেন, তবে একমাত্র পাঞ্জাবেই নিহত হয়েছিল মোট ছয় লক্ষ।

কে এর জন্য দায়ী? কার জন্য সেদিন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঘাতকের হাতে?

আক্ষেপ করে বলেছেন জওহরলালের ইংরেজ বন্ধু প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিওনার্ড মোসলে:

'নেহেরু নিজেই বোধ হয় বোঝেননি তিনি কি বলছেন। কোন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের এ ধরনের কথা মোটেই শোভা পায় না। ভারতের ভাগ্য তখন দুলছে। একটু ভুলে সব তচনচ হয়ে যেতে পারে। সেই সন্ধিক্ষণে নীরবতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই হয়তো লাভ করা যেত। আর নেহরু কিনা সেই সময়টাই বেছে নিলেন অমন একটা প্ররোচনামূলক উক্তির জন্য।'

[The Last Days of the British Raj : P—21]

না, এখানেই শেষ নয়। আরও একটু বাকি আছে। জিন্নার এক কথা, পাকিস্তান আমরা চাই-ই। 'Pakistan is our deliverance, defence, destiny. Pakistan is our only demand and we will have it.'

অপর পক্ষে জওহরলালের সদম্ভ উক্তি: 'কংগ্রেস কিছুতেই এ দাবী মানবে না। এমন কি ব্রিটিশ সরকার রাজী থাকলেও না। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, এমন কি রাষ্ট্র সংঘেরও এমন শক্তি নেই যে, জিন্নাকে তাঁর খুশিমত

পাকিস্তান এনে দিতে পারে।'

ষোলকলা পূর্ণ হল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আগমনে। ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ তিনি বড়লাট হিসেবে পা দিলেন ভারতের মাটিতে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই জওহরলালের বিপরীত চেহারা। লিওনার্ড মোস্‌লের ভাষায় :

'একটু সুযোগ পেলেই জওহরলাল অনর্গল কথা বলে যাবেন এবং তার মধ্যে সহকর্মীদের সম্বন্ধে নানাবিধ সমালোচনা থাকবেই। সেই কৌশলে বড়লাট প্রথম দিনেই তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে সবকিছু জেনে নিলেন এবং সেভাবেই তাঁদের দুর্বল স্থানে ঘা দিয়ে কার্যোদ্ধারে ব্রতী হলেন। প্রকৃত পক্ষে জওহরলাল সেদিন থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের লোক হয়ে গেলেন।'

'He could be flattered. He could be persuaded. It was from Nehru that Mountbatten obtained much of the ammunition which he subsequently used upon other Congress leaders. Nehru was completely won over and Mountbatten had the measure of his man. He was Mountbatten's man from that moment on'...[P—101]

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। একদিন হাজার চেষ্টা করেও লর্ড কার্জন যা করতে পারেননি, সেদিন তাঁর সেই ইচ্ছাটাকেই সার্থক করে তুললেন ১৯৪৭ সালের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, এবং বলাই বাহুল্য যে, খণ্ডিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করলেন পণ্ডিত জওহরলাল।

সুভাষ যে ভাবে তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, জৈন, নেপালী ইত্যাদি সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষে তার দ্বিতীয় নজীর আছে কি। তাইতো সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল :

'The lesson that Netaji and his army bring to us is one of selfsacrifice, unity irrespective of class and community and discipline. If our adoration will be wise and discriminating, we will rightly copy this trinity of virtues. Then we will be able to stand erect before the world .'

এ স্বীকৃতি স্বয়ং গান্ধীজীর। তা বলে কতগুলো ভীরু বা কাপুরুষের কাছ থেকে এতখানি মহত্ব আশা করা যায় না। অসুবিধাও রয়েছে কিছুটা।

সেদিন ওদের ভাষায় নেতাজী ছিলেন ভ্রান্ত, অপরিণামদর্শী একটি যুবক মাত্র। আজ তাঁকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে পরোক্ষভাবে এটাই

মেনে নিতে হয় যে, নেতাজী ভ্রান্ত নন, আসলে তথাকথিত এই বিজ্ঞজনরাই সেদিন ভ্রান্ত পথে চলেছিলেন দিশেহারা হয়ে।

আরো স্বীকার করতে হয় যে, ১৯৩৯ থেকে এই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লড়াই ছিল প্রধানত নেতাজীর বিরুদ্ধে, আর নেতাজী লড়াই করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।

এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেদিন নেতাজী একা যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বিজ্ঞজনেরা সবাই মিলেও তা করতে পারেননি।

এ কি স্বীকার করা সম্ভব। কেউ কি তা পারে কখনো। হাজার হোক, রক্ত মাংসের শরীর তো। সুতরাং প্রদর্শনী থেকে নেতাজীর ছবি হটাও। সবাই জানুক যে, নেতাজী বলে কেউ ছিলেন না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

একদা জওহরলাল বলেছিলেন : 'দেয়ালে টাঙানো ছবির মুখ দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না।'

খুবই মূল্যবান কথা। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, প্রদর্শনী থেকে নেতাজীর ছবি বাদ দিলেই ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে কি?

অসম্ভব। ইতিহাসকে হত্যা করা এত সহজ নয়।

একদা ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে স্ট্যালিনকে সর্বতোভাবে নির্বাসিত করেছিলেন রাশিয়ার ইতিহাস থেকে। এমনকি স্ট্যালিনের মৃতদেহটা পর্যন্ত তিনি টেনে তুলেছিলেন কবর থেকে। আজ কোথায় সেই ক্রুশ্চেভ। স্ট্যালিন কিন্তু আজো বেঁচে আছেন সোভিয়েত রাশিয়ার জনমানসে।

তাহলে ইতিহাসের নামে কেন এই হাস্যকর প্রচেষ্টা। কেন এই মিথ্যের বেসাতি। কেন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই নির্লজ্জ প্রয়াস।

মানলাম যে, ওরা মিস্গাইডেড্। কিন্তু শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ তো আর মিস্গাইডেড্ নন। বরং তারাই তো সঠিক পথের যাত্রী বলে শুনে এসেছি এতকাল। তাহলে কেন আজ দেশের এই দুরবস্থা। কেন এই ভয়াবহ অর্থসংকট। কেন বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এখানে-ওখানে। কেন এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা। এ জিজ্ঞাসার জবাব কোথায়?

কিছুদিন আগেও পথ চলতে গেলে চোখে পড়তো—'দেশ এগিয়ে চলেছে।' দেখে শুনে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে,—কোনদিকে এগিয়ে চলেছে। সামনের দিকে, না পেছনের দিকে। এগিয়ে চলার নিদর্শন কি এই। শুধু একে-ওকে দায়ী করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? নাকি ইতিহাসকে

বিকৃত করলেই মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নেবে দেশের মানুষ ?

শুরুতে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। পরে কেন তাঁকে দায়িত্ব ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল দিল্লী থেকে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এই উদ্ধৃতি থেকেই তুমি তার সদুত্তর পেয়ে যাবে আশাকরি।

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে নেহেরু সরকার পঞ্চাশ দশকে যে একটি উচ্চতম কমিটি গঠন করেছিলেন, ডঃ মজুমদারের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল সেই কমিটির সভাপতিত্ব করার। তিনি সেই আহ্বান গ্রহণও করেছিলেন।

কিন্তু এই কমিটি বিস্তৃত ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে যে প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন, সেই রিপোর্টে ডঃ মজুমদার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্বোধন ঘটেছে বাংলাদেশে এবং এই সংগ্রামের প্রাথমিক ও অন্তিম পর্যায়ে বিপ্লবীদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী বিশ ও ত্রিশ দশকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ভারতভূমি থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিদায় গ্রহণের যে অপ্রতিরোধ্য পরিবেশ রচিত হয়,—জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম অধ্যায়ে, তার পশ্চাতে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ বিপ্লবের প্রধান অবদান।

বিপ্লববাদ ও নেতাজীর নেতৃত্বের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে তুলে ধরার ফলে ডঃ মজুমদার নেহেরু সরকারের কাছে অপ্রিয় ও এক অবাঞ্ছিত ঐতিহাসিক রূপে চিহ্নিত হন।"

তাই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলেছেন বিপ্লবী নায়ক গণেশ ঘোষ :

"...ডঃ মজুমদারকে জাতীয় মুক্তি ইতিহাস রচনার ঐ কমিটি থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে হয়। অতি তুচ্ছ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা অর্জনের লালসায় ডঃ মজুমদার নিজের মনোভাব, বিশ্বাস, বিবেক ও মর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে—ঐ সব সুযোগ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে চলে আসায় তিনি সমগ্র জাতির হৃদয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মর্যাদায় চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।"

এখানেই থামেননি বিপ্লবী নায়ক গণেশ ঘোষ। ক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি বলেছেন :

"পরে তথাকথিত মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস নামে একটি বিকৃত, অর্ধসত্য, একদেশদর্শী এবং সাময়িকভাবে কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির খামখেয়াল—খুশি অনুযায়ী একটি কাহিনী সরকারী খরচে মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের সুদৃঢ় প্রতিবাদ ও বিরোধীতা এইখানেই যে, ঐ খামখেয়াল—খুশিমত প্রস্তুত বিকৃত কাহিনী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণের অর্থে। ওটা যদি কোন নেতার নিজস্ব অর্থে প্রকাশিত হতো, তা হলে অবশ্যই আমাদের বলবার কিছু থাকতো না।

…এরপরও যদি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের তথাকথিত ইতিহাস বলে প্রচলিত ঐ বিকৃত, অর্ধসত্য কাহিনীর প্রচার সরকার পক্ষ থেকে বন্ধ করা না হয়, তাহলে দেশের জনসাধারণের প্রতি ঘোরতর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে।" [রাখাল বেণু : ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে কেন যে সরকারী গ্রন্থটিতে এত মিথ্যা ও অসঙ্গতি, কেনই বা সেই মিথ্যেকে সত্যের মর্যাদা দেবার জন্য কোন কোন ব্যক্তির এত আগ্রহ, এবার তুমি তা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছ আশাকরি।

আমি নৈরাশ্যবাদী নই মল্লিকা, আমি বাঙালী। বাঙালীর মানসিকতা আমি জানি। একথাও জানি যে, রঙিন ফানুস দেখিয়ে অন্তত এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ভোলানো এত সহজ নয়। বরং ফানুসটাই এখানে চুপসে যায় হাওয়ার চাপে। তাই কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যে—কোনটা গ্রহণযোগ্য কোনটা বর্জনীয়—সে বিচারের ভার আমি তোমাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

জানি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে তোমরা কিছুটা বিচলিত। বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে এরিমধ্যেই হয় তো বা কেউ কেউ ক্ষত-বিক্ষত। তবু হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ, এটাইতো শেষ কথা নয়। দিনের পর রাত্রি আসে। আবার রাত্রিও একসময়ে হারিয়ে যায় নতুন আলোর সমারোহে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রকৃতর এই খেলাইতো চলছে অহরহ।

তাই এই আশা নিয়ে আমি আজ বিদায় নেবো যে, তোমাদের নির্ভুল কর্মসাধনায় বাঙালী আর একবার সেই 'বাঙালী' হোক। আবার দেশের দিকে দিকে ধ্বনিত হোক—'What Bengal things to day India will think to-morrow.'

।। সমাপ্ত ।।